একাদশ ইন্দ্রিয়

রূপক সাহা

ঋচীক ট্রেনে বহরমপুর থেকে ফেরার পথে আত্মহত্যায় উদ্যত একটি অদ্ভুত মেয়েকে বাঁচায়। পরে জানতে পারে মেয়েটির নাম মুনমুন এবং সে মানসিক রোগী। ঋচীক ভালবেসে ফেলে মুনমুনকে। তার টানেই যাতায়াত শুরু করে এক মেন্টাল নার্সিং হোমে। ধীরে ধীরে সেখানকার মনোরোগীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে ঋচীক। তাদের জন্যে কিছু করতে চায় সে। এদিকে প্রতিবেশী এবং অভিভাবক কাকাবাবু তাঁর মেয়ে তিতলির সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ঋচীকের। কিন্তু ঋচীক সেই অভিপ্রায়ে সায় দিতে পারেনি। কাকাবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল। প্রায় একই সময়ে ঋচীকের বিজনেস-পার্টনার সুমিতাভ চরম আঘাত করে। আর মুনমুন সুস্থ হয়ে বহরমপুরে ফিরে যায় ঋচীককে কিছু না বলে। এতগুলো আঘাতে ঋচীক নিজেই কি শেষপর্যন্ত মনোরোগী হয়ে পড়ল ? তারই কথা এই উপন্যাসে।

ISBN 81-7215-932-3

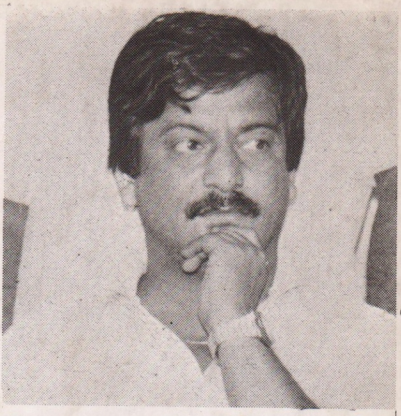

রূপক সাহার জন্ম ৬ জানুয়ারি ১৯৪৯। পিতা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার হারাণ সাহা। রূপক নিজেও ফুটবল খেলেছেন ঐক্য সম্মিলনী ক্লাবে। সাংবাদিকতার পেশায় ঢোকেন সংবাদসংস্থা ইউ এন আই-তে। এখন আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক। বাইশ বছরের সাংবাদিক-জীবনে কভার করেছেন সোল ও বার্সেলোনা অলিম্পিক, ইতালি ও আমেরিকার বিশ্বকাপ ফুটবল, সুইডেনে ইউরোপিয়ান কাপ ফুটবল, দিল্লি ও সোলে এশিয়ান গেমস।
ক্রীড়া সাংবাদিকতায় গুরু মতি নন্দীর উৎসাহে রূপক প্রথম বইটি লেখেন 'চাইনিজ ওয়াল গোষ্ঠ পাল'। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'একাদশে সূর্যোদয়', ১৯১১ সালে মোহনবাগানের সেই শিল্ড জয়ের কাহিনী। প্রথম উপন্যাস 'জুয়াড়ি'।
১৯৯২ সালে ক্রীড়া সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য রাজ্য সরকারের ক্রীড়া পুরস্কার পান।

প্রচ্ছদ □ নির্মলেন্দু মণ্ডল

একাদশ ইন্দ্রিয়

একাদশ ইন্দ্রিয়

রূপক সাহা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯

ISBN 81-7215-932-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৬৫.০০

‘সেবক-কে’

ট্রেন ছাড়তে আধ ঘণ্টা দেরি হবে। বেলডাঙায় সিগন্যালে কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে, সে জন্য। বহরমপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই মাইকে শুনতে পেলাম, "রাত দশটা পঞ্চাশের লালগোলা প্যাসেঞ্জার এগারোটা কুড়িতে ছাড়বে।"

শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ঘড়িতে এখন কাঁটায় কাঁটায় দশটা পঞ্চাশ। ঠিক টাইমে ট্রেন ছাড়লে, হয়তো মিস করতাম। সকালের লালগোলা ধরে আজই বেলা দেড়টা নাগাদ বহরমপুরে এসেছি। চন্দনাদির কাছে ভাইফোঁটা নিতে। গত কয়েকদিন ধরে, চন্দনাদি পাগল করে তুলেছিল আমাকে ফোনে। না এলে কষ্ট পেত। আমি আসায় এমন খুশি, এত রাতেও আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে গোরাবাজার থেকে।

আমার আপন দিদি নেই। কিন্তু চন্দনাদি দিদির থেকেও বেশি। বিডন স্ট্রিটে আমাদের পাশেই চন্দনাদিদের বাড়ি। আমার থেকে বছর পাঁচেকের বড়। ছোটবেলা থেকে তাই আমার গার্জেনের মতো। মায়ের মুখে শুনেছি, ছোটবেলায় টাইফয়েডে একবার আমি প্রায় মর মর। সেই সময় চন্দনাদি রাত-দিন আমার বিছানার পাশে বসে থেকে সারিয়ে তুলেছিল। আগে খুব শাসন করত। এখন সম্পর্কটা বন্ধুর মতো।

মাস তিনেক হল, চন্দনাদি হঠাৎ বহরমপুরে চলে এসেছে। এখানেও গোরাবাজারে ওদের বিরাট বাড়ি। কেন এসেছে, কাউকে বলেনি। তবে আমি জানি। রঞ্জনদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। রঞ্জনদার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা চন্দনাদির। সব ঠিক করা আছে। রঞ্জনদা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। খুব বনেদি পরিবারের ছেলে। বালিগঞ্জ প্লেসে ওদের বিরাট বাড়ি। আমি মাঝে মধ্যে যাই। রঞ্জনদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল। একটা সময় দু'জনের মধ্যে প্রচুর চিঠি চালাচালি করেছি। আজ এখানে এসে স্যাঙ্গুইন হয়ে গেলাম, চন্দনাদির হঠাৎ বৈরাগ্যের কারণ রঞ্জনদাই। প্রায় দশ ঘণ্টা রইলাম, অথচ একবারও রঞ্জনদার কথা জিজ্ঞেস করল না।

প্ল্যাটফর্মে লোকজন বিশেষ নেই। বেস্পতিবার বলে বোধহয়। দুপুরে ট্রেন থেকে নেমেই বুদ্ধি করে রাতের এই ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে নিয়েছিলাম। এক ঘুমে শেয়ালদা। জার্নি টেরও পাওয়া যায় না। ভাগ্যিস টিকিটটা সঙ্গে ছিল। তাই দিনের দিন ফিরে যেতে পারছি। না হলে চন্দনাদি ছাড়ত না। দু' তিন দিন নির্ঘাত আটকে রাখত। ফোন করে মাকে জানিয়ে দিত, ভাই এখন যাবে না। ব্যস, আমার কাজকর্ম চৌপাট হয়ে যেত।

অক্টোবরের শেষ। একটু শীত শীত করছে। এই সময়টায় এখানে এত ঠাণ্ডা পড়ে যায়, ভাবতেও পারিনি। কাল রাতেও, বিডন স্ট্রিটে আমাদের বাড়িতে, ফুল স্পিডে

পাখা চালিয়ে শুয়েছি। একটা হাফ হাতা সোয়েটার নিয়ে এলে ভাল হত। চন্দনাদির গায়ে একটা পাতলা শাল। দেখেই লেগ পুল করতে ইচ্ছে হল। ঠাট্টা করে বললাম, "এখান থেকে হিমালয় রেঞ্জটা কদ্দুর গো ?"

আনমনা হয়ে অন্য দিকে তাকিয়েছিল চন্দনাদি। বুঝতে পারেনি, ঠাট্টা করছি। বলল, "সে তো অনেক দূর। গঙ্গা পেরিয়ে ও দিক দিয়ে শিলিগুড়ি যাওয়া যায়। ওখান থেকে নেপাল, সিকিম, ভূটান যেখানে ইচ্ছে, যেতে পারবি। কেন রে ?"

—না। এমনি জিজ্ঞেস করলাম। যা ঠাণ্ডা পড়েছে, মনে হল হিমালয় রেঞ্জটা খুব কাছে।

শুনে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল চন্দনাদি, "এ মা, তোর ঠাণ্ডা লাগছে বুঝি ? এই শালটা নিয়ে যা ভাই। রাতে কেষ্টনগরের দিকে কিন্তু আরও শীত শীত করবে।" গায়ের শালটা খুলে আমার হাতে গছাবার চেষ্টা করল চন্দনাদি। তার পর বলল, "তোকে বললাম, খাওয়া-দাওয়া করে কাল দুপুরের দিকে ফিরে যা। শুনলি না। যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস।"

এই হচ্ছে আসল চন্দনাদি। সামান্য কারণে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠা আমার জন্য, বহু দিনের অভ্যেস। আর একবার ঠাণ্ডা লাগার কথা তুললেই, শুরু করে দেবে উপাখ্যান। ঠাণ্ডা লাগানোর জন্য অতীতে আমার কবে কী হয়েছে। প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্য বলে উঠলাম, "ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস কথাটা কি এখনকার যুগে অ্যাপ্রোপিয়েট, দিদিভাই ? বলো, মারুতিতে যেন স্টার্ট দিয়ে এসেছিস।"

—ওই হল। হ্যাঁ রে ভাই, মাসিমণি ফোনে সেদিন বলছিল, তুই নাকি পুজোর আগে একটা মারুতি জেন কিনেছিস ?

—হ্যাঁ, তোমাকে দেখানোর জন্য নিয়েও আসতাম। বাবলু ব্যাটা আসতে চাইল না। অ্যাদ্দিন গাড়ি চালাচ্ছে, তবু হাইওয়েতে ড্রাইভিং করার ভয় এখনও কাটিয়ে উঠতে পারল না।

—অন্য কোনও ড্রাইভার রাখতে পারছিস না ?

—পাচ্ছি না। দেখি রঞ্জনদাকে একবার বলে। জোগাড় করে দিতে পারে কি না।

এই প্রথম আমি রঞ্জনদার কথা তুললাম। নামটা যেন শুনতেই পেল না চন্দনাদি। বলল, "ভাই, মাসখানেক পর একবার আয় না। খাগড়ায় সাত দিন যাত্রা উৎসব। টপ টপ যাত্রার পার্টি আসছে। কলকাতায় তো দেখা হয় না। বেশ মজা হবে।"

—তুমি কী গো দিদিভাই। যাত্রাপাড়ার লোককে যাত্রা দেখার টোপ দিচ্ছ ? তুমি কবে ফিরে যাচ্ছ, আগে বলো।

—না রে। এখন যাওয়ার ইচ্ছে নেই। কলকাতা শহরটাই আমার দু' চোখের বিষ হয়ে গেছে।

কথাটা শুনে মুচকি হাসলাম। বোধহয় লক্ষ করেছিল। গম্ভীর হয়ে চন্দনাদি বলল, "হাসলি কেন ?"

—না, এমনি। রঞ্জনদা সেদিন বলছিল, সামনে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। তার পরই বইমেলা। মাঝে ডোভার লেনে মিউজিক কনফারেন্স। কলকাতা এখন গমগম

করবে। তবুও নাকি, কলকাতায় থাকতে রঞ্জনদার ভাল্লাগছে না।

চন্দনাদি হঠাৎ রেগে উঠল, "অ্যাই, বার বার ওই লোকটার নাম আমার সামনে করবি না তো ? তোর মতলবটা কী ?"

ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে। তবুও, নিরীহ মুখে বললাম, "কোনও মতলব নেই। বুটুদের বাড়িতে সেদিন দেখা হল রঞ্জনদার সঙ্গে। কালীপুজোর দিনই বোধহয়...কথায় কথায় বলল..."

—এই চুপ। কী বলল, আমার জানার কোনও ইচ্ছে নেই।

—লোকটাকে দেখে এত খারাপ লাগল...

—কেন, তার তো খারাপ থাকার কথা নয়। আমি সামনে নেই। আজকাল হেভি ড্রিঙ্ক করছে বোধহয় ?

—একদম না। বিশ্বাস করো দিদিভাই। একদম ও সব ছুঁচ্ছে না। নিজের চোখেও দেখলাম। পুলুদা অফার করল সেদিন। না বলে দিল। বাড়ি ভর্তি লোকজন। সবাই অবাক। পুলুদা ঠাট্টা করল, হ্যা রে চন্দনা বকবে বলে আজকাল খাচ্ছিস না ? তোমার নামটা শোনামাত্তর, কেমন যেন ছলছল করে উঠল রঞ্জনদার মুখটা।

কথাগুলো বলেই, চন্দনাদির মুখটা লক্ষ করতে লাগলাম। দেখি, বদল হয় কি না। না, হল না। এখনও রাগ পড়েনি তা হলে। আরও গল্প বানাতে হবে। ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়লাম, যাতে চন্দনাদি শুনতে পায়।

—তোর এ সব ফালতু কথা আমি বিশ্বাস করছি না ভাই। অন্য কোনও কথা থাকে তো বল।

—ইচ্ছে না হলে বিশ্বাস কোরো না। তাই বলে, সত্যিকে তো আর উল্টে দিতে পারবে না। বিশ্বাস না হয় তো, তিতলিকে ফোন কোরো। তোমার বোন নিশ্চয় মিথ্যে কথা বলবে না। সে দিন তিতলিও ওদের বাড়ি গেছিল। রঞ্জনদার চেহারাটাই কেমন যেন বদলে গেছে। আমাকে দেখে একবার শুধু বলল, ঋচীক ভাল আছ ? বলেই আনমনা হয়ে গেল।

—পুলুদাদের বাড়ি সেদিন আর কে কে গেছিল রে ?

—অনেকে। মাসি খুব নাম করছিল তোমার। একবার আমায় বলল, "চন্দনা তো এবার এখেনে নেই। ভাইফোঁটার দিন আমাদের বাড়ি চলে আসিস। বুটু তোকে ফোঁটা দেবে। আমি তখন বললাম, না মাসি, আমায় বোধহয় ওই দিন থাকা হবে না। বহরমপুরে না গেলে দিদিভাই রেগে যাবে। তখন পাশেই বসে ছিল রঞ্জনদা। আমাকে বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই উদয় হল প্রিয়াদি। ব্যস, জোর করে রঞ্জনদাকে তুলে নিয়ে গেল।

—প্রিয়া সেদিন ছিল নাকি ?

—অনেকক্ষণ। রঞ্জনদার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প-টল্প করল। পরে প্রিয়াদির মুখে শুনলাম, রঞ্জনদা নাকি চাকরি নিয়ে দুবাই চলে যাবে। দিল্লিতে গিয়ে কী একটা ইন্টারভিউও দিয়ে এসেছে পুজোর আগে।

কথাটা শুনে একটু আহত হল যেন চন্দনাদি। বলল, "ভাল, খুব ভাল। লোকটা বরাবরই কেরিয়ারিস্ট। দশ-বারো বছর ধরে তো দেখছি। কেরিয়ারের জন্য ও

সবাইকে ছাড়তে পারে।"

কাজে লাগছে ওষুধটা। উসকে দেওয়ার জন্য বললাম, "এটা কিন্তু তুমি ঠিক বললে না। তোমাকে অন্তত রঞ্জনদা ছাড়তে পারবে না।"

—চুপ কর তো। তুই কী জানিস? অ্যা। জানিস, কী অসভ্য হয়ে গেছে লোকটা?

—আমার মনে হয় না, রঞ্জনদা কোনও খারাপ কিছু করতে পারে।

—জানিস, একদিন ও আমাকে...ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলতে গেল চন্দনাদি। সামলে নিল, "না, এটা তোকে বলা যাবে না।"

—তা'লে বোলো না। তোমাকে সাবধান করার...করে দিলাম। প্রিয়াদিকে তো আমি চিনি। ক্লোজ হওয়ার চেষ্টা করছে রঞ্জনদার। তোমার লোকটাকে না পটিয়ে নেয়।

এ বার সত্যি সত্যি রেগে উঠল চন্দনাদি, "মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ ভাই। তোমার লোকটা...এর মানেটা কী? ওই লোকটার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক আর নেই। আই হেট হিম। কাওয়ার্ড কোথাকার। তিন মাস হতে চলল, একবারও ফোন করল না। একবার এখানে আসা তো দূরের কথা। আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। থিসিস পেপারটা কমপ্লিট করব। তার পর চাকরি নেব এখানকার কলেজে। কলকাতায় আর যাবই না।"

খুব হাসি পাচ্ছে কথাগুলো শুনে। আমি ভালমতন জানি, চন্দনাদি যা বলল, শেষে কোনওটাই করতে পারবে না। কাকাবাবুকে খুব ভয় পায় চন্দনাদি। কাকাবাবু যদি একবার বলে, সুড় সুড় করে ফিরে যাবে। আর বিয়ের পিঁড়িতে বসে মালা দেবে রঞ্জনদার গলায়। তিতলি হলে, অবশ্য কারও কথা মানত না। গলাটা নরম করে বললাম, "তুমি রাগ করলে দিদিভাই?"

—কেন করব না বল?

—থাক তা'লে। রঞ্জনদার নাম একবারও তোমার কাছে করব না। ভাল কথা, কাকাবাবু একবার বলছিল, পারলে চন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে এসো। বাড়ির কাছে এত বড় জগদ্ধাত্রী পুজো। এ সময়টায় থাকবে না। ভাল দেখাবে না।

—তোর কী বুদ্ধি রে ভাই। এতক্ষণ এখানে ছিলি। এ কথাটা আগে বলতে পারলি না?

—বললে তুমি যেতে? এই তো বললে কলকাতায় আর যাবে না।

—বাবাকে বলিস, থিসিস পেপারটা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি। বইমেলার সময় একবার যাব।

—সে তো মাস তিনেক।

—দেখতে দেখতে কেটে যাবে। হ্যাঁ রে, তিতলির খবর কী?

—উড়ে বেড়াচ্ছে।

—তার মানে?

—ইদানীং একটা বন্ধু জুটিয়েছে। নাম ঋষি। তার সঙ্গে ব্যবসায় নেমেছে।

—কীসের ব্যবসা?

—টি ভি সিরিয়াল তৈরির। তিতলি প্রোডাকশনস।

—যাঃ, তুই সত্যি বলছিস ! ও এসবের কী জানে ? টাকাই বা পেল কোথায় ? বাবা নিশ্চয় দেয়নি।

—কোত্থেকে পেতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?

—তুই দিয়েছিস ?

—আবার কে ? একদিন এসে ধরল। ভাগিয়ে দিলাম। তার পর বেশ কয়েকদিন পেছনে লেগে রইল। তার পর একদিন বলল, তোমরা কেউ চাও না, আমি ভাল কিছু করি। কোনও কাজে ব্যস্ত থাকি। শুনে ভাবলাম, দিই না হয় টাকাটা। একটা কিছু নিয়ে তো থাকবে তা'লে। বদমাইশিটা কমবে। তাই দিলাম।

—টাকাটা তো তোর জলে যাবে।

—যাক। কী আর করা যাবে।

—ওকে বিয়ে করে ফেলছিস না কেন ভাই ?

—তুমিই বা রঞ্জনদাকে বিয়ে করছ না কেন দিদিভাই ?

—ওই লোকটা আর তিতলি এক হল ? তিতলি তোকে কত ভালবাসে। ওর মতো মেয়ে ক'টা আছে ?

—রঞ্জনদার মতো লোক তুমিই বা ক'টা পাবে ? রঞ্জনদা তোমায় কম ভালবাসে ?

—আজকাল রঞ্জনের হয়ে এত ওকালতি করছিস, কী ব্যাপার রে ভাই ?

—তুমিও তো তিতলির হয়ে ওকালতি করছ। নিজের বোন বলে ?

চন্দনাদি প্রচণ্ড রেগে গেছে। ওর ফর্সা মুখটা এখন লাল কথাটা শুনে। মনে মনে হাসলাম। খোঁচাটা ইচ্ছে করেই দিলাম। আগে চন্দনাদির সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করতাম না। যা বলত, শুনতাম। এখন কথায় আমার সঙ্গে ঠিক পেরে ওঠে না। তখনই রেগে যায়। এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আজ বারতিনেক রাগালাম চন্দনাদিকে। কিন্তু ওর রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দনাদি বলল, "ভাই, তুই এখন আপন-পর দেখছিস, তাই না ?"

—কেন দেখব না বলো ? তুমি অ্যাদ্দিন এখানে রয়েছ, আমাদের কথা কখনও ভেবেছ ? রঞ্জনদার সঙ্গে সামান্য কী একটা হয়েছে, ব্যস অমনি আমাকে তুমি ভুলে মেরে দিলে। তোমার সঙ্গে আমার কী কথা ছিল, বলো ? কালীপুজোর সময় বুটুদের বাড়ি সারা রাত পুজো দেখবে। বলেছিলে কি না ?

—ফোন করে, তুই মনে করালি না কেন ?

—কেন করব ? আমি তো ফোঁটা নিতে আসতামই না। নেহাত মা বলল, বেচারি তোকে এত ভালবাসে। যা, একটা দিনের তো ব্যাপার। তাই এলাম। জানো, কাল সকাল থেকে আমার কত কাজ ?

কথা বলতে বলতেই হঠাৎ চন্দনাদির মুখের দিকে চোখ গেল। এবার সত্যিই মায়া হল মুখটা দেখে। চন্দনাদি এত সরল, এত ভাল, আজকাল এ রকম দেখা যায় না। তিতলিটা উচ্ছন্নে গেছে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বিয়ার পর্যন্ত খায়। কাউকে পরোয়া করে না। এমনকী কাকাবাবুকেও। চন্দনাদি একেবারে উল্টো। জীবনে কোনওদিন কোনও অন্যায় করেছে বলে মনে হয় না। এখানে আসার আগে... একদিন নাকি রঞ্জনদা একবার চুমু খেতে চেয়েছিল চন্দনাদিকে। তাও আলতো করে। শুনে চন্দনাদি এমন চটে যায়, সপ্তাহ খানেক কথা বলেনি। রঞ্জনদা তখন আমায় বলে,

মিটিয়ে দাও। তখন আমিও ভেবেছিলাম, বিয়ের যখন সবই ঠিকঠাক তখন আলতো একটা চুমুতে কী এমন পাপ হত ? কথাটা অবশ্য চন্দনাদিকে বলার সাহস আমার হয়নি। বললে আমার মুখ দর্শন করত না আর।

চন্দনাদির মুখ থমথম করছে। একটু তেল দেওয়া দরকার। একটু পরেই চলে যাব। আবার কবে দেখা হবে জানি না। কী দরকার, চটামটি করে ? এত কড়া কড়া কথা বলব, চন্দনাদি বোধহয় ভাবতেও পারেনি। একটু শক পেয়েছে। ছোটবেলা থেকে দেখছি, দিদিভাই খুব সেন্টিমেন্টাল। একদম নরম স্বভাবের। একবার বারণ সত্ত্বেও, পরীক্ষার আগের দিন আমি ময়দানে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্যাচ দেখতে গেছিলাম। বাপ রে, ফিরে এসে দেখি, চন্দনাদি কেঁদে কেটে অস্থির। তখন আমি হায়ার সেকেন্ডারি স্টুডেন্ট। একটাই কথা, "কেন, তুই আমার কথা শুনলি না ? জানিস, খেলার মাঠে কী রকম মারপিট হয় ? কেন তুই খেলা দেখতে গেলি ?" বাড়িসুদ্ধু লোক আমার উপর খাপ্পা। শেষে আমার বলতে হয়েছিল, আর কোনওদিন কথার অবাধ্য হব না। কলেজে ওঠার পর অবশ্য আমার পাখনা গজিয়েছিল। তখন আর অত ভয় পেতাম না।

কী একটা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি ট্রেন ঢুকছে স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে বেশ ভিড়। কথা বলতে বলতে এতক্ষণ লক্ষই করিনি। আমার সঙ্গে লাগেজ বলতে একটা কিট ব্যাগ। কাঁধে নিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের দিকে এগোলাম। ট্রেন মিনিট দু'য়েক দাঁড়াবে। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। চন্দনাদিকে বললাম, "আসি দিদিভাই। কাকাবাবুকে কিছু বলতে হবে ?"

—না। আগে তুই ওঠ। ফট করে ট্রেন ছেড়ে দেবে।

আমার টিকিট ডি-টুতে। ক্যুপে ঢুকে বার্থের উপর কিট ব্যাগটা রেখে জানলাটা তুলে দিলাম। বাকি তিনটে বার্থেও লোক এসে গেছে। উল্টো দিকে লোয়ার বার্থে এক ভদ্রমহিলা বসে। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়সের। তার পাশে তিতলির বয়সী একটা মেয়ে। ঠিক উপরের বার্থে চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সী একটা ছেলে উঠে বসেছে। এক ঝলকে মনে হল, তিন জন একই পরিবারের।

জানলায় চন্দনাদির মুখ। আমাকে বলল, "ভাই, রাতে কিছু জানলাটা বন্ধ করে দিবি। এই ট্রেনে চুরি-চামারি হয়।"

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বাজল। শুনে বললাম, "তুমি যাও। অনেক রাত্তির হয়ে গেছে।"

—তা হোক। রিকশাটা এখনও ছাড়িনি। তুই কিন্তু ফিরেই সকালে একবার ফোন করবি। না হলে আমি খুব দুশ্চিন্তায় থাকব।

—উফ্ দিদিভাই। ঠিক পৌঁছব। তুমি যাও।

ট্রেন নড়ে উঠল। এর আগে অনেকবার বহরমপুর এসেছি। একটা সময় কাকাবাবু প্রতি বছর আমাদের সব্বাইকে নিয়ে এখানে দোল খেলতে আসতেন। হইহই করে দিনগুলো সব কেটে যেত। আমার বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ার পর, এখানে আসা বন্ধ হয়ে যায়। বছর পাঁচেক পর, এবার এলাম বহরমপুর। ট্রেন ছাড়ার পর কেন জানি না মনে হল, দু'একটা দিন থেকে গেলে পারতাম। তা হলে পটিয়ে দিদিভাইকেও নিয়ে যাওয়া যেত। মনটা হঠাৎ একটু ভার হয়ে গেল। প্ল্যাটফর্ম

ছাড়িয়ে এসেছে ট্রেনটা। চন্দনাদি চোখের আড়ালে। বাইরে ঘন অন্ধকার। ঠাণ্ডা বাতাস মুখে লাগছে। জানলা থেকে তাই সরে এলাম।

কাল দুপুরে জরুরি একটা মিটিং আছে। ইস্টার্ন বাইপাস কানেক্টরে বিরাট একটা প্রোজেক্টে হাত দিচ্ছি। প্রায় এক একর জমির উপর একটা হাউসিং কমপ্লেক্স তৈরি করার। জমির মালিক কাল কথা বলতে আসবেন। ভদ্রলোককে নিয়ে আসবে আমার পার্টনার সুমিতাভ। বেলা বারোটার সময়। পুজোর আগে একবার ডেট করেছিল। আমি দেখা করতে পারিনি। সুমিতাভ তাই একটু অসন্তুষ্ট। বার বার বলে দিয়েছে, "জমিটা তোর জন্য হাতছাড়া হয়ে যাক, আমি চাই না।" সত্যি কথা বলতে কী, সুমিতাভ যাতে মনঃক্ষুণ্ণ না হয়, তার জন্যই ফিরে যাচ্ছি। দু'চার দিনের মধ্যে জমি সার্চ করাতে হবে। তারপর নানা হ্যাপা। আমরা হিসেব করে দেখেছি, যদি প্রোজেক্টটা ঠিকঠাক করতে পারি, তা হলে ষাট-সত্তর লাখ টাকা প্রফিট হবে।

ট্রেন স্পিড নিতেই উঠে দাঁড়ালাম। একটা সিগারেট খাওয়া দরকার। সদ্য এই অভ্যাসটা করেছি। এতক্ষণ সাহস হয়নি চন্দনাদির সামনে, এখন স্বচ্ছন্দে খাওয়া যায়। ক্যুপের ভেতরে খেলে ভদ্রমহিলাদের অসুবিধা হতে পারে। আড় চোখে একবার তাকালাম। উল্টো দিকের বার্থে মেয়েটা দু' হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে অল্প অল্প দুলছে। নিচু স্বরে তাকে কী যেন বোঝাচ্ছেন ভদ্রমহিলা। বোধহয় মা। মেয়েটা গ্রাহ্য করছে না। ভদ্রমহিলা খানিকটা বিব্রত মুখে আমার দিকে তাকালেন।

দরজা টেনে বাইরে বেরোতে যাব, এমন সময় হঠাৎই মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। প্রায় আমার কাঁধ সমান লম্বা। এক ঝলক দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। পরনে সালোয়ার-কামিজ। তা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে, গায়ের রঙ কাঁচা হলুদের মতো। মাথায় এক রাশ চুল। প্রায় কোমর পর্যন্ত। বোধহয় যত্ন নেয় না। মনে হল, এ রকম চুল পেলে তিতলিরা ধন্য হয়ে যেত। মুখের ত্বক এত মসৃণ, যেন মাখন দিয়ে গড়া। কিন্তু চোখের নীচে এক পোঁচ কালি। সারা মুখে কেমন এক ধরনের বিষণ্ণতা। মেয়েটা আমার পাশ দিয়ে গিয়ে, দড়াম করে বন্ধ করে দিল জানলাটা। তার পর রাগত চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়েই, ফের বার্থে গিয়ে বসল।

মনে মনে বিরক্ত হলেও প্রকাশ করলাম না। আচ্ছা অভদ্র মেয়ে তো? জানলাটা বন্ধ করে দিল। ভদ্রতা করে পারমিশন পর্যন্ত নিল না। কোনও কথা না বলে প্যাসেজে বেরিয়ে সিগারেট ধরালাম। সুন্দর দেখতে বলে মেয়েটা বোধহয় একটু উদ্ধত টাইপের। মা আর ভাইকে দেখে মনে হল, বেশ বিত্তবান পরিবারের।

বহরমপুরের লোকেদের হাতে বেশ পয়সা আছে। চন্দনাদিদের এস্টেট দেখাশুনো করেন প্রসাদকাকা। বিচক্ষণ মানুষ। আজ দুপুরে খেতে বসে গল্প করছিলেন আমার সঙ্গে। বললেন, "এখানে দু' ধরনের লোকের হাতে প্রচুর টাকা। কিছু লোক আছেন নবাব আমলের সম্পত্তির মালিক। যেমন তোমার দিদিভাইয়ের পূর্বপুরুষরা...বনেদি পরিবার। বিরাট এস্টেট রেখে গেছেন। আর এখন একদল লোকের হাতে কাঁচা পয়সা এসে গেছে। কাছেই বর্ডার। বুঝলে বাবা, স্মাগলিং করে করে এরা বড়লোক হয়ে গেল।"

সিগারেট শেষ করে মিনিট পাঁচেক পর ক্যুপে ফিরে এলাম। শুয়ে পড়া দরকার। জানলাটা তুলে দিলাম। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগল। কিট ব্যাগটাকে

বালিশের মতো করে শোয়ার উদ্যোগ করছি। এমন সময় মেয়েটা বলে উঠল, "মা, কী অসভ্য ছেলে দেখো। ফের জানলাটা তুলে দিল।"

মাথা খারাপ নাকি মেয়েটার? ঘুরে তাকাতেই, ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন, "আমার মেয়ের কথায় কিছু মনে কোরো না বাবা।" তার পর মেয়েটাকে বললেন, "ছি মা, এসব কথা বলতে আছে?"

বললাম, "আপনাদের যদি অসুবিধা হয়, তা হলে জানলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি।"

—দিলে ভাল হয়। তুমি কি শেয়ালদা পর্যন্ত যাবে?

—হ্যাঁ।

—চন্দনা তোমার কে হয়?

—আপনি দিদিভাইকে চেনেন?

—চিনি। ওদের বাড়ি আমাদের কাছাকাছি। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে ও খুব আসত।

মেয়েটা মায়ের কোলে মাথা দিয়ে, পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ভদ্রমহিলা। চোখ বুজে মায়ের আদর নিচ্ছে মেয়েটা। ওই অবস্থায় বলল, "মা, লাইট বন্ধ করবে না কিন্তু।"

আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল তো? আলো জ্বলা থাকলে আমি ঘুমোতে পারব না। মেয়েটা যা শুরু করেছে, রাত্তিরটা বোধহয় জেগে কাটাতে হবে। জিয়া জেফরির একটা বই নিয়ে এসেছি। কিট ব্যাগে রয়েছে। দ্য ইনভিজিবলস। হিজড়েদের নিয়ে লেখা। আসার সময় অর্ধেকটা পড়েছি। তেমন হলে বাকিটা আজ রাত্তিরেই না হয় পড়ে নেব।

—বাবা, তোমাকে আমরা একটু অসুবিধেয় ফেলেছি, না?

ভদ্রমহিলার কথা শুনে বললাম, "না, না। এমনিতে রোজ দেরি করে ঘুমোই। আপনি সঙ্কোচ করবেন না।"

—কলকাতায় থাকো বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কী নাম তোমার?

—ঋচীক বসু।

—অদ্ভুত নামটা তো! ঋচীক মানে কী বাবা।

—সূর্য।

—কে রেখেছিল নামটা?

—মা।

—মা ছাড়া তোমার আর কে কে আছেন?

—দাদা। সুইজারল্যান্ডে থাকেন। ওখানে সেটল করে গেছেন।

—তুমি কী করো বাবা?

এই সময় মেয়েটা চোখ খুলে, গলায় বিরক্তি ঢেলে বলল, "আহ, চুপ করবে মা? তখন থেকে বকবক করছ।"

ভদ্রমহিলা চুপ করে গেলেন। মেয়ের বেয়াদপিতে যথেষ্ট বিরক্ত। মুখ চোখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে উনি জানলার দিকে তাকিয়ে

রইলেন। মেয়েটার ওপর রাগ হচ্ছে। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকাতেই রাগটা চলে গেল। কী অসহায় ওই মুখটা।

ওপরের বার্থে ছেলেটা শুয়ে পড়েছিল। ঘুমোয়নি। নীচের দিকে মুখ করে বলল, "মা, জিজ্ঞেস করো তো শেয়ালদা থেকে বালিগঞ্জ কীভাবে যাওয়া যাবে?"

ছেলেটাকে বললাম, "সব থেকে ভাল ট্যাক্সি করে যাওয়া।"

—অত ভোরে ট্যাক্সি পাওয়া যায়?

—লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

ভদ্রমহিলা এ বার বললেন, "সাত-আট বছর পর কলকাতায় যাচ্ছি। আমরা মফস্বল শহরের লোক। কলকাতায় যেতে ভয় করে বাবা। খবরের কাগজে রোজই পড়ি খুন, রাহাজানি...।"

বললাম, "না। না। কলকাতা এখন অনেক শান্ত মাসিমা।"

কথার ঝোঁকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 'মাসিমা'। ভদ্রমহিলা একটু খুশি হয়েই বললেন, "তুমি থাকো কোথায় বাবা?"

—বিডন স্ট্রিটে।

—ছাতুবাবুর বাড়ির কাছে?

—দু'তিনটে বাড়ির পরেই। ছাতুবাবুর নাম আপনি জানেন?

—কেন জানব না? ওখানে আমার নন্দাইয়ের বাড়ি। ওনার বাবা ব্যারিস্টার ছিলেন। প্রিয়নাথ মিত্তির। চেনো?

—না।

—আগে খুব যেতাম। মুনের বাবা তখন বেঁচে। ফি বছর চড়কের মেলার সময় আসতাম। বলেই ভদ্রমহিলা চুপ করে গেলেন।

দরজাটায় টকটক শব্দ। উঠে খুলে দিতেই দেখলাম, চেকার। ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে টিকিট দেখতে চাইলেন। পকেট থেকে বের করে দেখালাম। ওপরের বার্থে ছেলেটা টিকিট খুঁজছে বোধহয়। এমন সময় নীচের বার্থ থেকে মুন বলে মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, "মা, ওই লোকটা।"

মাকে জড়িয়ে মুন থরথর করে কাঁপছে। হঠাৎ কী হল, বুঝতে পারলাম না। মনে হল, মুন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে চেকারকে দেখে। ভয়ার্ত ওই চিৎকার শুনে চেকার ভদ্রলোকও এক হাত পিছিয়ে গেছেন। অবাক হয়ে মুনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওপরের বার্থ থেকে লাফিয়ে নামল ছেলেটা। পকেট থেকে টিকিট বের করে দেখাতেই চেকার তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

দরজা বন্ধ করে ছেলেটা বলল, "এই দিদি, চেকার চলে গেছে। ওঠ।" মাকে আঁকড়ে রেখে মুন বলল, "না। না। লোকটা আমার মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেবে। ইন্দ্র, তুই জানিস না।"

ইন্দ্র বলল, "আবার সেই এক কথা। চেয়ে দ্যাখ, কামরায় কেউ নেই। মা, আমি আর ঋচীকদা ছাড়া। শুয়ে পড় তো। মাকে আর জ্বালাস না।"

মুন গ্রাহ্যই করল না ইন্দ্রর কথা। ছটফট করতে করতে ও বলল, "মা, ইন্দ্রকে তুমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে বলো। লোকটা আবার আসবে। আমি জানি। স্নিগ্ধা আমায় বলে গেছে।"

মাসিমা দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছেন মুনকে। বললেন, "দরজা লক করে দিচ্ছি। কেউ যাতে ঢুকতে না পারে। ভয় পাস না মা। ঋচীক আছে। লোকটাকে ও খুব মারবে।"

এই কথাটায় বোধহয় কাজ হল। মুন চুপ করে গেল। ইন্দ্র এ বার আমাকে বলল, "ঋচীকদা, লাইটটা যদি জ্বলা থাকে, তা হলে কি আপনার খুব অসুবিধে হবে?"

তাড়াতাড়ি বললাম, "না। না। কোনও অসুবিধে হবে না। লোকটা যদি ফের আসে, তা হলে দু'জনে মিলে আচ্ছা করে পেটানো যাবে। কি বলো, ইন্দ্র? তোমরা বরং শুয়ে পড়ো। আমি জেগে আছি।"

কথাটা শুনে ইন্দ্র ফের ওপরের বার্থে উঠে গেল। একটু পড়েই, শান্ত হয়ে মুন মায়ের কোলে মাথা রেখে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। জানলায় ঠেস দিয়ে মাসিমা ঝিমোতে লাগলেন। কিট ব্যাগ থেকে জিয়া জেফরির বইটা বের করে আমি পড়তে শুরু করলাম। ডুবে গেলাম হিজড়েদের আশ্চর্য জগতে। তখন আর মনেই রইল না, আশপাশে কে আছে।

দিল্লিতে মারপিট শুরু হয়েছে হিজড়েদের দুই দলে। এলাকা দখল করা নিয়ে। একদল জমায়েত হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। তাদের এলাকায় অন্য দলের হিজড়েদের রোজগার করতে দেবে না। জিয়া জেফরি খুব সুন্দরভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন গল্পটাকে। পড়ছি, আর অবাক হচ্ছি। আমেরিকা থেকে এসে দিল্লিতে তিন বছর হিজড়েদের সঙ্গে থেকে উপন্যাসটা লিখেছেন ভদ্রমহিলা। একদম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, বাস্তবধর্মী উপন্যাস। একে বলে ডকু নভেল। এত পরিশ্রম আমাদের লেখকরা করেন না।

রাস্তা-ঘাটে অনেক সময় হিজড়েদের চোখে পড়ে। ওদের নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে। কিন্তু কেউ মাথা ঘামায় না। জিয়া জেফরির বইটা পড়তে পড়তে মনে হল, ওদেরও নিজস্ব একটা সমাজ আছে। তাতে প্রচণ্ড বিধিনিষেধ, অনুশাসন আর গোপনীয়তা। প্রয়োজনে ওরা মারাত্মক ক্রুর হতে পারে। আবার কোনও কোনও সময় অত্যধিক স্নেহপ্রবণ। ওরা ভীষণ সংঘবদ্ধ। আশপাশে ডেরা বাঁধলেও, ওরা ঠিক আমাদের সমাজে নেই। নিজেদের মধ্যে একটা অদৃশ্য দেওয়াল তুলে রেখেছে।

হঠাৎ গোঙানির শব্দ শুনে চমকে তাকালাম। মুন অদ্ভুত আওয়াজ করছে মুখ দিয়ে। বোধহয় কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছে। মাসিমা অতি কষ্টে একবার চোখ খুলে ওকে ঠেলে দিলেন। গোঙানি বন্ধ হয়ে গেল। মাসিমার দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হচ্ছে। কোনও সন্দেহ নেই, মুন অসুস্থ। এ রকম একটা মেয়েকে চব্বিশ ঘণ্টা যাঁরা সামলান, তাঁরাও সুস্থ থাকতে পারেন না। হাতঘড়ির দিকে দেখি, রাত প্রায় একটা। এ বার শুয়ে পড়া দরকার। আলো জ্বালানো থাকলে ঘুম আসবে না। কী আর করা যাবে। শোয়ার আগে, হঠাৎ একটু ধূমপান করার ইচ্ছে হল। সাবধানে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এত রাতে কারও জেগে থাকার কথা নয়। সব ক'টা ক্যুপ বন্ধ বলে প্যাসেজে অন্ধকার। টয়লেটের সামনে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ট্রেন এখন কোথায়, জানি না। বেশ স্পিডে দৌড়চ্ছে। অল্প অল্প দুলছে। সিগারেট ধরিয়ে চন্দনাদির কথা ভাবতে লাগলাম। মা একদিন বলছিল, চন্দনাদির বিয়েতে নাকি কাকাবাবু খুব

ধুমধাম করবেন। দিনও ঠিক করে রেখেছেন, চৌদ্দই ডিসেম্বর। কাকাবাবু তো জানেন না, চন্দনাদি আর রঞ্জনদার সম্পর্কটা এখন কেমন জট পাকিয়ে রয়েছে। জানার কথাও নয়। জানি একমাত্র আমি। এই জটটা আমাকেই খুলে দিতে হবে। একটা নাটক-টাটক করে। চন্দনাদিটা এত সরল, বুঝতেও পারবে না।

কাকাবাবু আমাদের গার্জেনের মতো। বাবার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর কাকাবাবু আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। জ্ঞাতিরা আমাদের পিছনে লেগেছিল। হয়তো বসত বাড়িটারও পার্টিশন হয়ে যেত। কাকাবাবু আইনগত দিকটা না সামলালে, হয়তো কলুটোলায় আমাদের একটা বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যেত। দাদা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সুইজারল্যান্ড যায়, সেই সময় খুব সাহায্য করেছিলেন কাকাবাবু। বিয়ে-থা করে দাদা ওখানে সংসার পেতেছে। বৌদি সুইস, তাই নাগরিকত্বও পেয়ে গেছে। জুরিখে দাদা খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। কী একটা সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। দু'তিন বছর অন্তর সবাইকে নিয়ে কলকাতায় আসে। তখন আমাদের বাড়িতে হইচই পড়ে যায়।

দাদার খুব ইচ্ছে, বাবার নামে একটা কিছু করার। আগের বার এসে কথাটা কাকাবাবুকে বলেছিল। যদি বাচ্চাদের জন্য একটা হাসপাতাল করা যায়। টাকার অভাব হবে না। জুরিখের ওই সমাজসেবী সংস্থাই সাহায্য করবে। শুনে কাকাবাবুই প্রস্তাব দিয়েছে, আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে একটা বাড়ি কিনে নিতে। শরিকি মামলা চলছে বাড়িটা নিয়ে। কাকাবাবুর হাতে সেই মামলা। কম দামে পাওয়া যাবে বাড়িটা। আমি বলেছি, বাড়িটার মেরামতির খরচ আমি দেব। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আসার কথা এ বার দাদার। বলছে, মাকে নিয়ে যাবে। এর আগে আমাদের অনেকবার নিয়ে যেতে চেয়েছে। মা যায়নি। প্রতিবার বলেছে, "তা হলে বাড়ির কী হবে ? বাড়ি ফেলে যাব কী করে ?"

মাঝে একবার মায়ের এই কথা শুনে কাকাবাবু হাসতে হাসতে নাকি বলে ফেলেন, "আমার তিতলি পাগলিটাকে আপনি নিন বৌঠান। তা হলে আর কোনও প্রবলেম থাকবে না। আমরাই আপনার বাড়ি পাহারা দিয়ে দেব।" শুনে মা গম্ভীর হয়ে গেছিল। কিন্তু হ্যাঁ বা না কিছু বলেনি। আমি অবশ্য কথাটা নিজের কানে শুনিনি। কথায় কথায় একদিন বলে ফেলেছিল চন্দনাদি। বিয়ে নিয়ে এখনও কিছু ভাবিনি আমি। তিরিশ পেরোবার আগে কোনও ছেলের বিয়ে করা উচিত বলে আমি মনে করি না।

দরজা সরিয়ে কেউ বোধহয় বেরোচ্ছে ক্যুপ থেকে। মুখ বাড়াতেই দেখলাম, মুন। প্যাসেজে বেরিয়ে এসেছে। সম্ভবত টয়লেটে যাবে। এই সময় টয়লেটের সামনে আমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। দরজা ফাঁক করা রয়েছে বলে, আলো ঠিকরে বেরিয়েছে প্যাসেজে। মুন এখুনি আমাকে দেখতে পাবে। একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। উল্টো দিকের দরজার কাছে সরে যাব ? কথাটা একবার মনে হল বটে, কিন্তু মন থেকে উড়িয়ে দিলাম। ঘণ্টা দুয়েক আগে চেকারকে দেখে মুন যেভাবে চিৎকার করে উঠেছিল, এখন আবছা অন্ধকারে যদি আমাকে দেখে তা করে, লজ্জায় পড়ে যাব।

প্যাসেজে দাঁড়িয়ে মুন একদৃষ্টিতে ক্যুপের ভিতরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বোধহয়, লক্ষ করছে মা আর ভাই ঘুমিয়ে আছে কি না। ওকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু অবাক হলাম। টয়লেটে যাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে বেরিয়ে এলে ও দাঁড়িয়ে থাকত না। ওর ঠোঁট নড়া দেখে বুঝতে পারলাম বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। লাইনে চাকার ঘটঘট শব্দ হচ্ছে। তাই ওর কথা শুনতে পেলাম না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করতে লাগলাম। চুলের গোছা গুটিয়ে মুন খোপার মতো করে নিল। মনে মনে বোধহয় কিছু ঠিক করে নিয়েছে। তারপর কয়েক পা হেঁটে এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। দু'হাতের মধ্যেই আমি দাঁড়িয়ে। আমাকে ও দেখতে পায়নি। এ বার হাত বাড়িয়ে দরজার লক খুলল মুন। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ভেতরে ঢুকে এল। সেই হাওয়ায় খোপা খুলে গেল ওর। চুল উড়তে লাগল। ওড়নাটা এসে লাগল আমার মুখে।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুন। টলছে। যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। কী চাইছে ও ? সন্দেহ হচ্ছে। কথাটা মনে উদয় হওয়া মাত্রই দেখলাম, ও ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে।

॥ দুই ॥

ট্রেন শেয়ালদায় পৌঁছল ভোর ছ'টায়। সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। চোখ কটকট করছে। ট্রেন সোদপুর পেরোবার পরই টয়লেটে গিয়ে মুখ-চোখে একবার জল দিয়ে এসেছি। তা সত্ত্বেও, কটকটানি যায়নি। ইন্দ্রর অবস্থা ঝোড়ো কাকের মতো। সারারাত ও ঠায় বসেছিল আমার পাশে। এমন একটা ভয়ানক রাত বোধহয় কখনও ও কাটায়নি।

উল্টোদিকের বার্থে মুনের হাত ধরে বসে রয়েছেন মাসিমা। সারাটা রাত চোখের জল ফেলেছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, মাসিমার মুখে কালো একটা ছাপ পড়ে গেছে। মিনিট দশেক আগে মুনকে ধরে টয়লেটে নিয়ে গেছিলেন। ফিরে ওর চুল আঁচড়ে, দু'বেণী করে দিয়েছেন। মুনকে দেখে মনেই হচ্ছে না, কাল রাতে একটা ঝড় বয়ে গেছে ওকে নিয়ে।

ইন্দ্রদের সঙ্গে রয়েছে বড় দুটো সুটকেস। একটা কুলি ডেকে, তার মাথায় চাপিয়ে দিলাম। আমার সঙ্গে শুধু কিট ব্যাগ। ওটা তুলে কাঁধে ঝোলানোর সময় টের পেলাম, ডান হাতের কবজিটা টনটন করছে। কাল রাতে মুন কামড়ে দিয়েছিল। রক্ত জমাট বেঁধে আছে। মানুষের দাঁতে বিষ থাকে ? জানি না। হাত ছাড়ানোর জন্য, বাধ্য হয়েই কাল মুনের গালে একটা চড় মেরেছিলাম। এখনও ওর গালে আমার তিনটে আঙুলের দাগ।

প্ল্যাটফর্মে নেমে মাসিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কি ঠিকঠাক যেতে পারবেন ?"

—ঠিক বুঝতে পারছি না। অনেকদিন আগে একবার গেছিলাম। সেবার মুনের বাবা ছিলেন সঙ্গে।

শেয়ালদা থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি নিয়ে আসবে বাবলু। গতকাল ট্রেনে ওঠার আগে ওকে বলে দিয়েছি। মাসিমার অসহায় মুখটার দিকে তাকিয়ে কী

মনে হল, বললাম, "চলুন, আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি। আমার গাড়ি আসবে।"

—তা হলে খুব ভাল হয় বাবা। তোমার অসুবিধে হবে না তো ?

—না। না। ঠিক আছে। মুন যদি রাস্তায় অ্যাবনর্মাল বিহেভ করে, তা'লে আপনারা মুশকিলে পড়ে যাবেন।

—মাসিমার চোখ ফের ছলছল করে উঠল। বললেন, "আগের জন্মে তুমি বোধহয় আমাদের কেউ ছিলে বাবা। কাল রাত থেকে তোমাকে আমরা খুব উত্ত্যক্ত করছি।"

অত সকালে শেয়ালদা স্টেশনে এত লোক থাকতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। পাশের লাইনে আপ ট্রেন ছাড়বে। লোক দাঁড়িয়ে আছে। শেয়ালদা স্টেশনটা রাতের দিকে ভবঘুরে আর ভিখিরিদের আস্তানা হয়ে যায়। তারাও রয়েছে বেঞ্চ আর প্ল্যাটফর্মে। মুনের একপাশে মাসিমা। আর অন্য পাশে আমি। এত লোকজন দেখে যদি ভয় পেয়ে যায়, সেই আশঙ্কায় মুনের কাছাকাছি হাঁটছি। কেন জানি না, বারবার ওর দিকে চোখ যাচ্ছে। ওকে আমার আরও ভাল লাগছে।

হঠাৎই মুন বলে উঠল, "এই, কাল রাতে তুমি আমায় মারলে কেন ?" প্রশ্নটা করে ও দাঁড়িয়ে গেল।

বললাম, "তুমি আমার হাতের কী অবস্থা করেছ, জানো ?"

—আমি ? কখন ? মিথ্যুক কোথাকার।

—এই দ্যাখো। বলেই হাতটা মেলে ধরলাম। কবজিতে দাঁতের দাগ স্পষ্ট। জায়গাটা লালচে হয়ে রয়েছে। ফের টনটন করে উঠল।

মুন বলল, "ইস। ওখানে কিন্তু দাগ হয়ে যাবে। তুমি টিটেনাস নেবে চলো। ভাই একবার খেলতে গিয়ে পায়ে পেরেক ফুটিয়ে এসেছিল। মাগো, কী রক্ত। বাবা তখন টিটেনাস দিতে গেল।"

—ভাই বোধহয় খুব দুষ্টুমি করে ?

—এই না। আমার ভাই খুব ভাল।

চায়ের স্টলের পাশে একটা পাগলি দাঁড়িয়ে, হাতে ভাঁড়। গায়ে ময়লা একটা কাঁথা। চুলে জট। কিন্তু কপালে সিঁদুরের বড় টিপ। আমাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ পাগলিটা হাসতে শুরু করল। চোখাচোখি হতেই পাগলিটা ছড়া কাটল, "যতই করো চেষ্টা, যা করবে কেষ্টা, তাই হবে শেষটা।"

আশপাশের লোকজন হাসছে। কড়া চোখে তাকালাম। তা দেখে পাগলিটা পাল্টা ভয় দেখাল, হাতের ভাঁড় ছোড়ার ভঙ্গি করে। মুনেরও চোখ গেছে তখন পাগলিটার দিকে। ভয়ে ও আমার হাত জড়িয়ে ধরেছে। এই সময় চায়ের দোকানের ছেলেটা বলল, "বাবু, পাগলিটাকে একটা পাউরুটি কিনে দিন। তা হলে আর ডিসটার্ব করবে না।"

বাহ্, বেশ বুদ্ধি তো ছেলেটার ! নিজের দোকানের পাউরুটি বিক্রি করার জন্য বেশ পাগলি ফিট্ করে রেখেছে। মুনের হাত ধরে টেনে, হাঁটতে শুরু করলাম। মুন এখনও আমার হাতটা ছাড়েনি। হাঁটার ফাঁকে হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করতেই, ও আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। ওর শরীরের একটা অংশ হাতে লেপ্টে রয়েছে। অস্বস্তি হচ্ছে। জীবনে কখনও কোনও মেয়ের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে হাঁটিনি। মুনকে তো, বলতে গেলে আমি তেমন চিনিও না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা দেখছি।

মেন স্টেশনের ইনফরমেশনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকার কথা বাবলুর। ওখানে পৌঁছে ওকে দেখতে পেলাম না। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মুনের সঙ্গে আমাকে এভাবে দেখলে, নির্ঘাত ও মায়ের কাছে গিয়ে গল্প করত। এমনিতেই আমার হাতের যা অবস্থা, তাতে মায়ের কাছে একটা গল্প ফাঁদতে হবে। কী বলব, এখনও ঠিক করিনি। মা যে ভীতু টাইপের, তা নয়। কিন্তু আমার সামান্য কিছু হলে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তখন আমারই খারাপ লাগে। পরে ভাবি, মা তো অমন করবেই। আমি ছাড়া মায়ের আর কে আছে এখানে ? দাদা কোনওদিন ফিরবে বলে মনে হয় না।

ইনফরমেশন অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে বাবলুর জন্য অপেক্ষা করছি। সুটকেসের উপর বসে পড়েছে মুন। কাল রাত থেকে একফোঁটা জল পর্যন্ত মুখে দেননি মাসিমা। ইন্দ্র চা আনতে গেছে মাসিমার জন্য। স্টেশনের এ দিকটায় প্রচুর লোক। ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন ধরতে ছুটছে আশপাশ দিয়ে। চাতালে খবরের কাগজ, সিগারেটের স্টল সাজিয়ে বসে গেছে কয়েকজন। সময় কাটানোর জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা কিনলাম। বাড়িতে আনন্দবাজার ছাড়াও নিই স্টেটসম্যান।

প্রথম পাতায় চোখ বোলাচ্ছি। মায়ের সঙ্গে কথা বলছে মুন। খবরে মন দিতে পারছি না। বারবার চোখ চলে যাচ্ছে মুনের দিকে। মেয়েটা আমাকে টানছে। ভীষণ টানছে। এরকম অনুভূতি আগে কখনও আমার হয়নি কোনও মেয়েকে দেখে। হঠাৎ কানে এল মুনের কথা, "মা, আমিও কি ওই পাগলিটার মতো হয়ে যাব ? ওইরকম বিচ্ছিরি ?"

মাসিমা বললেন, "না, মা। তুই আমার কত সুন্দর মেয়ে।"

—ওই পাগলিটা পাগল হল কেন মা ?

—জানি না।

—মা, আমি পাগলি হয়ে গেলে, তুমি কি আমায় বাড়ি থেকে বের করে দেবে ?

—তুই পাগলি হবি কেন মা ?

—তবে যে সংঘমিত্রা কলেজে গিয়ে রটিয়েছে।

—সংঘমিত্রার সঙ্গে মিশিস না।

—আমি আবার কবে কলেজ যাব মা ?

—এবার ফিরে গিয়েই তোকে কলেজে পাঠাব।

—কলকাতায় আমরা কেন এসেছি মা ?

—তোকে ডাক্তার দেখাতে।

—কেন, আমার কী হয়েছে ?

—তুই মন খারাপ করে থাকিস। ভয় পাস, রাতে ঘুমোস না, তাই।

—কলকাতায় আমরা কদ্দিন থাকব ?

—ডাক্তারবাবু যদ্দিন থাকতে বলবে।

—আমি আগে আরও সুন্দর ছিলাম, তাই না মা ? সংঘমিত্রা সেদিন বলল, মুন তোর চোখে কালি পড়ে গেছে।

—সে জন্যই তো তোকে নিয়ে যাচ্ছি ডাক্তারবাবুর কাছে।

—এই ডাক্তারটা আমাকে ইলেকট্রিক শক দেবে না তো ?

—না না। ইনি খুব বড় ডাক্তার। দেখবি চল। তোকে এমন ওষুধ দেবে, চট

করে তুই ভাল হয়ে যাবি। বহরমপুরে ভাল ডাক্তার আছে নাকি ?

মুন কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হাঁফাতে হাঁফাতে হাজির হল বাবলু। ওকে দেখে রাগ হয়ে গেল। মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে আছি। রাগ হওয়ারই কথা। নির্ঘাত ঘুম থেকে দেরি করে উঠেছে। এখন আষাঢ়ে গপ্প ফাঁদবে। বাবলু আমার থেকে দু'তিন বছরের ছোট। ওর মা গীতামাসি আগে আমাদের বাড়িতে কাজ করত। তখন থেকেই মায়ের সঙ্গে আসত বাবলু। ফাইফরমাশ খাটত। লেখাপড়া বিশেষ কিছু করেনি। বড় হওয়ার পর আমিই ওকে ড্রাইভিং স্কুলে পাঠাই। লাইসেন্স বের করে দিই। এখন আমার গাড়ি চালায়। আমাদের বাড়িতেই থাকে। ওস্তাদ ছেলে। খুব ভক্ত অকছয়কুমারের। ফাইটিং শেখার জন্য ও নাকি কোম্পানি বাগানের ওদিকে কোথাও ক্যারাটে ক্লাবে যায়।

কড়া গলায় বললাম, "এত দেরি করলি কেন রে ?"

ধমক খেয়ে বাবলু একটু ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, "আর বোলো না। ভাবলাম সাড়ে পাঁচটার সময় বাড়ি থেকে বেরোব। দশ মিনিটের মধ্যে স্টেশনে পৌঁছে যাব। গাড়ি নিয়ে বেরোবার সময় দেখি, এক শালিক।"

—ব্যস, তুই বসে রইলি ? দু'শালিক দেখার জন্য ? ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল বাবলু। তার পর বলল, "সকালবেলায় এক শালিক দেখলে দিনটা যে খুব খারাপ যায়।"

—তুই আর বদলাবি না। নে, সুটকেস দুটো তোল।

—তুমি তো সুটকেস নিয়ে যাওনি !

—আমার না রে গাধা, এদের। বলে মুন আর মাসিমাকে দেখালাম। মুন উঠে দাঁড়িয়েছে। মুনের দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে বাবলু সুটকেস দুটো তুলে নিল। ওকে বললাম, "এদের বালিগঞ্জে পৌঁছে দিতে হবে। তার পর বাড়ি। আগে সুটকেস দুটো ডিকিতে রেখে আয় তুই।"

ইন্দ্র সেই যে চা আনতে গেছে, এখনও ফেরেনি। শিয়ালদার স্টেশন অ্যান্টিসোসালদের ডেন। কোনও ঝঞ্ঝাটে পড়েনি তো ? মফস্বলের সাদাসিধে ছেলে। ইন্দ্রদের নিয়ে খুব মুসকিল। ঘড়িতে এখন পৌনে সাতটা। ঠিক সময়ে বাবলু এলে এতক্ষণে আমার বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার কথা। এখান থেকে বালিগঞ্জ যেতে লাগবে আধঘণ্টা। সাড়ে আটটার আগে বাড়ি ফেরা যাবে না। মা খুব চিন্তা করবে। মাকে একবার ফোন করে দিলে ভাল হত।

চায়ের স্টল পর্যন্ত গিয়ে একবার দেখে আসব কি না ভাবছি, এমন সময় দেখি ইন্দ্র আসছে। মুখটা ফ্যাকাশে। কাছে এসে ও বলল, "মা, শিগগির চলো এখান থেকে। পান্না মাস্তানের ছেলেরা আমায় ধরেছিল।"

—কেন রে ?

—আমায় দেখে বলল, এই তুই গোরাবাজারে থাকিস না ? যা মালকড়ি আছে দিয়ে যা।

—তার পর ?

—ওরাই পকেট থেকে সব টাকা নিয়ে নিল।

—কত টাকা ছিল রে ?

—শ' দুয়েক।

—যাক, অল্পের ওপর দিয়ে গেল। চল, বাবা, যা দিনকাল পড়েছে...

ইন্দ্রর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "কে তোমার পকেট থেকে টাকা নিল ?"

মাসিমা বললেন, "ছেড়ে দাও বাবা। বহরমপুরে এখন বাস করা কঠিন হয়ে গেছে। ওখানে একজন কড়া পুলিশ সুপার এসেছেন। তাঁর ভয়ে অ্যান্টিসোশালরা সব বহরমপুর-ছাড়া। কেউ বর্ডার পেরিয়ে ওদিকে চলে গেছে। কেউ এসে লুকিয়েছে কলকাতায়। এরা মাঝে মধ্যে শেয়ালদা স্টেশনে এসে বসে থাকে। বহরমপুরের লোকজন পেলে ভয় দেখিয়ে টাকা পয়সা সব কেড়ে নেয়। বিজনেস করে যারা, মাল কেনার জন্য অনেকেই তারা কলকাতায় আসে টাকাকড়ি নিয়ে। অ্যান্টিসোশালরা তাদের মুখ চেনে।"

শুনে ইন্দ্রকে বললাম, "ছেলেগুলো কোথায়, দেখাতে পারবে ?"

আঁতকে উঠলেন মাসিমা, "না বাবা, কোনও ঝামেলায় যেয়ো না। পরে এদের লোকজন বহরমপুরে আমাদের পিছনে লেগে যাবে।"

রাগ হচ্ছিল, তবু চেপে গেলাম। সবাই মিলে গাড়িতে এসে বসলাম যখন, ঘড়িতে তখন প্রায় সাতটা। সামনের সিটে বাবলুর পাশে আমি। পিছনে মুন, ইন্দ্র আর মাসিমা। গাড়ি ওভারব্রিজ পেরিয়ে বেলেঘাটা মেন রোডে ঢুকতেই সারা শরীরে আলস্য এসে জুটল। কাল রাত থেকে সাত আট ঘণ্টা প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। এখন সেটা নেই। জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগছে চোখ-মুখে। ঘুম ঘুম পেতে লাগল।

কাল রাতে মুনের যে চেহারা দেখেছি, সারাজীবনে তা ভুলব না ? চোখ বুজে সেই দৃশ্যগুলো ভাবতে লাগলাম। ট্রেনের দরজাটা খোলা, বাতাসে মুনের চুল উড়ছে। প্রচণ্ড গতিতে ট্রেন ছুটছে। ঝাঁপ দিতে যাওয়ার আগে, দু'হাতে একবার মুখ ঢাকল মুন। যে কোনও মুহূর্তে ছিটকে বাইরে চলে যেতে পারত। ঠিক সেই সময় ওর উদ্দেশ্যটা বুঝে ফেলি। অস্ফুট স্বরে ও একবার বলে উঠেছিল, "মা, তুমি কষ্ট পেয়ো না।"

পিছন থেকে ওকে আমি জাপটে ধরতেই মুন খুব চমকে উঠেছিল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখে ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো ছটফট করতে করতে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।"

মুনকে আমি সামলাতে পারছিলাম না। দু'জনেই পড়ে যেতে পারতাম। বিপদ বুঝে এক ঝটকায় ওকে নিয়ে টয়লেটের দিকে ঘুরে গেলাম। তারপর পা দিয়ে দরজাটাকে ঠেলে, এক হাতে কোনওরকমে লক করার চেষ্টা করতে লাগলাম। এই সুযোগে মুন নিজেকে ছাড়িয়ে উল্টোদিকের দরজার দিকে ছুটে গেল। তখনই ঠিক করে নিলাম, দরকার হলে ওকে আঘাত করতে হবে।

ও পাশের দরজার লক খোলার চেষ্টা করছিল মুন। পিছন থেকে ওকে তুলে নিলাম। কামরার দিকে কয়েক পা এগোতেই ও বলতে লাগল, "ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে। তুমি খুব বাজে লোক।"

সামনের দিকে হাত-পা ছুড়ছে মুন। কিছুতেই কামরায় ঢুকবে না। হঠাৎ দু' পায়ে দেওয়ালে ভর দিয়ে ও আমাকে ধাক্কা মারল। হুটোপাটিতে ওর দুটো হাত আমি ধরে ফেললাম। মুখের উপর চুল এসে পড়েছে। মুনকে অদ্ভুত লাগছে দেখতে। রাগে ও আমার ডান হাতের কবজি কামড়ে ধরল। আমার সারা শরীরে একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল। হাত ছাড়ানোর জন্য, উপায় না দেখে বাঁ হাতে ঠাস করে একটা চড় মারলাম। বোধহয় একটু জোরেই হয়ে গেছিল, উফ্ বলে মুন প্যাসেজে বসে পড়ল। গালে হাত দিয়ে ও ব্যথা অনুভবের চেষ্টা করছে। ওর চোখ ঠিকরে জল বেরিয়ে এসেছে। হঠাৎই ফুঁপিয়ে ও কেঁদে উঠল।

ধাক্কাধাক্কির শব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন মাসিমা। মুনকে দেখে বলে উঠেছিলেন, "এ কী ! কী হয়েছে মা ?"

মুন ফুঁপিয়ে বলেছিল, "এই বাজে লোকটা আমায় মারল মা।"

প্যাসেজে বসে মাসিমা অবাক হয়ে তখন তাকালেন আমার দিকে। ডান হাতে কনকনে ব্যথা। দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে বলেছিলাম, "ওকে ভেতরে নিয়ে যান মাসিমা। সুইসাইড করতে যাচ্ছিল।"

—সর্বনাশ ! মুনকে বুকে টেনে মাসিমা ককিয়ে উঠেছিলেন, "এই সর্বনাশটা তুই কেন ফের করতে যাচ্ছিলি মা ?"

'ফের' কথাটা ধক করে কানে এসে বেজেছিল। মুন কি তা হলে আগে একবার সুইসাইড করতে গেছিল ? কিন্তু কেন ? ওপরের বার্থ থেকে ইন্দ্রও নেমে এসেছিল। ডান পাশের ক্যুপ থেকে এক ভদ্রলোক প্যাসেজে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কী হয়েছে ? মেয়েটা কি মেন্টাল পেশেন্ট ?"

প্রশ্নটায় পাত্তা না দিয়ে ইন্দ্রকে বলেছিলাম, "দিদিকে ভেতরে নিয়ে যাও। আমি টয়লেট থেকে ঘুরে আসছি।"

...ছবির মতো সব দৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছি। গাড়ি আলোছায়া সিনেমার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। শাহরুখ খানের বিরাট হোর্ডিং। পিছনের সিট থেকে মুন বলল, "মা দেখো। শাহরুখ। বহরমপুরে এই সিনেমাটা এখনও যায়নি। আমায় দেখাবে ?"

—দেখাব মা। ডাক্তারবাবুর কাছে আগে তোকে নিয়ে যাই। তার পর দেখাব।

ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম, "শাহরুখের বই দেখতে তুমি খুব ভালবাসো বুঝি ?"

মুন কোনও উত্তর দিল না। ইন্দ্র বলল, "শাহরুখের নাকটা খুব মোটা। ওর থেকে আমির খান অনেক ভাল।"

মুন রেগে উঠে বলল, "ইন্দ্র তুই পাকামো করিস না। ক্লাস এইটের ছেলে। এইটের মতো থাকবি।"

ওকে রাগাবার জন্যই ইন্দ্রকে বললাম, "আমারও আমির খানকে খু-খু-খু-ব ভাল লাগে।" 'খুব' কথাটা শাহরুখের মতো তোতলামি করে বললাম।

শুনে মুন মন্তব্য করল, "বাজে লোকদের বাজে লোকেরাই ভালবাসে।"

ইন্দ্র হাসছে। মাসিমাও। বললেন, "ওকে রাগিয়ো না। শাহরুখ খানের নিন্দে মুনমুন সহ্য করতে পারে না।"

মুনের কথাবার্তায় এখন কোনও মতেই বোঝা যাচ্ছে না, কাল রাতে ও অপ্রকৃতিস্থ আচরণ করেছিল। এমন সুন্দর দেখতে একটা মেয়ে মানসিক রোগী, ভাবতেই পারছি

না। আজকাল কি এই রোগটা খুব বেড়ে গেছে? মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম, মানসিক রোগ নিয়ে। এমন একটা দিন নাকি আর বছর দশেকের মধ্যে আসছে, যখন হাসপাতালগুলোতে চল্লিশ ভাগ বেড আলাদা করে রাখতে হবে শুধু মানসিক রোগীদের জন্য। তখন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ক্যান্সার, এমনকী এইডসের এমন সব ওষুধ বেরিয়ে যাবে, এই সব রোগ সারানো জল-ভাত হয়ে যাবে ডাক্তারদের কাছে। সেই সময় মানসিক রোগটাই মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন নাকি সতর্ক করে দিয়েছে, এই হাইটেক-জেট সেট যুগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব ক্ষতি করে দিচ্ছে মানুষের। লোকের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। আতঙ্ক গ্রাস করে ফেলছে। অনিশ্চয়তায় দিশাহীন হয়ে উঠছে মানুষ। হতাশা, শোক, ভয়, ঈর্ষা আর গ্লানিবোধ মানুষকে শেষ করে দেবে। সারা বিশ্বে আত্মহত্যার প্রবণতা প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। এখন প্রতি সাত মিনিটে নাকি একজন করে মানুষ আত্মহত্যা করছেন।

কাগজের ওই আর্টিকেলটা তখন মনে অত দাগ কাটেনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা প্রশ্ন জাগল, মুনের জীবনে কী এমন ঘটেছে যে, ও হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করতে গেল? কাল রাতে ট্রেনে মুন ঘুমিয়ে পড়ার পর মাসিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মুন কতদিন ধরে অসুস্থ?"

—বছরখানেক। এমনিতে ও খুব চঞ্চল প্রকৃতির ছিল। হঠাৎ ঘরকুনো হয়ে গেল। বাড়ি থেকে বেরোতে চায় না। অপরিচিত লোক দেখলে ভয় পায়। ওর বাবাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে না। কলেজ যাওয়া ছেড়ে দিল।

—তার পর?

—একদিন রাতে হঠাৎ চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল। আমাদের বাড়িটা বেশ বড়। দুটো বারান্দা পেরিয়ে টয়লেটে যেতে হয়। জমিদার আমলের বাড়ি। বুঝতে পারছ। রাতে শোয়ার আগে মুন টয়লেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওই অবস্থা। বেরিয়ে দেখি, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। অনেক কষ্টে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম। তখন বলল, কে নাকি লুকিয়ে বসেছিল পাঁচিলে।

—অদ্ভুত ব্যাপার তো।

—আর বোলো না বাবা। এত সুন্দর সংসার ছিল আমার। লোকে হিংসে করত। এখন ওকে নিয়ে আমার যত অশান্তি। আট মাস আগে উনি হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। মুন আরও অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওর ধারণা, ওর বাবা অসুখে মারা যায়নি, ওর বাবাকে কেউ মেরে ফেলেছে।

—মুনের ট্রিটমেন্ট করেছেন?

—প্রথমে তো আমরা ভেবেছিলাম, বাতাস লেগেছে। শেতলাতলায় নিয়ে গেলাম। বলল, জলপড়া দিলে ভাল হয়ে যাবে। বাড়িতে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করলাম। কিছুই হল না। আমার নন্দাই... কলকাতায় আমরা যার বাড়িতে যাচ্ছি... তিনি বেড়াতে এসেছিলেন পুজোয়। বললেন, মনের ডাক্তার দেখাতে। বাবুলবোনা রোডে এক ডাক্তার থাকেন। সেখানে নিয়ে গেলাম। দু'তিনবার। উনি খালি ঘুমের ওষুধ দিলেন। কীভাবে যেন মুন জেনে গেল, ওগুলো ঘুমের ওষুধ। দশ-বারোটা একসঙ্গে খেয়ে নিল একদিন। কাগজে লিখে রেখেছিল, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

ভাগ্যিস, ইন্দ্র দেখে ফেলেছিল।

—আর ডাক্তারের কাছে যাননি ?

—গেছিলাম। উনি ইলেকট্রিক শক দিলেন মাথায়। মেয়ে আমার আরও যেন কেমন হয়ে গেল। তখন ওই ডাক্তারই বললেন, মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে যান। বড় ডাক্তার দেখান। দেরি করবেন না।

—কোন ডাক্তারকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন মাসিমা ?

—ডাঃ অর্ণব ব্যানার্জি। আমার নন্দাই চেনেন। বেহালার দিকে কোথায় যেন একটা হাসপাতাল হয়েছে পাগলদের। সেখানে নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে। সবসময় আমি টেনশনে থাকি বাবা। এই বোধহয় মেয়েটা কিছু করে ফেলল। আমার নিজেরও হার্টের ব্যামো হয়ে গেল।

...গাড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে পড়েছে। ডানদিকে টার্ন নিয়ে বাবলু স্পিড বাড়িয়ে দিল। সকালের দিকে এদিককার রাস্তা একেবারে ফাঁকা। সার্কুলার রোড দিয়ে বাবলু ল্যান্সডাউন ধরলে জ্যাম পেত। এ দিকটায় খুব একটা আসা হয় না। সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি উঠে গেছে। নর্থ ক্যালকাটার অনেক লোক মারোয়াড়িদের কাছে বাপ-ঠাকুর্দার আমলের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে এখন এদিকে চলে আসছে। বিডন স্ট্রিটে আমাদের চেনাশুনো দু-তিনজন বাঙ্গুরে বাড়ি করে চলে এসেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার মুনের দিকে তাকালাম। ডানদিকে তাকিয়ে ও বিরাট বিরাট হোর্ডিংগুলো দেখছে।

কী নিষ্পাপ ওই মুখটা। বারবার ওকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে কেন, বুঝতে পারছি না। ওকে রাগাতে ইচ্ছে করছে। বিডন স্ট্রিটে আমাদের বাড়ির বাইরের দিকে বড় একটা রক আছে। মাঝে দিনকয়েক এক পাগল সেই রকে সারাদিন বসে থাকত। নোংরা করে রাখত রকটা। বাবলু যতবারই তাড়ায়, লোকটা ততবারই ফিরে আসে। সারাদিন নিজের মনে বিড়বিড় করত। একদিন বাবলুকে ইট ছুড়ে মেরেছিল। বাবলুও রেগে গিয়ে পাগলটাকে পেটায়। গোলমাল শুনে মা বেরিয়ে এসেছিল। খুব বকুনি দিয়েছিল বাবলুকে। সেদিন মায়ের বলা একটা কথা মনে আছে, "ছিঃ ওর কি কোনও বোধশক্তি আছে রে। নিজেও জানে না, ও কী করছে।" মুনের দিকে তাকিয়ে, মায়ের ওই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ও আমার হাতে কামড়ে দিয়েছে। তবু ওর ওপর আমার রাগ হচ্ছে না।

বাইপাস আর পার্ক সার্কাস কানেক্টারে মুন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "মা, জিজ্ঞেস করো তো, ডানদিকে এটা কী গো ? ডাইনোসর রাখা আছে।"

মাসিমা বললেন, "আমি কেন, তুই জিজ্ঞেস কর না।"

মুন বলল, "বাজে লোকদের সঙ্গে আমি কথা বলি না।"

ইন্দ্র সোৎসাহে বলল, "আমি জানি দিদি। ওটা সায়েন্স সিটি। ওই দ্যাখ, বড় বড় করে লেখা।"

—তুই সব জানিস, না ?

—ঋচীকদাকে জিজ্ঞেস কর।

—আমার বয়ে গেছে। এখানে কী হয় রে ইন্দ্র ?

—আমাদের স্কুলে সুধন্য বলে একটা ছেলে আছে। ও দেখে গেছে। জানিস দিদি

এখানে না চোরাবালি আছে। পা দিলে তুই ডুবে যাবি। একটা সাপ আছে, সেটা আস্তে আস্তে এইটুকুন হয়ে যায়। একটা কাচ আছে, সেখানে পেন ধরলে পেনটা বিরাট মোটা হয়ে যায়।

—যাঃ, তাই হয় নাকি ?

—সুধন্য তো বলল।

—তোরই তো বন্ধু, কত আর ভাল হবে ?

—আর তোর সংঘমিত্রা খুব ভাল, তাই না ?

—মা দেখো, কী সাহস। সংঘমিত্রার নাম ধরে কথা বলছে। তুমি লাই দিয়ে ভাইকে খুব বাড়িয়ে দিয়েছ।

মাসিমা বিরক্ত হয়ে বললেন, "এই তোরা চুপ কর।"

মুন আবদার করে বলল, "মা, একদিন সায়েন্স সিটি দেখাবে ?"

—নিশ্চয়ই দেখাব, মা। সুদীপাকে বলিস। নিয়ে আসবে।

—মা তুমি মেকাপ বক্স নিয়ে এসেছ আমার ?

—এই রে। ভুলে গেছি।

—তুমি কী মা ? তোমাকে যে তখন দিলাম।

—এনে কী হবে বল ? তুই তো আর সাজিস না। গেল বছর পিতুর বিয়েতে সেজেগুজে তুই গেলি। লোকে তোর কত প্রশংসা করল বল। বিয়ের সম্বন্ধই এসে গেল দু-তিনটে। এখন তোর কী হয়েছে, ভগবান জানেন।

—মা আমি সংঘমিত্রার চেয়ে সুন্দর ?

—অনেক। ওর নাক চাপা। ও আবার ভাল দেখতে নাকি ? সাজলে তোকে কত সুন্দর দেখায়, তুই জানিস ?

মা আর মেয়ের কথা কথা শুনতে বেশ মজা লাগছে। আমাদের বাড়িতে মুনের বয়সী কোনও মেয়ে নেই। থাকলে বোধহয় মাও তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলত। খুব সাজাত, চুল বেঁধে দিত। সুইজারল্যান্ড থেকে লিন্ডা বউদি যখন আসে, মা তখন এই সব সুযোগ পায় না। বউদির চুল ছোট করে ছাঁটা। প্যান্ট-শার্ট পরে। কোথাও বেরোতে চায় না। কলকাতার ধুলো সহ্য করতে পারে না বউদি। কেন না, ডাস্ট অ্যালার্জি আছে। তবে রান্নায় খুব উৎসাহ বউদির। এখানে এলেই মায়ের কাছে নতুন রান্না শেখে। লিন্ডা বউদি অল্প অল্প বাংলা শিখে গেছে। তবে সেটা মায়ের সঙ্গে সব সময় গল্প করার মতো যথেষ্ট নয়। প্রায়ই ইন্টারপ্রেটার হিসাবে ডাক পড়ে দাদা অথবা আমার।

মিনিট কয়েক পর পৌঁছে গেলাম কর্নফিল্ড রোডে। এই সব অঞ্চলে উচ্চবিত্ত লোকেদের বাস। মুনের এই আত্মীয়টির অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল। ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে তিনতলা একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল বাবলু। ডিকি থেকে সুটকেস দুটো নামিয়ে দিল। আমার নামার ইচ্ছে নেই। মুখ বাড়িয়ে বললাম, "মাসিমা, চলি।"

—না বাবা। তা কি হয় ? আমার নন্দাইয়ের সঙ্গে একবার আলাপ করে যাও। আমাদের জন্য তুমি এত করলে... তোমাকে আমি ছাড়তে পারি ?

—মা খুব চিন্তা করবে মাসিমা।

—এখান থেকে ফোন করে দাও।

—তা করা যেতে পারে। বলে গাড়ি থেকে নেমে এলাম। প্রায় পৌনে আটটা বাজে। মা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঘর-বার করছে। বিডন স্ট্রিটে ফিরতে এখন ঘণ্টাখানেক। মাকে একবার ফোনে বলে দেওয়া দরকার।

গাড়ি থেকে আমাকে নামতে দেখে বাবলুর মুখ তেতো হয়ে গেল। গাড়িতে ঠেসান দিয়ে ও দাঁড়িয়ে। চোখ-মুখ দেখে আমার মনে হল, এখানে আর সময় নষ্ট করা ও পছন্দ করছে না। ওকে বললাম, "তুই দাঁড়া। আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি।"

বাড়ির দেওয়ালে নেমপ্লেটে লেখা অ্যাডভোকেট রণবীর মিত্র। পোর্টিকোর নীচে একটা মারুতি এস্টিম। দু তিন ধাপ সিঁড়ি। তার দু পাশে বাহারি গাছ। একেবারে সোজাসুজি চেম্বার। ইন্দ্র কখন ভেতরে ঢুকে গেছে লক্ষ করিনি। সামনে মাসিমা, মাঝে মুন আর ওর পিছনে আমি। মুন ঘাড় ঘুরিয়ে একবার আমার দিকে তাকাল। ওর কপালে ঘাম। নাকছাবিটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। কেন জানি না, হঠাৎই ওকে আমার ছুঁতে ইচ্ছে করল।

ইন্দ্রর সঙ্গে এই সময় বেরিয়ে এলেন মাঝবয়সী এক মহিলা। পরনে তাঁতের শাড়ি। অত সকালেও টিপটপ। মুনকে জড়িয়ে ধরে উনি বললেন, "আয় মা। কত বড় হয়ে গেছিস।"

মুন জিজ্ঞেস করল, "পিসেমশাই কোথায় গো ? সুদীপাদিদিকেও দেখছি না।"

—এখুনি আসবে। তোর পিসে গড়িয়াহাটে বাজার করতে গেছে। তোরা আসবি শুনে কাল রাত থেকে আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।

কথা বলতে বলতেই ভদ্রমহিলার চোখ পড়ল আমার দিকে। বললেন, "এই ছেলেটা কে রে অঞ্জলি ?"

মাসিমার নাম তা হলে অঞ্জলি। উনি কিছু বলার আগেই মুন বলে উঠল, "বাজে লোক।"

মাসিমা বললেন, "ছিঃ মুন।"

ভদ্রমহিলা হাসিমুখে বললেন, "তুমি যে-ই হও বাবা, এসো, ভেতরে এসে বসো।"

আমাকে চেম্বারের মধ্যে বসতে বললেন মুনের পিসিমণি। দেয়াল জুড়ে আলমারি। আইনের বই। ঘরের তিন পাশে সোফা। অন্য পাশে বিরাট টেবল আর একটা রিভলভিং চেয়ার। মুনের পিসেমশাই বোধহয় ওখানে বসেন। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে মনে হল, ভদ্রলোকের পসার বেশ ভাল। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের সঙ্গে পড়ত সুদীপা বলে একটা মেয়ে। তার বাবার নামও ছিল রণবীর মিত্র। সুদীপারাও এদিকে কোথাও থাকত। কিন্তু আমি কখনও ওদের বাড়িতে যাইনি। মুনকে নিয়ে মাসিমা ভেতরে ঢুকে গেছেন। একা বসে আছি চেম্বারে। সামনে সেন্টার টেবলে একটা কাগজ পড়ে রয়েছে—দ্য টেলিগ্রাফ। তুলে নিয়ে পড়তে লাগলাম।

—আরে, এই গুড বয়, তুই এখানে ?

চেনা গলা শুনে মুখ তুলে দেখলাম, সুদীপা। ওকে দেখে এমন অবাক হলাম, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "মাই গড, এটা তোদেরই বাড়ি ! নেমপ্লেট দেখার পর থেকে কেমন যেন মনে হচ্ছিল।"

সুদীপা একটু মুটিয়েছে। পরনে ম্যাক্সি। গোলাপি রঙের ফুল ফুল আঁকা।

একেবারে অন্যরকম লাগছে ওকে দেখে। কলেজে ওকে মড পোশাকে দেখতাম। প্রায় বছর পাঁচেক পর ওর সঙ্গে দেখা। মাঝে কার মুখে যেন শুনেছিলাম, সুদীপা ভাল চাকরি করছে। কলেজে মেয়েরা আমাকে গুড বয় বলে ডাকত। এখনও দেখছি, ভোলেনি।

সুদীপার যেন ঘোর কাটেনি। বলল, "উফ তোর সঙ্গে এভাবে দেখা হবে, জীবনে ভাবিনি। চল, ভেতরে চল। এখানে বসে কী করবি ? মামী বলল, শেয়ালদা থেকে একজন পৌঁছে দিতে এসেছে। এত ভাল ছেলে নাকি জীবনে দেখেনি। আমি বলি, এমন গুড বয় পৃথিবীতে তো একটা পিসই আছে। তোর মতো গাধা ছাড়া কে আর এমন সময় কষ্ট করবে ?"

সুদীপাটা বদলায়নি। বললাম, "সারাজীবন কি তুই একইরকম থাকবি ?"

—যতদিন পারি, দেখি। আয়। হাত ধরে টানল সুদীপা।

লম্বা এক ফালি প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে দুজনে ডাইনিং হলে গিয়ে দাঁড়ালাম। কলেজে আমাদের সাতজনের একটা গ্রুপ ছিল। তিন জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা। আর আমি একা। সুদীপার সঙ্গে তখন গভীর প্রেম অতীনের। ওরা সব দুঃসাহসিক কাজকর্ম করত। যথেচ্ছ সিগারেট খেত। বিয়ার খেত। কলেজ পালিয়ে বেড়াতে যেত। আমি ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতাম না। তাই ওরা আমায় গুড বয় বলে ডাকত।

ডাইনিং হলে বসে কথা বলছিলেন মাসিমারা। একটা চেয়ারে বসে মুন। মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুদীপা বলল, "ঋচীক, তোর সঙ্গে অনেক কথা জমে আছে। পালাবার চেষ্টা করবি তো..." বলেই নিজেকে ও সামলে নিল। আমি জানি, অন্য কোথাও হলে বাকি অংশে ও কী বলত, "তোর পাছায় লাথি মারব।"

হেসে বললাম, "কী রে, থেমে গেলি কেন, বল ?"

—পরে শুনিস। দাঁড়া, ড্রেসটা বদলে আসি।

সুদীপা হাঁসফাঁস করতে করতে ডানদিকের একটা ঘরে ঢুকে গেল। ঘরের বাঁ দিকে বিরাট একটা শো কেস। তাতে নানা ধরনের কাচের বাসন। মাঝের একটা ধাপে অ্যাকোরিয়াম। তাতে রঙিন মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুন সেদিকে তাকিয়ে। ওর মুখটা বেশ গম্ভীর। ওকে দেখামাত্রই হাতের ব্যথাটা টনটন করে উঠল। আট-সাড়ে আট ঘণ্টা আগে ওখানে একটা ক্ষত হয়েছে। সামান্য ডেটল পর্যন্ত পড়েনি। ক্ষতটা না আবার বিষিয়ে যায়। ব্যথাটা সহ্য করতে করতে ঠিক করলাম, বাড়ি ফেরার পথে একবার ডাক্তারকাকার কাছে যাব। টিটেনাস নেওয়া দরকার।

ডাইনিং টেবলে চায়ের কাপ সাজাচ্ছে একটা মেয়ে। এ বাড়িতে বোধহয় কাজ করে। মেয়েটা পট থেকে কাপে চা ঢালার সময় মুন হঠাৎ উঠে এল। মেয়েটাকে সরিয়ে দিয়ে, তারপর নিজেই চা ঢালতে লাগল। মাসিমা অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন। চা ঢেলে মুন কাপটা এগিয়ে দিল আমাকে। চা আমি খুব একটা খাই না। সকালে মা কমপ্ল্যান করে দেয়। তবু কাপটা নিয়ে বললাম, "থ্যাঙ্কস মুন।" এই প্রথম ও আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করল।

মুন পাশের চেয়ারে এসে বসেছে। হঠাৎ আমার হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইস, কাল খুব লেগেছিল তোমার, না।"

বললাম, "খুউব"।

—আমি খুব খারাপ মেয়ে, তাই না ?

—একটু খারাপ।

—আর কোনও দিন তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব না। তুমি কি আমার উপর রেগে গেছ ?

—না।

—সুদীপাদিদিকে তুমি চেনো ?

—হ্যাঁ।

—তুমি এখন বাড়ি যাবে ?

—হ্যাঁ।

—আর আসবে না ?

—বলতে পারছি না মুন।

—না, তুমি আসবে। আমার খুব ভয় করে, জানো ?

—কে তোমাকে ভয় দেখায় ?

—একটা ছেলে। কালো কোট পরে থাকে।

—ছেলেটাকে ধরে আমি খুব মারব।

—তোমার গায়ে খুব জোর ?

—খুউব।

—জানো, কাল আমার খুব লেগেছে। তুমি আমাকে মারলে কেন ? মা-বাপি কেউ কোনওদিন আমায় মারেনি।

—অন্যায় হয়ে গেছে মুন। আর কোনও দিন হবে না।

—প্রমিস।

—প্রমিস।

—তুমি আবার কবে আসবে ?

—আমার যেদিন কাজ থাকবে না, কেমন ?

—এই, তুমি বিস্কুট নিলে না ?

—নিয়েছি।

—আরও একটা নাও।

বিস্কুট রাখা ডিসটা এগিয়ে দিল মুন। মাসিমা ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। এমন সময় খর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুদীপা। পরনে এখন শাড়ি। আমাকে চা খেতে দেখে বলল, "ঋচীক, তুই ব্রেকফাস্ট করে যাবি। মা, সব রেডি করো। আজ গুড বয়ের সঙ্গে আমার আড্ডা। কেউ ডিসটার্ব করবে না।"

ওর ব্যস্ততা দেখে বললাম, "এই সুদীপা শোন, তোর বয়সটা কমছে না, বাড়ছে রে ? বাড়িতে মা এতক্ষণে বোধহয় হার্টফেল করেছে। আমি আর এক মুহূর্ত বসব না। চলি।"

সুদীপা কোমরে হাত দিয়ে বলল, "এখনও মায়ের খোকা সেজে আছিস তা হলে। সেই আগের মতো। এই তোর ফোন নম্বরটা দে। মাসিমাকে একটা ফোন করে

দিই। বল তো নম্বরটা।"

টেবলের উপরই রাখা কর্ডলেস ফোন। নম্বরটা বলতেই সুদীপা প্রথমে লিখে রাখল। তারপর বাটন টিপে, লাইনটা ধরে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। কলেজে পড়ার সময় মাঝেমধ্যেই ও আমাদের বাড়িতে যেত। সাতজনের মধ্যে তখন আমার বাড়িটাই কলেজের সব থেকে কাছে। কোনওদিন কোনও কারণে ক্লাস না হলে সবাই মিলে আমাদের বাড়িতে আসত। তিনতলায় আমার ঘরে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করত। মনে আছে, সুদীপা একবার আমার ঘরে বসে ড্রাগ নিয়েছিল। আর একবার... না থাক, সেদিনকার কথা মনে না আনাই ভাল।

মিনিট কয়েক মায়ের সঙ্গে কথা চালিয়ে গেল সুদীপা। মাকে ও বলছে, লাঞ্চ করে ঋচীক বাড়ি যাবে। মা বোধহয় রাজি হচ্ছে না। সুদীপা কয়েকবার হা হু, ওমা, তাই নাকি বলে হঠাৎ ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই, তোদের পাশের বাড়িতে যেন কী একটা হয়েছে। মাসিমা তোর সঙ্গে কথা বলবেন।"

বুকটা ধড়াস করে উঠল। কাকাবাবুর কিছু হল নাকি ? তাড়াতাড়ি ফোনটা হাতে নিয়ে বললাম, "মা, কী হয়েছে ?"

—বুবুন, তুই এক্ষুনি চলে আয়। ও বাড়িতে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে।

—কী মা ?

—তিতলিকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।

॥ তিন ॥

গত দশ-বারো দিন ধরে আমি খুব ব্যস্ত। ইস্টার্ন বাইপাসের প্রোজেক্টটায় আমরা হাত দিয়েছি। জানুয়ারির মধ্যে কাজ শুরু করতে চাই। প্ল্যান জমা দেওয়া হয়ে গেছে। স্যাংশন হলে, আমাদের হিসেবমতো প্রোজেক্ট শেষ হবে ঠিক এক বছরের মাথায়। এর জন্য যেখানে টাকা পয়সা খাওয়াতে হবে, সুমিতাভ খাওয়াচ্ছে। ও হচ্ছে ম্যানেজ মাস্টার। ও জানে কার থেকে কীভাবে কাজ আদায় করতে হয়। সব জায়গায় ওর নিজস্ব লোক আছে। সারা বছর ধরে সেই সব লোককে ও দেখে। যোগাযোগ রাখে। অন্য প্রোমোটারদের তুলনায় আমাদের ঝঞ্ঝাট কম। আমি টাকা দিয়ে খালাস। সুমিতাভই আসল খাটনিটা খাটে। কাগজে একটা অ্যাড দিয়েছিলাম। বুকিং রেসপন্স খুব ভাল।

বাড়ির নীচেই আমার অফিস ঘর। একটা কনফিডেন্সিয়াল চিঠি টাইপ করা দরকার ছিল। টাইপ করছি। এমন সময় উৎপাত, তিতলি।

—কী করছ বুবুনদা ?

পাত্তা না দেওয়ার জন্য বললাম, "দেখতেই তো পাচ্ছিস।"

—তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। টাইপ করা থামিয়ে বললাম, "বল।" তিতলিকে ভাগানো দরকার। না হলে বিরক্ত করে যাবে।

—সুপারম্যানকে একটা ব্যাপারে ম্যানেজ করতে হবে।

বাবার ওপর খুব রাগ তিতলির। কাকাবাবুকে আজকাল ও বাবা বলে ডাকে না। বলে সুপারম্যান।, এক অর্থে কাকাবাবু সত্যিই সুপারম্যান। অসম্ভবকে সম্ভব করার

ক্ষমতা ধরেন। হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। পুলিশ, মন্ত্রী, আমলা—সব মহলেই পরিচিত। কাকাবাবুর ক্ষমতা এই কদিন আগে দেখেছি। পুলিশের ঝামেলা থেকে তিতলিকে যেভাবে উনি বের করে আনলেন, অন্য কেউ হলে পারত না। কাকাবাবুকে বিপদেও ফেলতে পারে তিতলি। এখন বোধহয় ওর মাথায় ফের নতুন কোনও মতলব ঘুরছে। ওর ফাঁদে পা দেব না। তাই বললাম, "কী ব্যাপারে ?"

—ফার্স্ট ডিসেম্বর আমাদের ইউনিট ফলতায় শুটিং করতে যাবে। দিন দুয়েকের জন্য। আমাকেও যেতে হবে। সুপারম্যানকে রাজি করাতে হবে।

—সরি। পারব না। রিসেন্টলি তুই যা করেছিস, তোর হয়ে কোনও কথা আমি বলতে যাব না।

—আমি আবার রিসেন্টলি কী করলাম ?

—মানে ? তুই শপ লিফটিং করিসনি ? পুলিশ তোকে ধরল কেন ?

কথাটা উড়িয়ে দিল তিতলি, "বিশ্বাস করো বুবুনদা, নিউ মার্কেটে ওই দোকানদারের সঙ্গে আমার একদিন ঝামেলা হয়েছিল। চারটে রেভলন লিপস্টিকের দাম নিয়েছিল আটশো টাকা। অথচ পাশের দোকানেই, চারটের দাম ছশো টাকা। আমাকে ঠকাল কেন ? সেদিনই ঠিক করলাম, অন্য একদিন এসে দাম উসুল করে নেব।"

—তাই বলে তুই চুরি করবি ? তোর বাবার ইজ্জতটা কোথায় গেল বল তো ?

এবারও কথাটায় পাত্তা দিল না তিতলি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ও জিনসের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। তার পর একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি অর্ধেকটা টেনে, বাকিটুকু আমায় দাও। নাকি, আমি খেয়ে তোমায় দেব ?"

এর আগে, আরও একদিন তিতলি আমাকে সিগারেট অফার করেছিল। আমার তিনতলার ঘরে বসে। একটু বেপরোয়া হয়ে ওঠার আগে ও এটা করে। এর পর ও আলতু-ফালতু বকবে। সতর্ক হয়ে গেলাম। প্রশ্রয় দিলে ওকে সামলাতে পারব না। গম্ভীর হয়ে বললাম, "এখানে সিগারেট ধরাবি না। মা এখুনি নামবে।"

ভাল কথা শোনার মেয়ে নয় তিতলি। এগিয়ে এসে বলল, "নামুক। তুমি খেতে পারলে, আমি পারব না কেন ?"

বলেই লাইটার বের করে ও সিগারেট ধরাল। মুখ দিয়ে একগাদা ধোঁয়া বের করে বলল, "হ্যাঁ, কী বলছিলে যেন ? শপ লিফটিং। আসলে কী জানো, মাঝেমধ্যে আমি সুপারম্যানকে টেস্ট করি। আমার প্রতি অন্ধ স্নেহটা এখনও আছে কি না।"

—কাকাবাবুকে তুই ব্ল্যাকমেল করছিস তা হলে।

—বলতে পারো। লোকটাও তো সবাইকে ব্ল্যাকমেল করে। এই যে দেখো, একটা সময় তোমাদের কী সাহায্য-টাহায্য করেছিল, এখন সেই প্রসঙ্গ তুলে তোমাদের ব্ল্যাকমেল করতে যাচ্ছে। আমার মতো একটা মেয়েকে, তোমার ঘাড়ে গছাবার চেষ্টা করছে। আর তুমি যা বোকা-সোকা, হয়তো রাজি হয়ে যাবে।

কথাটা শুনে রাগ হয়ে গেল। তিতলি নিজেকে ভাবেটা কী ? কথাটা এমনভাবে বলছে, যেন ওর প্রচণ্ড অনিচ্ছে। ধমক দিয়ে বললাম, "কথা হচ্ছে তোর-আমার মধ্যে। কাকাবাবুকে টানছিস কেন ?"

ফের ধোঁয়া ছেড়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ও বলল, "লোকটা তো তোমার

গডফাদার। সেজন্যই টানছি। যাক গে, ফলতা যাওয়ার পারমিশনটা তুমি করিয়ে দাও, কদিন আর বিরক্ত করতে আসব না।"

—তার আগে শুনি, তোর সিরিয়াল কী অবস্থায় আছে।

—পাইলট তোলা হয়ে গেছে। অ্যাপ্রুভালের জন্য জমা দিয়েছি। বিশ্বাস না হয়, দূরদর্শনে খোঁজ নিতে পারো।

—কার কাছে খোঁজ নিতে হবে বল তো ?

—পল্লব মোহান্তি।

—ফলতায় কে কে যাবি ?

—ঋষি, আমি, ক্যামেরাম্যান যতীন আর ইউনিটের আরও তিনজন।

—ওখানে ফোন আছে ?

—আছে। এখন আমরা স্পট ঠিক করতে যাচ্ছি। জায়গাটা পছন্দ হলে পরে গিয়ে চারটে এপিসোড একসঙ্গে করে নেব। কস্ট কমাতে হবে।

—ঠিক আছে, যা। কাকাবাবুকে আমি বলে দেব। তবে তোকেও আমার একটা কথা রাখতে হবে।

—কী কথা ?

—ফিরে আসার পর তোকে আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যেতে হবে।

—অফ কোর্স যাব। তোমার সঙ্গে আমি পাতালেও যেতে রাজি।

আনন্দে এক পাক খেয়ে, সিগারেটটা অ্যাস্ট্রেতে গুজে দিয়ে তিতলি বেরিয়ে গেল। আমার কাছে কাজ বাগাতে আসে। ওকে না বলতে পারি না। কাজ বাগিয়ে তিতলি আর সময় নষ্ট করে না। সারা ঘর ম ম করছে সিগারেটের গন্ধে। উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দিলাম।

কাকাবাবু দর্জিপাড়ার একটা সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। ওই সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট রণেন চৌধুরী সাইকিয়াট্রিস্ট। মাঝেমধ্যে কাকাবাবুর কাছে আসেন। তিতলির শপ লিফটিং নিয়ে কাকাবাবু যখন দৌড়োদৌড়ি করছেন, তখন ডাঃ চৌধুরী সব শুনে বলেছিলেন, "এটা এক ধরনের মানসিক রোগ। ক্লেপটোম্যানিয়া। আপনার ছোট মেয়েকে নিয়ে একবার আমার চেম্বারে আসুন। ওকে ট্রিটমেন্ট করা দরকার।" কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাচ্ছি বললে তিতলি যাবেই না। তাই অন্যভাবে ওকে ডাঃ চৌধুরীর কাছে নিয়ে যেতে হবে। কথাটা আগে বলে রাখলাম। ডাঃ চৌধুরী খুব অভিজ্ঞ। একবার ওঁর কাছে নিয়ে যেতে পারলে তিতলিকে উনি বশ করে ফেলবেন। ফলতা থেকে ফিরলে তিতলিকে নিয়ে যাব।

চিঠিটা অর্ধেক টাইপ করা হয়েছে। বাকিটা শেষ করে ফেললাম। চিঠিপত্র টাইপ করার কাজটা করে নন্দিনী। কিন্তু কনফিডেন্সিয়াল চিঠি টাইপ করি আমি। নন্দিনী খুব কাজের মেয়ে। আমারই এক বন্ধু প্রিয়নাথের বোন। বিএ পাশ করে বসে ছিল। আমিই ওকে আমাদের এখানে চাকরি দিই। প্রথমদিকে শখ করে চাকরি নিয়েছিল। এখন চাকরিটা প্রয়োজনে দাঁড়িয়েছে। প্রিয়নাথের বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায়।

—মা আছে বুবুন বাবা ?

প্রশ্নটা শুনে তাকিয়ে দেখি উমামাসি। আগে গীতামাসির সঙ্গে আমাদের বাড়িতে কাজ করত উমামাসি। এদিকে পাতাল রেলের কাজ শুরু হওয়ার পর, কোনও এক

কনট্রাক্টরের কাছে চাকরি পেয়েছে উমামাসির বর। তখনই নিজে কাজ ছেড়ে দেয় উমামাসি। কিন্তু দিয়ে যায় বড় মেয়ে চুমকিকে। উমামাসি আমাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। আমাকে খুব ভালবাসে। মাস ছয়েক আগে চুমকির বিয়ে দিল। তখন আমার কাছ থেকে একটা হাতঘড়ির দাম নিয়ে গেছে। মা দিয়েছে কানের দুল। চুমকির বদলে আমাদের বাড়িতে এখন কাজে লেগেছে উমামাসির মেজ মেয়ে রুমকি।

—কেমন আছ মাসি ? অনেকদিন পর এলে।

—ভাল না বাবা। এত কষ্ট করে চুমকিটার বিয়ে দিলুম। ওর বর ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার কপাল কেমন দেখো।

শুনে খুব খারাপ লাগল। কথা বাড়ালে উমামাসি বকবক করবে। তাড়াতাড়ি বললাম, "মা বোধহয় ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তুমি ওপরে যাও।"

উমামাসির শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে। সিঁড়ির রেলিং ধরে উপরে উঠে গেল। মায়ের মাথা খারাপ করে দেবে এখন, দুঃখের কথা বলে। চুমকির বয়স আঠারো-উনিশ। খুব চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। দেখতে শুনতে মন্দ নয়। সামান্য লেখাপড়াও জানে। আমার মা-ই ওকে শিখিয়েছে। একটা সময় ওর পিছনে ঘুরঘুর করত বাবলু। চুমকির বিয়ের পর লক্ষ করেছি, কিছুদিন দাড়ি রেখেছিল বাবলু। এখন অবশ্য কেটে ফেলেছে।

উমামাসি উঠে যাওয়ার মিনিট খানেকের মধ্যেই উদয় হল বাবলু। বাইরে গাড়ি ধোয়া-মোছা করছিল। সামনে এসে বলল, "শ দুয়েক টাকা দাও। তেল নিতে হবে। রিজার্ভে চলে গেছে।"

কাল রাতেই গাড়িতে পেট্রোল নেওয়ার কথা ছিল। ভুলে গেছিলাম। পার্স থেকে টাকা বের করে বললাম, "পুরোটাই ভরে নিস।"

টাকা নিয়ে চলে যাওয়ার কথা। বাবলু কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। তার পর একটু ইতস্তত করে বলল, "কঙ্কাল বুড়িটা ফের ধান্দাবাজি করতে এসেছে না ?"

শুনে কড়া চোখে তাকালাম। উমামাসিকে সহ্য করতে পারে না বাবলু। কেন এত রাগ কে জানে ? উমামাসির চেহারা একেবারে ক্ষয়াটে হয়ে গেছে। বাবলু নাম দিয়েছে কঙ্কাল বুড়ি। দু-একদিন ওকে আচ্ছা করে ধমকেছি। তখনকার মতো চুপ করে গেছে। কিন্তু মাঝেমধ্যে চাপা রাগ বেরিয়ে আসে। আজও ওকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম, "উমামাসি এসেছে, তো তোর কী ?"

—আমার কিছুই না। কিছু খিচবে বোধহয় তোমাদের কাছ থেকে। বুড়ি এক নম্বর হারামি। বস্তিতে তো অনেক কথাই শুনতে পাচ্ছি।

—কী আবার শুনলি ?

—বুড়ির জামাইয়ের কুকীর্তি। মেয়েকে এমন পেঁদিয়েছে...

—সে কী রে, মারধর করেছে ?

—কঙ্কাল বুড়ি তোমায় বলেনি ? বস্তিতে অবশ্য অন্য গল্প ফেঁদেছে। বিয়ের সময় সাইকেল দেবার কথা ছিল। দিতে পারেনি। তাই মেয়েকে ফেরত পাঠিয়েছে। আসল কথা অন্য। ছেলের পেচ্ছাপের দোষ আছে।"

—এত কথা তুই কী করে জানলি ?

একটু ঘাবড়ে গেল বাবলু। চুমকির সঙ্গে নিশ্চয়ই ওর যোগাযোগ আছে। না হলে এসব কথা জানতে পারত না। থতমত খেয়ে ও বলল, "বস্তিতেই সব শুনলাম। এসব কথা কি কখনও চাপা থাকে?"

আর কথা বাড়ানো ঠিক হবে না। উঠে পড়লাম। সকালে খবরের কাগজটায় চোখ বোলাতে পারিনি। জাতীয় লিগে মোহনবাগানের খেলা ছিল চার্চিল ব্রাদার্সের সঙ্গে। কী রেজাল্ট হয়েছে জানি না। টেবলের ওপর রাখা কাগজটা নিয়ে সোফায় গিয়ে বসলাম। ঘণ্টাখানেক পর একবার ব্যাঙ্কে যাব। চিঠিটা পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার স্বপন মুখার্জি কাল রাতে ফোন করেছিলেন। চিঠিটা জমা দিতে বলেছেন ফার্স্ট আওয়ারে।

আজকাল খবরের কাগজের প্রথম পাতায় চোখ বোলাতে আর ইচ্ছে করে না। খালি খারাপ খবর। খেলার পাতাটা মেলে ধরে দেখলাম, চার্চিলকে তিন গোলে হারিয়ে দিয়েছে মোহনবাগান। দীপেন্দু বিশ্বাস হ্যাটট্রিক করেছে। আমার বন্ধু দেবাশিসের ছোট ভাই শুভাশিসও ফুটবল খেলে। সাব জুনিয়রে এই দীপেন্দু ছেলেটা একবার শুভ-র সঙ্গে খেলেছে। চড়চড় করে উঠে এল ছেলেটা। ইস্টবেঙ্গলের ভাইচুং ভুটিয়াকে এখন বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। আজকাল নিয়মিত মাঠে যাওয়ার সময় পাই না। কিন্তু মোহনবাগানের খবর রাখি। তিন পুরুষের মেম্বার। আমার কার্ডটা করে দিয়েছিলেন শৈলেন মান্না। একটা সময় বাবার কাছে উনি খুব আসতেন।

খবরের কাগজগুলোর সঙ্গে আজকাল রঙিন ক্রোড়পত্র দেয়। নানা ধরনের আর্টিকেল থাকে তাতে। পড়তে বেশ ভাল লাগে। পাতা ওলটাতে ওলটাতে ক্রোড়পত্রের একটা আর্টিকেলে হঠাৎই চোখ আটকে গেল। সঙ্গে বিরাট ছবি। তার নীচে বড় বড় হেডিং "মনোরোগী বন্দিদের দুর্দশা ঘুরে দেখলেন বিচারপতিরা।"

ছবিটার দিকে ভালভাবে তাকাতেই শিউরে উঠলাম। জেলের মধ্যে চারজন মহিলা বন্দি মেঝেতে বসে। সামনে ভাতের থালা। একজন ক্যামেরার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে। মুখের সামনে হাত। তাঁর পাশেরজন মাথা নিচু করে রয়েছেন। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। বাঁ হাত দিয়ে তিনি ভাত মাখতে ব্যস্ত। মেঝেতে ভাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। একটা বেড়াল ওই থালায় মুখ ডুবিয়ে খাচ্ছে। মহিলাটির তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। তৃতীয়জন উবু হয়ে বসে। চোখে উদাস দৃষ্টি। চতুর্থজন পাশ ফিরে কারও সঙ্গে কথা বলছেন। ছবিটা দেখতে দেখতে মনে হল, রিপোর্ট পড়ার কোনও দরকার নেই। ছবিটাই বলে দিচ্ছে, জেলের মধ্যে মনোরোগীরা কী অবস্থায় থাকেন।

চোখ ঘুরেফিরে চলে যাচ্ছে ওই বেড়ালটার দিকে। গা ঘিনঘিন করে উঠছে। মহিলাটির কোনও বোধশক্তি নেই নিশ্চয়। থাকলে বেড়ালটাকে খাবারের অংশীদার হতে দিতেন না। অন্য তিনজনের মধ্যেও কোনও বিকার নেই। একই থালায় কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে ভাত খেয়ে বোধহয় এঁরা অভ্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এঁদের যাঁরা ভাত বেড়ে দিয়েছেন, তাঁরাই বা কেমন ধরনের মানুষ? খেতে দিয়ে তাঁরা খেয়াল রাখবেন না, খাবারটা মানুষের পেটে যাচ্ছে, না একটা পশুর? একজন মানুষ যে আর একজনের প্রতি এতটা অবহেলা করতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।

আনন্দবাজারের রিপোর্টারদের লেখার স্টাইলই আলাদা। মন দিয়ে লেখাটা পড়তে

শুরু করলাম। জেলের মধ্যে মনোরোগীরা চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটান, স্বচক্ষে তা দেখার জন্য প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়েছিলেন দুই বিচারপতি। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যান রিপোর্টারদেরও। তাই এত নিখুঁত বর্ণনা লেখায়।

"তিন তিনটে যুগ কেটে গিয়েছে প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে। মাথার উপর স্যাঁতসেতে দেওয়াল, টিমটিমে বাতি। সব সময় ঘোরে না পাখাগুলোও। উনিশশো ষাট সালে বালিগঞ্জ থানা থেকে পার্বতী সিংহকে যখন এই জেলে পাঠানো হয়েছিল, তখন তাঁর বয়স ছিল পনেরো বছর। শনিবার দুপুরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দিলীপকুমার বসু এবং গীতেশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে পার্বতী বলছিলেন, "আমি বাড়ি যেতে পারব, সত্যি পারব", তখন তাঁর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। পার্বতী সিংহ আসলে নিরপরাধ মানসিক রোগগ্রস্ত বন্দি। কারা প্রশাসনের ভাষায় যাঁদের বলা হয় এন সি এল (নন ক্রিমিনাল লুনাটিক)। বিনা বিচারে এঁদের জেলে আটকে রাখা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে।"

"এদিন দুপুরে দুই বিচারপতির সঙ্গে বন্দিদের অবস্থা ঘুরে ঘুরে দেখেন লিগাল এইড সার্ভিসের ভাইস চেয়ারম্যান গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও। প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে তাঁরা জেলের রান্নাঘর, এন সি এল-দের একক সেলসহ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন। এই জেলে মোট ৬২ জন এন সি এল রয়েছেন। বিচারপতিদের সফরে একটা জিনিস পরিষ্কার— পার্বতী সিংহদের যত্ন নেওয়া হয় না। এঁরা পুষ্টিকর খাবার পান না। এঁদের ঠিক মতো চিকিৎসাও হয় না। লিগাল এইড সার্ভিসের পক্ষে গীতানাথবাবু জানান, জেলের অন্তত ছয়জন বন্দিকে এখনই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁদের বাড়ির লোকজন নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। বন্দিরা অনেকেই বিচারপতিদের কাছে হাতজোড় করে বলেছেন, তাঁরা এই নরকে আর থাকতে চান না। মানসিক ভারসাম্যহীন হলেও তাঁরা জানেন, বিচারপতিরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম ভাত আর সদ্য কিনে দেওয়া সাদা কাপড় কর্পূরের মতো উবে যাবে।"

রিপোর্টে গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামটা পড়ে একটু খটকা লাগল। কাকাবাবুর সঙ্গে কোর্টে প্র্যাকটিস করেন ওই নামে একজন। মাঝেমধ্যে কাকাবাবুর কাছে আসেন। আমাকে খুব ভাল করে চেনেন। উনিই এই ভদ্রলোক নাকি? একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে কাকাবাবুকে। লিগাল এইড সার্ভিস সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। নামটা শুনে মনে হচ্ছে, এই সংস্থাটা আইনগত কোনও সাহায্য করে সাধারণ লোককে। পড়ে একটু আগ্রহ হচ্ছে গীতানাথবাবু সম্পর্কে।

ছবিটার দিকে ফের তাকিয়ে রইলাম। চার মহিলার মধ্যে কি পার্বতী সিংহ আছেন? পনেরো বছর বয়েসে উনি জেলে ঢুকেছিলেন। বয়স তা হলে এখন নিশ্চয়ই পঞ্চাশের ওপরে। আমার জন্মের প্রায় তেইশ বছর আগে থেকে উনি জেলের ভেতরে রয়েছেন। এর মধ্যে কত কী ঘটে গেছে। পার্বতী সিংহ টেরও পাননি। রিপোর্টে একটা লাইন আছে, বাড়ি যেতে পারবেন শুনে উনি থরথর করে কেঁপে উঠেছিলেন। অর্থাৎ একেবারে বোধশক্তিহীন নন। এখন ওঁর বয়স আমার মায়ের মতো। কে বলতে পারে, ঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে এই পার্বতী সিংহও আমার মায়ের মতো ঘর সংসার সাজিয়ে বসতেন না?

রিপোর্টটা পড়ে আরও একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না। বালিগঞ্জ থানা থেকে

পার্বতী সিংহকে নিয়ে যাওয়া হয় জেলে। কেন একজন মানসিক রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো হল না ? হাসপাতালে কি মনোরোগীদের চিকিৎসা করা হয় না ? আমার অবশ্য খুব ভাল ধারণা নেই। তবে কার কাছে যেন একবার শুনেছিলাম, মেন্টাল পেশেন্টদের জন্য আলাদা একটা হসপিটাল আছে গোবরায়। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কেন জানি না, পার্বতী সিংহের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই আমার মুনের কথা মনে পড়ে গেল। মুনও তো মানসিক রোগী। এই ধরনের রোগীরা কি আদৌও ভাল হয় ?

সেদিন সুদীপাদের বাড়ি থেকে ফেরার পর, মুনের খোঁজ আর নেওয়া হয়নি। আসলে এ ক'দিন এত ব্যস্ত ছিলাম, প্রোজেক্ট ছাড়া অন্য কিছু ভাবার সময় পাইনি। হাত নিয়েও দু'তিনটে দিন ভুগেছি। মাকে বলেছি, ট্রেনে জানলার ধারে হাত রেখে বসেছিলাম। হঠাৎ জানলাটা এসে হাতের ওপর পড়ে। ডাক্তারকাকাকে অবশ্য সত্যি ঘটনাটা বলেছি। হাতের ঘা-টা শুকিয়েছে। কিন্তু দাগ রয়ে গেছে। ডাক্তারকাকা বলেছেন, দাগটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে।

বহরমপুর থেকে ফেরার দিনই মা জেনে গেছিল মুনের কথা। বাবলু এসে কী বলেছিল, জানি না। সন্ধেবেলায় মা জিজ্ঞেস করেছিল, "হ্যাঁ রে, সুদীপাদের বাড়ি কাদের পৌঁছে দিয়েছিস আজ ?"

মুনদের কথা বলেছিলাম। তবে কেটে ছেঁটে । কারও কোনও উপকার করলে মা খুব খুশি হয়। মা নিজেও লোকের জন্য অনেক কিছু করে। নানা ধরনের হাতের কাজ মা জানে। বাবা বেঁচে থাকতে একতলার ঘরে দুপুরবেলায় মা আশপাশের কিছু মেয়েকে হাতের কাজ শেখাত। চটের ব্যাগ, পাপোশ, রুমাল তৈরির কাজ। সেই সঙ্গে শাড়িতে ফেব্রিক করাও। চটের ব্যাগের উপর কাচ বসিয়ে জয়পুরি কারুকার্য, এখানে মা-ই প্রথম চালু করেছিল। মেয়েরা তৈরি করে দিত আর মা অর্ডার নিয়ে তা বিক্রি করার ব্যবস্থা করত। কেউ কেউ এসব শিখে, পরে নিজেরাই রোজগার শুরু করেছে একসময়। মা বলত, ঘরে বসে না থেকে মেয়েদেরও অবসর সময়ে কিছু না কিছু রোজগার করা উচিত। বাবা খুব তখন উৎসাহ দিতেন মাকে। বাবা মারা যাওয়ার পর মা অবশ্য এ সব বন্ধ করে দিয়েছে।

মাঝে সুদীপা একদিন আমাদের বাড়িতে ফোন করেছিল। তখন আমি সাইট-এ। মা ধরেছিল ফোনটা। পরে বাড়ি ফিরে আসার পর মা বলল, "বুবুন, মুন বলে মেয়েটাকে ওরা ডাক্তার দেখিয়েছে। সম্ভবত হাসপাতালে ভর্তি করবে।"

—কোন হাসপাতালে, কিছু বলছে মা ?

—সেবা। এই নামে কোনও হাসপাতাল আছে ?

—জানি না। বোধহয় কোনও নার্সিংহোম হবে।

—তোকে ফোন করতে বলেছে সুদীপা।

—এই রে, ওদের ফোন নম্বরটা তো জিজ্ঞেস করিনি সেদিন। খুব ভুল হয়ে গেছে।

—ডিরেক্টরিতে পাবি না ? দেখে নে না। বোধহয় আর্জেন্ট কোনও দরকার। তোর কোনও সাহায্য নেবে।

—দেখি, দু'একদিনের মধ্যে ভাবছি, ওদের বাড়িতে যাব। এর মধ্যে যদিও ও ফের

ফোন করে, তা হলে ওর নম্বরটা জেনে নিয়ো।

আমার মনে নেই মুনের কথা। মা কিন্তু ভোলেনি। কাল রাতেও একবার আমাকে বলেছে, "মুনের কোনও খোঁজ নিলি না। কেমন আছে মেয়েটা কে জানে?" যে মেয়েটাকে মা কোনও দিন দেখেওনি, তার জন্য এত উদ্বেগ, একমাত্র আমার মায়ের পক্ষেই প্রকাশ করা সম্ভব। আমার মা এত ভাল।

নীচের ঘরে বসে এই সব কথা ভাবছি। সিঁড়িতে হালকা পায়ের শব্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, মা। আমার পাশে এসে বসল। তারপর বলল, "একটু আগে তোর মাসি ফোন করেছিল। বুটুর বিয়ে।"

—তাই নাকি? সোজা হয়ে বসলাম। বুটু আমার মাসতুতো বোন। তিন বছরের ছোট। ওর জন্য সম্বন্ধ খোঁজা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। বললাম, "ঠিক হয়ে গেছে?"

মা বলল, "হ্যাঁ। রাজবল্লভ পাড়ার ছেলে। তবে এখন বোস্টন না কোথায় যেন থাকে।"

—চেনা জানার মধ্যে?

—মনে হয়।

—বুটু রাজি?

—মনে তো হল দিদির কথা শুনে। তোর মেসো শুনেছি খুব ধুমধাম করবে।

—গুড। কবে হচ্ছে?

ডিসেম্বরে। ওই সময়টা তুই কিন্তু কোনও কাজ রাখিস না। বুটু তোকে ফোনে চাইছিল। কাজ করছিস বলে তোকে দিলাম না।

—না, ছেলেটা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে তো ভাল করে? বুটুকে কি আমেরিকায় নিয়ে যাবে?

—জানি না। নিয়ে তো যাবেই, এখন কি না, দিদি কিছু বলল না। তোর মেসোই সম্বন্ধটা এনেছে। নিশ্চয়ই খবর-টবর নিয়েছে।

—অনেকসময় এই সব বিয়ে ভাল হয় না, মা। বাবা-মায়েরা ইংল্যান্ড-আমেরিকা দেখে মেয়েকে গছিয়ে দেয়। তারপর শোনে, ওখানে ছেলে রেস্তোরাঁয় কাপ-ডিশ ধোয়ার কাজ করে। আমাদের কলেজে একটা মেয়ে পড়ত—রত্না। পাশ করে বেরোবার আগেই বাবা-মা ওর বিয়ে দিয়ে দিল। ছেলে নাকি জার্মানিতে ভাল কাজ করে। দু' মাস পর ফের দেখি ক্লাসে এসেছে। তারপর শুনি ওই কাণ্ড। মেসো তো একবার দাদাকে দিয়েও খোঁজ করাতে পারত। আমেরিকায় দাদার কত বন্ধু।

—তোর মেসোকে তো জানিস। দিদি খুব অশান্তির মধ্যে আছে রে।

—মাসির আবার কী হল?

—পুলু বোধহয় কোথাও ফ্ল্যাট কিনেছে। উঠে যাবে।

আমার মাসতুতো দাদা— পুলুদা। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আমার থেকে বছর পাঁচেকের বড়। তিন বছর আগে নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছে। সেই বিয়ে মানতে পারেনি মাসি। বড় ধরনের একটা শক খায়। তার পর থেকে মাসি কেমন যেন হয়ে গেছে। সব সময় মনে করে কেউ ভালবাসে না, চায় না। পুলুদার বউ মিলি বউদি অবশ্য খুব বড় ঘরের মেয়ে। মেসো আর মাসিকে প্রাণপণ করে। তবু মন পায় না।

মাসির জীবনটাই দুঃখে-কষ্টে গেল। গুলু ওস্তাগর লেনে মেসোদের বিরাট বাড়ি। টাকা-পয়সার অভাব নেই। সত্যি বলতে কী, মেসোদের তুলনায় আমরা কিছুই না। কিন্তু মেসোদের ফ্যামিলিটাই মেয়ে-বউদের মানুষ বলে গণ্য করে না। মাসির কোনও স্বাধীনতা নেই। মিলি বউদি পোস্ট গ্রাজুয়েট। অত অনুশাসন মানবে কেন ? সেই কারণেই বোধহয়, সংসার থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে।

গেল বছর চড়কের সময় মাসি কিছুদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল। মা-ই এনে জোর করে রেখে দিয়েছিল। মায়েদের আরেক সই থাকেন নীলমণি মিত্তির স্ট্রিটে। কমলামাসি। শ্রী বিদ্যা নিকেতন পর্দা গার্লস স্কুলের পাশে। আগে যখন মায়ের সঙ্গে কমলামাসির বাড়ি যেতাম, তখন কমলামাসিদের মুখে স্কুলের নামটা শুনে খুব মজা লাগত। পর্দা গার্লস স্কুল কেন ? মায়েরা নাকি ওই স্কুলে পড়ত। মা বলেছিল, দিদাদের আমলে নাকি স্কুলে পর্দা দেওয়া থাকত। মেয়েদের স্কুল বলে। এখন অবশ্য পর্দা কথাটা তুলে দেওয়া হয়েছে।

তা, মাসি যখন আমাদের বাড়িতে এসে কিছুদিন ছিল, সেই সময় কমলামাসিকেও রোজ আমায় গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে আসতে হত। তিনজনে মিলে সে কী গল্প। মাসি আর তখন বাড়ি ফেরার নামও করে না। বাবা বেঁচে থাকতে মাসিরা খুব একটা আসত-যেত না। শ্যামপুকুরে দাদুর একটা বাড়ি ছিল। দাদু মারা যাওয়ার পর সেই বাড়ির স্বত্ব নিয়ে আমার বাবা আর মেসোর মধ্যে একটু মন কষাকষি হয়েছিল। মেসো তার পরই এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তখনও মাসি আর মায়ের মধ্যে মনোমালিন্য হয়নি। মা বলেওছিল বাবাকে, "কী হবে তুচ্ছ কারণে ঝগড়া করে। ও বাড়ি তুমি জামাইবাবুকেই দিয়ে দাও।"

বাবা তখন রাজি হয়নি।

বাবা মারা যাওয়ার পর, মামলা তুলে নিয়ে, মা শ্যামপুকুরের বাড়ির ভাগ মাসিকে ছেড়ে দিয়েছে। সই করার আগে একবার শুধু আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, "হ্যাঁ রে বুবুন, তোর কোনও আপত্তি আছে ?" তখন আমি বলি, " তোমার জিনিস। তুমি যদি খুশি হও, আমার কোনও আপত্তি নেই।" বাড়ির ভাগ পেয়ে মেসো ঠাণ্ডা হয়েছে খানিকটা। মাসিকে আসতে-যেতে দেয়। বুটুর সঙ্গে আমার খুব ভাব। ও বাড়িতে আমি গেলে, কখনও সখনও জিজ্ঞেস করে, "বুবুন আছিস কেমন রে ?"

মাসি আমায় খুব ভালবাসে। মাকে মাঝেমধ্যেই বলে, "তোর ছেলেটাকে দেখেও আমার ভাল লাগে। আমার পুলু কেন বুবুনের মতো হল না রে ?" আসলে পুলুদা একটু স্বাধীনচেতা। মাসি যত আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে, ততই নিজেকে সরিয়ে নেয়। ডন বসকোয় পড়া ছেলে। স্কুল লাইফ থেকে একটু অন্য রকম। আরও মাথা খারাপ করে দিয়েছে মেসো। ছেলের সম্পর্কে চতুর্দিকে গর্ব করে। দাদা আর আমি স্কটিশ চার্চ স্কুলে পড়তাম বলে, মেসো ধরেই নিয়েছিল, আমাদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। মেসোকে দেখানোর জন্যই, দাদা চেষ্টা করে জুরিখ চলে গেল। বাবার সে কী আনন্দ !

যাক সে সব পুরনো কথা। মা এখুনি বলল, গুলু ওস্তাগর লেনের বাড়ি ছেড়ে পুলুদা নাকি অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। যদি সত্যি তাই করে, তা হলে মাসি আরেকটা শক পাবে। মাসির কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। কথার পিঠে মাকে জিজ্ঞেস

করলাম, "মিলি বউদি রাজি ?"

—জানি না। শোন, আগামী বিষ্যুদবার বুটুর পাকা দেখা। দিদি বারবার যেতে বলল। ওই দিন মিলিকে জিজ্ঞেস করব। পাপ কখনও বাপকে ছাড়ে না। বুঝলি বাবা। তোর মেসোর জন্যই দিদির আজ এই অবস্থা।

—বুটুর বিয়ের পর মাসিকে আবার কিছুদিন এখানে এনে রাখবে মা ?

—ইচ্ছে তো করে। কিন্তু তোর মেসো ছাড়বে ? দিদি আজ কী বলল, জানিস ? পুলু যদি চলে যায়, আমার নিজের যা আছে, সব বুবুনের নামে উইল করে দেব।

—যাঃ। তাই হয় নাকি। আমি নেব কেন ?

—দিদির মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে, বুঝলি। ফোনে আজ লক্ষ করলাম, এককথা বারবার বলছে। সেই ... মিলির ওপর রাগ। দিদির কথাবার্তা শুনে আমার খুব ভয় করছে রে।

—না মা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ রে, বিয়ে-থা করে তুইও আবার আমাকে ছেড়ে চলে যাবি না তো ?

—আমি বিয়েই করব না।

—তাই হয় নাকি ? তোর জন্য একটা মেয়ে দেখেছে কমলা। শোভাবাজারে থাকে। আমাকে বলছিল, দেখতে যাওয়ার জন্য। মা-বাবার একটা মাত্র মেয়ে। বলল, প্রচুর দেবে-থোবে। তোকে চেনে। তোকে খুব পছন্দ।

সর্বনাশ। মা যদি একবার কথা দিয়ে ফেলে, আমার পক্ষে তখন না করা সম্ভব হবে না। বললাম, "মা, আমার হাতে এখন অনেক কাজ। কমলামাসির কথায় তুমি একদম কান দেবে না। আগে নিজের ছেলের বিয়ে দিক, আমার পেছনে লাগল কেন ? নিজের পায়ে ভাল করে দাঁড়াই। তারপর ওসব কথা ভাবব।"

শুনে মা হেসে ফেলল। তারপর বলল, "নিজের ছেলের জন্যও ও মেয়ে খুঁজছে।"

—ওটাই মন দিয়ে করতে বলো। আজকালকার মেয়েদের তো দেখছই মা। এ বাড়িতে ঢুকে কেউ তোমায় অশ্রদ্ধা করবে, আমি তা সহ্য করতে পারব না।

দুর বোকা। সব মেয়েই কি সমান ? আসলে অশান্তি হয় কেন জানিস, অধিকার নিয়ে। এই দ্যাখ, কত দুঃখী মেয়ে আমার কাছে হাতের কাজ শিখতে আসত। কাজ শেখানোর ফাঁকে ওদের সঙ্গে কথা বলতাম। প্রত্যেকের সংসারে অশান্তি। সবাই আমার আমার বলে পছন্দের লোক আর জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে চায়। এটাই যদি আমাদের সবার বলে ভাবে, তা হলে আর কোনও অশান্তি থাকে না।

মায়ের কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। এত কঠিন একটা কথা মা এত সহজ ভাবে বলল কী করে ? বললাম, "সবাই তো আর তোমার মতো ভাবে না মা। ভাবলে এত ঘর ভাঙাভাঙি হত না।"

—মানুষের মনটাই খুব পাজি। যত টেনশনের গোড়া। মনটাকে জব্দ করতে পারলেই সব শান্তি। তুই এত ভাবিস না বাবা। দেখবি, যেই আসুক, আমাকে অন্তত অশ্রদ্ধা করবে না। লিন্ডাও সেদিন ফোনে বলছিল, মা তুমি বুবুনের বিয়ের কী করলে ? বলো তো, আমি জুরিখ থেকে মেয়ে নিয়ে যাই।

শুনে হেসে ফেললাম। লিন্ডা বউদির চোখে আমি একটা অদ্ভুত ছেলে। আমার

কোনও বান্ধবী নেই শুনে বউদি অবাক। গত বছর পুজো দেখাতে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল দাদা। প্যান্ডেলে যাকেই দেখে, তাকেই বউদির পছন্দ আমার জন্য। মা আর কমলামাসি তো হেসে বাঁচে না। লিন্ডা বউদি শেষে হতাশ হয়ে বলেছিল, "আমাদের ওখানে তুমি থাকলে, দেশ থেকে তোমাকে বের করে দেওয়া হত, মানসিক রোগী ধরে নিয়ে।"

কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় কর্ডলেস ফোন হাতে ঘরে ঢুকল রুমকি। এগিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার ফোন।"

সকালে একবার ফোন করার কথা ছিল সুমিতাভর। বোধহয় ওর। কর্ডলেসটা কানে লাগাতেই শুনলাম এনগেজড টোন। মানে, কেটে গেছে। নিশ্চয়ই ফের করবে। রুমকির সঙ্গে মা কথা বলছে। আমি ফোন হাতেই বাইরে বেরিয়ে এলাম। সামনে ছোট্ট বাগান। বাবা শখ করে নানা ধরনের বাহারি গাছ লাগিয়েছিলেন। এক পাশে আমি বানিয়েছি। বাবার পায়রা পোষারও শখ ছিল। দশ বারোটা হোমার পায়রা কিনেছিলেন। এখন নেই। ছাদ থেকে খাঁচা আমি নীচে নামিয়ে এনেছি। দুটো খরগোশ আর কিছু মুনিয়া পাখি কিনেছি হাতিবাগানের হাট থেকে। গ্যারেজের পাশে রেখে দিয়েছি। রুমকির ওপর দায়িত্ব ওদের যত্ন করার।

বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ দেখলাম, খরগোশের খাঁচা খোলা। মাঝেমধ্যেই খরগোস দুটো বেরিয়ে পড়ে। ঘাস খেয়ে আবার ঢুকে যায়। কখনও কখনও অফিস ঘরেও ঢুকে পড়ে। আমাদের এ দিকে, হুলো বেড়ালের খুব উৎপাত। চোখে পড়লে, কামড়ে নিয়ে যাবে। এদিক ওদিক খুঁজতে শুরু করলাম। খরগোশ দুটো গেল কোথায় ? রুমকিও বেরিয়ে এসেছে আমার ডাকে। খুঁজতে শুরু করেছে। হঠাৎ হি হি করে হাসতে শুরু করল। তারপর বলল, "ছোড়দাবাবু, দেখো কাণ্ড। সাহেব আর মেম তোমার গাড়ির ভেতর বসে রয়েছে।"

তাড়াতাড়ি বের করে আনলাম। আচ্ছা পাজি তো ! বাবলু যখন গাড়ি ধুচ্ছিল, দরজাটা খোলা পেয়ে তখন বোধহয় ঢুকে পড়েছিল। আর বেরোতে পারেনি। খাঁচার ভেতর ফের ঢুকিয়ে রাখলাম। মেমের বোধহয় বাচ্চা হবে। ওকে সাবধানে রাখা দরকার।

ফোনটা আবার বাজছে। কানে দিতেই শুনলাম, "ঋচীক বসু আছেন ?"

অল্পবয়সী ছেলের গলা। আগে কখনও শুনিনি। বললাম, "হ্যাঁ, বলছি।"

—ধরুন।

ফোনটা হাত বদল হল ও প্রান্তে। শব্দ শুনেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু কোনও কথা নেই। কী মুশকিল রে বাবা। কেউ চ্যাংড়ামি মারছে নাকি ? দু' তিনবার হ্যালো হ্যালো বলে ফোনটা কেটে দেব কিনা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ শুনলাম, "তুমি আসছ না কেন বাজে লোক ?"

খুব মিষ্টি একটা গলা। অচেনা। বাজে লোক ? রং নাম্বার বোধহয়। একটু কড়া গলাতেই বললাম, "কে বলছেন ?"

—আমি মুন।

নামটা শোনামাত্রই, মনে হল চোখের সামনে এক হাজার প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে।

॥ চার ॥

সুদীপা বলেছিল, জায়গাটা ঠাকুরপুকুরের একটু আগে। পোড়া অশ্বত্থতলা বলে একটা জায়গায়। "স্টেট গ্যারেজ ছেড়ে আর একটু এগিয়ে যাবি। তারপর বাঁ দিকে একটা গলির একটু ভেতরে। জিজ্ঞেস করলেই যে কোনও লোক বলে দেবে।" আমি উত্তর কলকাতার ছেলে। কখনও বেহালায় যাইনি। চিনব কী করে? ডায়মন্ডহারবার রোড দিয়ে বার কয়েক অবশ্য সোজা চলে গেছি ফলতায়। ওখানে ইটভাটা আছে। কনস্ট্রাকশনের জন্য আমরা ওখান থেকে ইট নিই। কিন্তু পোড়া অশ্বত্থতলা? জীবনে কখনও নাম শুনিনি।

ভুল করে ঠাকুরপুকুরের মোড়ে পৌঁছে এক দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতেই, বললেন, "জায়গাটা আপনি ছাড়িয়ে এসেছেন। এক কাজ করুন, বাঁ দিক দিয়ে জেমস লং সরণিতে চলে যান। মিনিট তিনেক উত্তর দিকে গাড়ি চালালে, দেখবেন বাঁ দিকে বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ি। কমল অ্যাপার্টমেন্টস। তার গা দিয়ে সরু একটা গলি পাবেন। শুনেছি, ওখানে পাগলদের একটা হাসপাতাল আছে।"

বাবলুকে আজ আর সঙ্গে আনিনি। নিজেই ড্রাইভ করে এসেছি। বাবলুর মাথায় এখন চুমকি, চুমকির বর আর উমামাসির কথা ঘুরছে। কাল সল্টলেকে নিয়ে গেছিল। রুদ্রাংশুমামার বাড়ি। মায়ের মাসতুতো দাদা রুদ্রাংশু ঘোষ, এখন হোম সেক্রেটারি। যেতে যেতে বাবলু শুধু বকবক করেছে। চুমকির বরের নাকি ক্যারেক্টার খুব খারাপ। আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়া উচিত। একবার ভাবলাম বলি, চুমকির বর ভাল না, তাতে তোর কী? বিরক্ত হলেও, কথাটা বলতে পারিনি।

কমল অ্যাপার্টমেন্টের কাছে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে, নামলাম। বেলা এখন সাড়ে দশটা। আজ এখানে আসব, সুদীপাকে বলিনি। কাল দুপুরে মুন এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ফুলের মতো সুন্দর একটা মেয়ে মেন্টাল হসপিটালে থাকবে, ভাবতেই খারাপ লাগছে। মাসিমারা বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করাতে পারলেন না? নাকি এই অসুখের চিকিৎসা বাড়িতে হয় না। জানি না, আমার কোনও ধারণা নেই।

একা মুনকে কেন দেখতে এলাম, জানি না। বোধহয় একটু হঠকারিতাই হয়েছে। প্রথম দিন অন্তত ওর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আসা উচিত ছিল। কাল রাতে ফোনে সুদীপা যখন মুনের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবরটা দিল, তখন কেমন যেন অস্থির লাগছিল। অনেক রাত্তির পর্যন্ত ছাদে পায়চারি করেছি। আসলে মুন সে-দিন নিজে থেকে ফোন না করলে, হয়তো ওর কথা মাথাতেই থাকত না। দু'চারটে সাধারণ কথা বলে ফোনটা ও মাসিমাকে দিয়েছিল। একটু বিব্রত হয়ে মাসিমা বলেছিলেন, "তুমি অসন্তুষ্ট হওনি তো বাবা। জানি না ওর কী হয়েছে, আজ সকাল থেকে খালি বলছে, তোমাকে ফোন করার কথা।"

বলেছিলাম, "না মাসিমা, সংকোচ করবেন না। আসলে আমারই উচিত ছিল আপনাদের একবার খোঁজ নেওয়া। মুন কেমন আছে এখন?"

—ভাল না। মাঝেমধ্যে হঠাৎ খেপে উঠছে। ডাক্তারবাবু দু'সপ্তাহের ওষুধ দিয়েছেন। বলছেন হাসপাতালে ভর্তি করে নেবেন।

—কী বললেন ডাক্তার?

—সুদীপা জানে। আমি অত বুঝি-সুঝি না। পারলে তুমি একবার আসবে বাবা। জানি, তোমার কাজকর্ম আছে। তবু বলছি। এদের বাড়িতেও কোনও ইয়ং ছেলে নেই। এদেরও খুব অসুবিধেয় ফেলেছি। আমার মেয়েটা, জানি না ভাল হবে কি না।

—নিশ্চয়ই ভাল হবে। চিন্তা করবেন না।

—তোমার মাকে আমার প্রণাম জানিয়ো। আছেন উনি ?

—মা এইমাত্র নীচে নেমে গেলেন। ডাকব ?

—না থাক। তা হলে অন্য একদিন কথা বলব। তোমার মতো ছেলে গর্ভে ধরেছেন যিনি, নিশ্চয়ই তিনি ভাল মানুষ।

—হ্যাঁ মাসিমা। আমার মা খুব ভাল।

—ছাড়ি তা হলে ?

—ঠিক আছে মাসিমা। সময় পেলে যাব।

মুনের টানেই বিডন স্ট্রিট থেকে এদ্দূর আসা। কমল অ্যাপার্টমেন্টের নীচে স্টেশনারি দোকানে জিজ্ঞাসা করতেই একজন বলল, "পাশের গলি দিয়ে একটু এগিয়ে যান, তিনতলা একটা হলদে বাড়ি দেখতে পাবেন। বাইরে লেখা আছে সেবা মেন্টাল হোম।"

গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকলে রাস্তা আটকে যাবে। হেঁটে সামান্য এগোতেই হলদে বাড়িটা চোখে পড়ল। বাইরে লোহার গ্রিলের দরজা ভেজানো। বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা, "আউটডোর রোগী দেখিবার সময় মঙ্গলবার ও শনিবার বেলা দশটা হইতে একটা পর্যন্ত।" নীচে লেখা, ডাঃ অর্ণব ব্যানার্জি। দরজায় একটা কাগজ সাঁটানো "এখানে চাকুরি খালি নাই।" দেখে একটু অবাকই হলাম। মেন্টাল হোমেও লোকে চাকরির জন্য বিরক্ত করে তা হলে ?

বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম না, ভেতরে হুট করে ঢোকা ঠিক হবে কি না। জীবনে হাসপাতালে ঢোকার কখনও দরকার হয়নি। বাবাকে আমরা নার্সিংহোমে দিয়েছিলাম। মিলি বউদির যখন ছেলে হল, তখনও নার্সিং হোমে। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় বহুবার মেডিকেল কলেজের আশপাশ দিয়ে গেছি। কখনও ভেতরে ঢুকিনি। একটু ইতস্তত করে কলিং বেলে হাত দিলাম। অল্পবয়সী একটা মেয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল।

—কাকে চান ?

বললাম, "আমার পরিচিত একজন এখানে ভর্তি আছেন। এখন দেখা করা সম্ভব ?"

—কী নাম বলুন তো ?

—মুন।

—ওহ মুনমুন মিত্র। বহরমপুর থেকে এসেছে ?

—হ্যাঁ।

—ডাক্তারবাবুর পারমিশন নিতে হবে আপনাকে।

—আছেন উনি।

মেয়েটা ঘাড় নাড়ল, "পেশেন্ট দেখছেন। ভেতরে এসে বসুন।"

ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, লম্বা এক ফালি জায়গা। দু'পাশে লাল-নীল প্লাস্টিকের চেয়ার। নানা বয়সী— কিছু লোক বসে রয়েছেন। আজ শনিবার। তার মানে আউটডোর চলছে। এদের মধ্যে রোগীরাও রয়েছে। একটা চেয়ারে বসতে যাচ্ছিলাম, মেয়েটা বলল, "আপনি ভেতরে আসুন।" বলে মেয়েটা ফের দরজা ভেজিয়ে দিল।

কয়েক পা এগোলে ছোট্ট একটা প্যাসেজ। দু'দিকে ঘর, দরজায় পর্দা ঝোলানো। ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, বাঁ দিকের ঘরে কয়েকটা মেয়ে হাতের কাজ করছে। কেউ রুমাল তৈরিতে ব্যস্ত। কেউ সেলাই মেশিনের সামনে বসে। নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে। সঙ্গের মেয়েটা বলল, "আপনি ডানদিকের ঘরে গিয়ে একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে নিন।"

পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। মুখোমুখি একটা সোফায় বসে রয়েছেন এক ভদ্রমহিলা। চোখে চশমা, গোল মুখ। বয়স চল্লিশের নীচে। ভদ্রমহিলার সামনে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সী একটা ছেলে বসে রয়েছে। মুখ গোঁজ করে। আমি ঘরে ঢুকতেই ছেলেটা আমার দিকে ঘুরে বসল। ভদ্রমহিলা বোধহয় এতক্ষণ কথা বলছিলেন ছেলেটার সঙ্গে। কী যেন লিখছিলেন। মুখ তুলে আমাকে দেখে বললেন, "আপনার সঙ্গে কি নতুন পেশেন্ট আছে?"

বললাম, "না।"

—ডাক্তার ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলবেন?

—হ্যাঁ। উনি নেই?

—উপরে গেছেন। আপনি বসুন।

দরজার পাশে, চেয়ারে বসে পড়লাম। দেওয়ালে বড় করে লেখা সেবা। স্পনসর্ড বাই গোল, আয়ার্ল্যান্ড। ঘরের একদিকে ছোট একটা সেন্টার টেবল। তাতে কিছু প্রেসক্রিপশন রাখা। স্টেথিসকোপ আর প্রেসার মাপার সরঞ্জাম। দেখেই মনে হল, রোগী দেখতে দেখতে ডাক্তার ব্যানার্জি হঠাৎ উঠে গেছেন। ঘরের এক কোণে একটা কম্পিউটার। কী বোর্ডের সামনে বসে বোধহয় কেউ কাজ করছিলেন। পর্দায় কিছু লেখা রয়েছে। তার পাশে কাচের শো কেস। তাতে প্রচুর ফাইল। এই ঘরটা আউটডোর। ঠিক হাসপাতাল নয়, মনে হল নার্সিংহোম।

ভদ্রমহিলা ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে যাবেন, এমন সময় ভেতরের দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন এক ভদ্রলোক। আমার মন বলল, ইনিই ডাক্তার ব্যানার্জি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। একটু ভারী চেহারা। দেখেই মনে হল, এক সময় বেশ হ্যান্ডসাম ছিলেন। গায়ের রং ফর্সা। চোখ-মুখে উদ্বেগ। ঘরে ঢুকেই ভদ্রলোক বললেন, "প্রতিমা, আরতির পা-টা বোধহয় গেছে।"

ভদ্রমহিলার নাম তা হলে প্রতিমা। সোফা ছেড়ে উঠে উনিও বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "ফ্র্যাকচার হয়েছে নাকি?"

"বুঝতে পারছি না। এখুনি একবার ওকে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এক্স-রে করানো দরকার।

—কী করে এই অবস্থা হল ডাঃ ব্যানার্জি?

—সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে। বারবার বলি সাবধানে ওঠা-নামা করতে...শোনে

না। এখন কে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে বলো তো ? সুজিত, দেবাশিস কেউ নেই এখন। এত পেশেন্ট বাইরে বসে, আমার পক্ষেও তো যাওয়া সম্ভব না।

—আরতি কি খুব চেল্লাচ্ছে ?

—চেল্লাবেই। পেইন হচ্ছে।

কে আরতি, সে এই হসপিটালের কী, কিছু জানি না। নর্থ ক্যালকাটার ছেলে হয়ে আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি না। মা শিখিয়েছে, কেউ বিপদে পড়লে সব সময় তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "এক্সকিউস মি, আমি কি আপনাদের সাহায্যে আসতে পারি ?"

ডাঃ ব্যানার্জি ঘুরে তাকিয়ে এই প্রথম দেখলেন আমাকে। ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ?"

—আমার পরিচয়টা পরে শুনবেন। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। মেয়েটাকে যদি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়, আমি যেতে পারি।

ডাঃ ব্যানার্জি একবার যেন জরিপ করে নিলেন আমাকে। তার পর বললেন, "ঠিক আছে, নিয়ে যান। প্রতিমা, তুমি এর সঙ্গে যাও।"

—বিদ্যাসাগর হসপিটালটা কিন্তু আমি চিনি না।

—খুব কাছেই। প্রতিমা চেনে। মেয়েটা হাঁটতে পারছে না। আপনি কি গাড়িটা জেমস লঙয়ে রেখেছেন ?

—হ্যাঁ।

—তা হলে প্রতিমা, তুমি গীতা আর পাপিয়াকে বলো, ওপর থেকে ওকে নিয়ে আসতে।

—মিনিট কয়েক পরই, দুটি মেয়ে আরতিকে ধরে নামিয়ে আনল। একটি মেয়ে একটু আগে আমাকে ভেতরে এনে বসিয়েছিল। বেশ ফর্সা, চোখ দুটো টানা টানা। পরনে নীল শাড়ি। কেন জানি না মনে হল, এই মেয়েটার নামই পাপিয়া। আরতি মেয়েটার বয়স সতেরো-আঠারো। শীর্ণ শরীর। পরনে ম্যাক্সি। তার মানে, মেয়েটা পেশেন্ট। হাসপাতালে থাকে। মুখ-চোখ সামান্য ফোলা। পায়ের ব্যথায় কান্নাকাটি করেছে বলে বোধহয়। ধরাধরি করে দু'টি মেয়ে আরতিকে তুলে দিল পিছনের সিটে।

বেহালায় বিদ্যাসাগরের নামে যে একটা হাসপাতাল আছে, আগে জানতাম না। কয়েক বছর আগে খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রথম এই হাসপাতালের নামটা শুনি। ভেজাল তেল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন হাজার খানেক লোক। অনেকে পঙ্গু হয়ে যান। তাঁরা ওই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেই সময় কাগজে খুব লেখালেখি হয়। কিন্তু হাসপাতালটা ঠিক কোথায়, জানতাম না। দেখলাম, সেবা-র থেকে খুব দূরে না। পাঁচ-সাত মিনিটের রাস্তা। বেহালা বাজারের খুব কাছে। ডায়মন্ডহারবার রোড থেকে বাঁ দিকে একটু ভেতরে।

হাসপাতাল এরিয়াটা বেশ বড়। একটা পুকুর রয়েছে চত্বরে। বিল্ডিংও বিরাট। এমার্জেন্সিতে ঢুকে অবশ্য টের পেলাম, হাসপাতালটা অন্য সরকারি হাসপাতালের মতোই। এমার্জেন্সিতে কোনও ডাক্তার নেই। টেবলে বসে রয়েছেন একজন নার্স। ম্যাগাজিন পড়ছেন। ডাক্তারের কথা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "বেলা দেড়টার আগে

ওনাকে পাওয়া যাবে না।"

এ ধরনের উত্তর শুনলে আমার ভাল লাগে না। রাগ হয়ে যায়। কড়া গলায় বললাম, "আপনাদের সুপারিনটেনডেন্ট আছেন?"

—উনিও নেই। রাইটার্সে গেছেন।

অধৈর্য হয়ে বললাম, "আমাদের সঙ্গে একজন পেশেন্ট আছেন। এখানে এক্স-রে করা যাবে?"

নার্স যেন বিরক্ত হলেন, "এক্স-রে মেশিন ছ'মাস ধরে খারাপ। আপনারা পেশেন্টকে অন্য কোথাও নিয়ে যান।"

আরতি গাড়িতেই বসে রয়েছে। প্রতিমাদি আমার সঙ্গে নেমে এসেছেন। গাড়িতে এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। এ-বার বললেন, "দেখছেন তো কী অবস্থা। কী করা যায় বলুন তো?"

—কাছে পিঠে কোনও নার্সিংহোম নেই?

—আছে দু'একটা। তবে এখন কোনও অর্থোপেডিক সার্জেনকে পাব কি না, জানি না। এ-দিকে মেয়েটা এমন ছটফট করছে, দেড়টা অবধি ওকে বসিয়ে রাখাও যাবে না।

হঠাৎই আমার মনে পড়ল ক্যালকাটা হসপিটালের কথা। আসার সময় পাশ দিয়ে এসেছি। মনে হয়, খুব বেশি দূরে না। ডিসিশন নিয়ে ফেলে বললাম, "চলুন, মেয়েটাকে ফেলে রাখা যায় না।"

ফের গাড়িতে বসে, সোজা চালিয়ে দিলাম একবালপুরের দিকে। আমার এক বন্ধু মিহির চক্রবর্তী ক্যালকাটা হসপিটালের ডাক্তার। চাইল্ড স্পেশালিস্ট। আগে ওরা বিডন স্ট্রিটে থাকত। এখন চলে গেছে ভবানীপুরের দিকে। ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল, বছর খানেক আগে। নন্দনে সিনেমা দেখতে গিয়ে। মিহিরকে পাওয়া গেলে, কোনও সমস্যা হবে না।

পিছনের সিট থেকে প্রতিমাদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় চললেন ভাই?"

—ক্যালকাটা হসপিটাল।

—প্লিজ, যাবেন না। গাড়ি ঘুরিয়ে নিন।

—কেন?

—ওখানে অনেক খরচের ব্যাপার। ডাক্তার ব্যানার্জিকে জিজ্ঞাসা না করে অত খরচ করা যাবে না।

—খরচের কথা ভাববেন না।

—ওটাই আগে ভাবতে হবে। আমাদের প্রতিষ্ঠান লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে চলে। আরতির জন্য অত খরচ করলে, পরে আমাকে এমব্যারাসিং পজিশনে পড়তে হবে।

—প্রতিমাদি, আপনি চুপ করে বসুন। যা করার, আমি করছি।

ক্যালকাটা হসপিটালে পৌঁছে রিসেপশনে খোঁজ করতেই মিহির নেমে এল। সরকারি হসপিটালের সঙ্গে প্রাইভেট হসপিটালের কত তফাত। সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রেচার চলে এল। এমার্জেন্সিতে দু'জন ডাক্তার আরতিকে দেখার জন্য এসে গেলেন। প্রতিমাদি ভিজিটর্স রুমে বসে রয়েছেন। মিহির সব ব্যবস্থা করে উপরে চলে যেতেই আমি

ভিজিটর্স রুমে ঢুকলাম। প্রতিমাদির চোখ-মুখে বিব্রত ভাব লক্ষ করে বললাম, "আরতির তো ভাল চোট হয়েছে। ডিসলোকেশন। হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার না।"

প্রতিমাদি বললেন, "মেয়েটার কপালই খারাপ।"

—কদ্দিন আছে আপনাদের ওখানে ?

—আট মাস।

—কী হয়েছে ওর ?

—এপিলেপটিক। ভাল হয়ে এসেছিল। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ওকে যখন পাঠায়, তখন খুব খারাপ অবস্থায় ছিল।

—জেল থেকে আপনাদের কাছে পাঠাল কেন ?

—আমাদের প্রতিষ্ঠানটা শুধু মেন্টাল পেশেন্টদের জন্য নয়, ওটা হাফ ওয়ে হোমও।

—মানে ?

—মানে, যারা ভাল হয়ে গেছে, অথচ এখনই ঘরে ফিরে গেলে সমস্যায় পড়তে পারে, সেই সব রোগীকে কিছুদিন আমরা সেবা-য় রেখে ঘরে ফেরার উপযোগী করে দিই।

—ঘরে ফিরলে সমস্যায় পড়বে কেন ?

—পড়ে। পরিবারের সবাই তো সমান হয় না। অ্যাডজাস্ট করতে প্রথম প্রথম অসুবিধে হয়। ওই সময় সামান্য একটা কথা, সামান্য দুর্ব্যবহার রোগটাকে ফের বাড়িয়ে দিতে পারে।

—প্রতিমাদি, আপনি কী সাইকিয়াট্রিস্ট ?

—না। সাইকোলজিস্ট।

সাইকিয়াট্রিস্ট আর সাইকোলজিস্টের মধ্যে পার্থক্য আমি জানি না। জিজ্ঞেস করব কি না ভাবছি, এমন সময় স্ট্রেচারে করে আরতিকে নিয়ে এল দু'জন। পায়ে প্লাস্টার। সঙ্গের লোকটি বলল, "আপনি ক্যাশে গিয়ে টাকা দিয়ে আসুন। আমরা একে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি।"

...আধ ঘণ্টার মধ্যে ফের আমরা সেবা-য় ফিরে এলাম। আউটডোরে একজন পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন ডাক্তার ব্যানার্জি। প্রতিমাদিকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, "এত দেরি হল কেন তোমাদের ? আজ আর অজন্তা ক্লিনিকে যাওয়া হবে না। তিন বার ফোন করল ওখান থেকে। যাক গে, কী হল বলো।"

দু'দিকের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা মেয়ে। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রয়েছে প্রতিমাদির দিকে। চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে না, কেউ মানসিক রোগী। শুনতে এসেছে, আরতির কী হয়েছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রতিমাদি সব রিপোর্ট দিয়ে দিলেন ডাক্তার ব্যানার্জিকে।

সব শুনে ডাক্তার ব্যানার্জি রসিকতা করে আমাকে বললেন, "আপনার নাম কী ভাই গৌরী সেন ?"

—কেন বলুন তো ?

—এই যে বারোশোটা টাকা আপনি খরচ করলেন, ফেরত পাবেন ?

—সেই আশায় তো দিইনি।

—কী করেন আপনি ?

—ছোট বিজনেস আছে আমার।

—খুব শিগগির লাল বাতি জ্বলবে। পরোপকার জিনিসটা খুব খারাপ ধরনের রোগ। এটা পরমবকদের মধ্যে থাকে, অথবা বক ধার্মিকদের মধ্যে। আপনি ভাই কোন দলে পড়েন ?

ভদ্রলোকের সেন্স অফ হিউমার অসাধারণ। হাসতে লাগলাম। তার পর বললাম, "কোনও দলেই পড়ি না। রোগটা বংশগত।"

—আই সি। তা, মুনমুন মিত্তির কে হয় আপনার ? রিলেটিভ ?

—না। বলতে পারেন, ওই রোগের টানে এসেছি।

—গৌরী সেন ভাই, নর্মালি গার্জেন ছাড়া আমরা কাউকে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে দিই না। আত্মীয় সেজে অনেকেই আসে। জোয়ান মেয়ে তো সব। কুমতলবে ঘোরে। আগে আপনার নাম-ঠিকানা-টেলিফোন নাম্বার সব ভিজিটর্স বুকে লিখুন। তার পর দেখি, কী করা যায়।"

আমার খুব খারাপ লাগল কথাটা শুনে। সত্যি এভাবে একা আসাটা উচিত হয়নি। আসার সময় মাসিমাকে তুলে আনলে এই কথাটা শুনতে হত না। মুনমুনদের সঙ্গে কী ভাবে আলাপ, গুছিয়ে অল্প কথায় বললাম ডাক্তার ব্যানার্জিকে। পাপিয়া ভিজিটর্স বুক এগিয়ে দিল। আমি নাম ঠিকানা লিখে দিলাম। তাতে চোখ বুলিয়ে ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "পাপিয়া, দেখো তো মিস বহরমপুর কী অবস্থায় আছে ?"

হি হি করে হেসে উঠল পাপিয়া। তার পর বলল, "একটু আগে ঘুম থেকে উঠল। রেশমিদি চান করানোর জন্য সাধাসাধি করছে।"

—তা হলে ঋচীক ভাই, একটু বসুন।

কথাটা বলে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন ডাক্তার ব্যানার্জি। যেন নিশ্চিন্ত। বললেন, "যাক, আজ আর অজন্তা ক্লিনিকে যেতে হবে না। টাইম পেরিয়ে গেছে। প্রতিমা, এখানে পেশেন্টদের ভিড় দিন কে দিন যেমন বাড়ছে, তোমাদের আর একজন ডাক্তার নেওয়া উচিত। মানসবাবুকে বলো, একা আর সামলাতে পারছি না।" প্রতিমাদি বললেন, "আজ ক'জন হল ?"

—নতুন-পুরনো মিলিয়ে প্রায় তিরিশজন। একজন এসেছে সেই বর্ধমান থেকে। বুঝে দেখো কী অবস্থা। রোগটা কত ছড়াচ্ছে।

—রোগ সম্পর্কে কনসাসও হচ্ছে ডাক্তার ব্যানার্জি।

—তাও বলতে পারো। আগে মেন্টাল ডিসঅর্ডার হলে জলপড়া দিত, ওঝা ডাকত। এখন অন্তত আমাদের কাছে আনার কথা ভাবছে। এই তো দেখো না, আজই একটা ছেলে এল, চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গেছিল। ভাল ছেলে খুব স্মার্ট। ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে বসতেই একদম নার্ভাস। সব জানা সত্ত্বেও ভাল পারফর্ম করতে পারেনি। আমার কাছে এসে জানতে চাইল, হঠাৎ কেন এমন হল ? ছেলেটা যে এই প্রবলেম নিয়ে এসেছে, এতেই আমি খুশি।

চুপচাপ বসে ডাক্তার ব্যানার্জির কথা শুনছি। ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার কৌতূহল বাড়ছে। অদ্ভুত পার্সোনালিটি। একবার মনে হচ্ছে, এ-রকম মজার লোক হয় না। পরক্ষণেই প্রচণ্ড সিরিয়াস। ঘরের মধ্যে একজন রোগী এখনও বসে আছেন।

দরিদ্র পরিবারের বয়স্ক এক মহিলা, তার দিকে হঠাৎই যেন নজর পড়ল ডাক্তার ব্যানার্জির। বললেন, "ও রেণুদি, বসে আছেন কেন ? বাড়ি যান। আজ সঙ্গে কেউ আসেননি ?"

—না বাবা। কারও অত সময় নেই।

—তা বললে চলবে ? আপনার চার-চারটে ছেলে। একজনও মাকে দেখবে না ?

ভদ্রমহিলা মুখ তুলে মৃদু গলায় বললেন, "মাকে ওদের আর দরকার নেই বাবা। আমার কাছ থেকে ওদের কিছু পাওয়ার নেই।"

চমকে তাকালাম ভদ্রমহিলার দিকে। মুখে এক চিলতে হাসি। কী করুণ সেই হাসি ! দেখে বুকটা হঠাৎ মুচড়ে উঠল। আমার মায়েরই বয়সী। পরনে অল্পদামের সাদা থান। ভদ্রমহিলা অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আস্তে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তার ব্যানার্জি মুখ ফিরিয়ে বললেন, "রেণুদিকে দেখলেও কষ্ট হয়, জানো প্রতিমা, কী ছিলেন, কী হয়ে গেলেন। এত সম্পত্তি ছিল, ছেলেরা সব লিখিয়ে নিয়েছে। এখন কেউ দেখে না। যাক গে সে কথা। সৌমিত্র ছেলেটার সঙ্গে কথা বললে আজ ?"

—হ্যাঁ। কিন্তু তেমন রেসপন্ড করল না।

—ওর মামা কী বলল ?

—মাধ্যমিকে নাকি ভাল স্টুডেন্ট ছিল। পাস করার পর আর পড়াশুনা করেনি। টি ভি মেকানিকের কাজ করত। চাকরি নিয়ে কটকে যায়। হঠাৎই ফিরে আসে সেখান থেকে। তার পরই সিজোফ্রেনিয়ার সিম্পটম দেখা দেয়। মামা বলল, নয়না নামে একটা মেয়ের সঙ্গে লাভ অ্যাফেয়ার্স ছিল। বোধহয় মেয়েটা রিফিউজ করে। পুজোর সময় একবার অ্যাটেম্পট করেছিল সুইসাইডের।

—ছেলেটা কি চলে গেছে ?

—না। বসে আছে।

—ডাকো তো। কথা বলি।

উঠে গিয়ে প্রতিমাদি ডাকতেই সৌমিত্র ছেলেটা ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে বলল, "ডাক্তারবাবু, ঘরে কোনও মেয়েছেলে থাকলে আমি কিন্তু কথা বলব না।" ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "এটা কী কথা। মেয়েছেলে বলে কোনও কথা হয় নাকি ? হয় মেয়ে, না হয় ছেলে। বাবা, তোর হাতের মাসলগুলো তো দারুণ রে। খেলাধুলো করতিস বোধহয়, তাই না ?"

সৌমিত্র বলল, "হ্যাঁ, জিমন্যাস্টিকস করতাম।"

—পারবি এখন ? কী যেন বলে... ফ্লোর এক্সারসাইজ, বিম ব্যালেন্স... আর কী সব বলে, বল না রে।

—রিং, হরাইজেন্টাল আর আন ইভন বার...

—এখন ওসব করিস না ?

—না। আমার মাথায় যে বাজ পড়েছে ডাক্তারবাবু।

—দেখেই মনে হচ্ছে সেটা। এখনও ভেতরে রয়ে গেছে বাজটা, বুঝলি। ওষুধ না দিলে বেরিয়ে আসবে না।

—কিন্তু ওষুধ কেনার টাকা তো মায়ের কাছে নেই ডাক্তারবাবু।

—নেই ? তা হলে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি। তুই পরে আমায় শোধ দিয়ে দিস।

— কী করে দেব। আমি তো রোজগার করি না।

—টি ভি সারাতে তো পারিস। পারিস কি না ? আমার একটা টি ভি, খারাপ হয়ে পড়ে আছে। সেটা সারিয়ে দিতে পারবি ?

—কোথায় সেটা ?

—এখানে না। অন্য জায়গায় আছে। দাঁড়া, তোর মাথায় যে বাজটা ঢুকেছে, সেটা আগে বের করে দিই। তার পর তোকে টি ভি সেট-এ হাত দিতে দেব। আরে বাবা আমি কি অতই বোকা ? এখন তোকে সারাতে দিই, আর ফাঁক পেয়ে ওই বাজটা টি ভি-র ভেতরে ঢুকে যাক... সব তা হলে নষ্ট।

—না ডাক্তারবাবু, সেটা ঠিক হবে না।

আর কোনও কথা না বলে ডাক্তার ব্যানার্জি প্রেসক্রিপশন লিখতে শুরু করলেন। মিটিমিটি হাসছেন। দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি বললেন, "ওষুধ তো লিখে দিচ্ছেন। খাবে কি ? আগের ডাক্তারবাবুও একগাদা ওষুধ দিয়েছিলেন, একটাও খায়নি। সব ফেলে দিয়েছিল।"

ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "খাবে। খাবে। ওর তো মুণ্ডু নেই। ওর ঘাড় খাবে।"

প্রেসক্রিপশন নিয়ে সৌমিত্র ছেলেটা চলে যাওয়ার পরই, পর্দার ফাঁক দিয়ে পাপিয়া মুখ বাড়িয়ে বলল, "মিস বহরমপুরের চান-খাওয়া হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু।"

ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল ? কী আর করা যাবে। প্রতিমা, তুমি ওপরে নিয়ে যাও গৌরী সেনকে।"

প্রতিমাদির পিছু পিছু পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢোকার পরই মনে হল, এ এক অন্য জগৎ। ভেতরে বোধহয় খুব বেশি পা পড়ে না পুরুষ মানুষের। কয়েকটা মেয়ে কাজে ব্যস্ত। আমাকে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। এক তলার বেশিরভাগ জানলা বন্ধ। দিনের বেলাতেও তাই লাইট জ্বলছে। প্রতিমাদি কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলেন, "দোতলা আর তিনতলায় রোগীদের ওয়ার্ড। মুনমুনকে রাখা হয়েছে তিনতলায়।"

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। লম্বা হল ঘর 'এল' টাইপের। পরপর বেড। সুন্দর বেড কভার। সরকারি হসপিটালের মতো নয়। বেশির ভাগ বেডই খালি। মাঝে একটা বেডে আঠারো-উনিশ বছরের একটা মেয়ে শুয়ে রয়েছে। পায়ের শব্দে মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। তারপর বলল, "ও দিদি, একবার আসবেন ? আমার ডান হাঁটুটা খুব ফুলে গেছে।"

ডাক শুনে প্রতিমাদি দাঁড়িয়ে পড়লেন। মেয়েটা স্কার্ট পরে রয়েছে। হাঁটু দেখানোর জন্য স্কার্ট কোমর পর্যন্ত তুলে ধরল। কোনও আন্ডারওয়ার পরেনি। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। প্রতিমাদি আমার সামনে অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন। দ্রুত কাছে গিয়ে স্কার্ট নামিয়ে দিয়ে বললেন, "মিনু, আরতিকে দেখার জন্য ডাক্তারবাবু যখন ওপরে উঠছিলেন, তখন বলোনি কেন ?"

—ডাক্তারবাবু রাগ করেন যে।

—হাঁটু কবে ফুলল ? কাল তো দেখিনি ?

—আজ সকালে, ঘুম থেকে উঠে দেখলাম।

—ব্যথা করছে ?

—খুউব। আমাকে গাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে চলুন দিদি।

—ডাক্তারবাবু আগে তোমায় দেখুক। যদি বলেন, নিয়ে যাব। কেমন ? তুমি শুয়ে থাকো। বেশি হাঁটা-চলা কোরো না।

—পেচ্ছাপ পেলে কী করব দিদি ?

—রেশমিদিকে ডেকো। কেমন ?

—ঠিক আছে। বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল মেয়েটা। প্রতিমাদি বললেন, "চলুন, তিনতলায়। এই মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। আরতির সঙ্গে হিংসে ; ঝগড়া। আরতিকে বাইরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অতএব ওকেও নিয়ে যেতে হবে এখন।"

—মেয়েটার পায়ে কিছু হয়নি ?

—সামান্য ফুলেছে। ডাক্তারবাবুকে বলতে হবে গিয়ে।

—রেশমিদি কে প্রতিমাদি ?

—মেয়েদের ওয়ার্ড উনিই দেখাশুনো করেন। চলুন ওপরে।

প্রতিমাদির পিছু পিছু তিনতলায় উঠে এলাম। এই ফ্লোরটা আরও ঝকঝকে। হল ঘরে অন্য কোনও পেশেন্ট নেই। কোণে জানলার দিকে একটা বেডে বসে রয়েছে মুন। চুল খোলা। পরনে ম্যাক্সি। কয়েক পা হেঁটে বেডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দিন পনেরো পর মুনকে দেখছি। পিছন থেকে অন্য রকম লাগছে ওকে ঘরোয়া পোশাকে।

মুন ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দু'জনকে দেখল। তারপর না-চেনার ভান করে ফের তাকিয়ে রইল জানলার দিকে। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ কী ? মুন এমন ভাব দেখাচ্ছে, যেন আমাকে দেখেওনি কোনও দিন। তা হলে সেদিন ফোন করে অত কথা বলল কেন ? প্রতিমাদির চোখ মুখ হঠাৎ বদলে গেছে। চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। দেখে আমার জেদ চেপে গেল। বললাম, "আমায় চিনতে পারছ না, মুন ?"

প্রশ্নটা যেন শুনতেই পেল না। পাশ ফিরে রয়েছে। প্রোফাইল দেখতে যাচ্ছি। নাকছাবিটা চিক চিক করে উঠল। ঠোঁটটা ফোলা ফোলা লাগছে। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে মুন। ফের বললাম, "মুন, দেখো, আমি এসেছি। একবার এদিকে তাকাও।"

আর এক ভদ্রমহিলা উঠে এসেছেন। এসে দাঁড়িয়েছেন প্রতিমাদির পাশে। স্পষ্ট দেখলাম, দু'জনের মধ্যে চোখাচোখি হল। দু'জনের চোখেই সন্দেহ। ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করলাম। এঁরা দু'জন আমাকে অবিশ্বাস করছেন। খুব খারাপ লাগছে। বোকামি করেছি। বোকার মতো কাজ করেছি। সুদীপা বা মাসিমার সঙ্গে এখানে আসা উচিত ছিল। মুন যদি আদৌ চিনতে না পারে তা হলে এঁদের সামনে লজ্জায় পড়তে হবে আমাকে। শেষ চেষ্টা করলাম, "মুন, এদিকে একবার তাকাও। আমি তোমার বাজে লোক।"

এ বার ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল ও। তারপর বলল, "কে আপনি ? আমাকে

বিরক্ত করছেন কেন ?"

কথাটা এমন বিশ্রীভাবে বলল, শোনা মাত্র আমার শরীরের রক্ত কে যেন শুষে নিল। ফ্যাকাসে মুখে প্রতিমাদির দিকে তাকালাম। কোনও রকমে বললাম, "আমি বুঝতে পারছি না, কেন আমাকে চিনতে পারছে না এখন।"

নিরাসক্ত গলায় প্রতিমাদি বললেন, "নীচে চলুন ঋচীকবাবু। না হলে পেশেন্ট ভায়োলেন্ট হয়ে উঠতে পারে।"

প্রায় টলতে টলতেই নীচে নেমে এলাম। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে। কী ভাববেন ডাক্তার ব্যানার্জি ? কুমতলবে ঢুকেছিলাম ? একতলায় নামতেই, আমার চোখ-মুখ দেখে বোধহয় কিছু বুঝতে পারলেন ডাক্তার ব্যানার্জি। জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হল ঋচীক ভাই ? এত তাড়াতাড়ি নেমে এলে ?"

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই প্রতিমাদি বলে উঠলেন, "পেশেন্ট তো চিনতে পারল না।"

ডাক্তার ব্যানার্জি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক সেকেন্ড পর উনি বললেন, "এটা হবে, জানতাম।"

॥ পাঁচ ॥

সকালবেলায় হালকা ব্যায়াম করার অভ্যেস আমার ছোটবেলা থেকে। সারা দিন শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগে। অভ্যেসটা ধরিয়েছিলেন বাবা। নিজেও মুগুর ভাঁজতেন। মায়ের মুখে শুনেছি, বাবা নাকি গোবর গুহ-র আখড়ায় যেতেন। কুস্তি সেরে এসে রোজ বাদাম-পেস্তার সরবত খেতেন। বাবার সেই কাঠের মুগুর আর কয়েকটা ডাম্বেল এখনও রয়েছে। আমাদের বাড়ি থেকে হাওড়া ব্রিজের চুড়োটা দেখা যায়। সেই চুড়োয় সূর্যের আলো এসে পড়ার আগেই নাকি বাবা রোজ ছাদে উঠে ব্যায়াম শুরু করে দিতেন।

এখন আমাদের বাড়ি থেকে সেকেন্ড হুগলি ব্রিজের একটা অংশ দেখা যায়। মুগুর ভাঁজতে আমি পারি না। কিন্তু কয়েকটা 'ডন-বৈঠক মেরে আর হালকা ওজনের ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়ামটা সেরে নিই। এ অঞ্চলে আমার আরও একজন সঙ্গী আছে। পাশের বাড়ির মানুদা। আমার থেকে পাঁচ-ছ' বছরের বড়। মানুদাও রোজ সকালে ছাদে উঠে ব্যায়াম করে। কোনও কোনও দিন আমার আগেই শুরু করে দেয়। মানুদার ছোট ভাই বিলু আমার সঙ্গে স্কটিশ চার্চ স্কুলে পড়ত। এখন চাকরি করে কর্পোরেশনে। মানুদা দারুণ ওয়াটার পোলো খেলত। খেলার সূত্রেই চাকরি পেয়েছে ইস্টার্ন রেলে। চাকরি পাওয়ার পরই বিয়ে করেছে। মানুদার বিয়েতে আমিও বরযাত্রী হয়ে গেছিলাম বরানগরে।

বাবা বলতেন, ব্যায়াম করার সময় অন্য কোনও দিকে মন দিবি না। শরীরটা হচ্ছে মন্দির। তাই মনটাকে সব সময় পবিত্র রাখবি। মন নিয়ন্ত্রণে রাখা কি সোজা ব্যাপার ? সব সময় অন্য দিকে দৌড়য়। আজই যেমন ঘুম থেকে ওঠার পর কেবল মনে হচ্ছে মুনের কথা। কাল ও আমাকে চিনতে পারেনি। সেবার গিয়ে খুব লজ্জায় পড়ে গেছিলাম। যখন চলে আসব ভাবছি, তখনই ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "এটা

হবে, জানতাম।"

ডাক্তার ব্যানার্জি এর পরেই হালকাভাবে বলেছিলেন, "পাপিয়া, ঋচীক ভাইকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে দে। বড্ড ঘামছে। বোধহয় তেষ্টাও পেয়েছে।" কথাগুলো বলেই উনি অ্যাটাচি কেসে স্টেথিসকোপ আর প্রেসার মাপার সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখতে শুরু করেন। প্রতিমাদি সোফায় বসে। রেশমিদি পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে। দু'জনেই ডাক্তার ব্যানার্জির দিকে তখন কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

দৃশ্যটা বারবারই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। জীবনে কখনও ওই অবস্থায় পড়িনি। মুন আমার কেউ হয় না। কয়েক ঘণ্টার আলাপে, তেমন কিছু ঘনিষ্ঠতাও হয়নি। ওকে দেখতে যাওয়ার কী এমন দরকার ছিল ? মুন বলল, "আপনি আমাকে বিরক্ত করছেন কেন ?" ঠিকই বলেছে। এমন একটা ধাক্কা খাওয়া আমার উচিত ছিল।

মনে মনে এসব ভাবছি, এমন সময় ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "ঋচীক ভাই, সেদিন ট্রেনে যখন মিস বহরমপুরকে তুমি বাঁচাও, তখন তোমার পরনে ঠিক কী পোশাক ছিল ?"

—নীল জিনসের প্যান্ট আর সাদা টি শার্ট।

—এখানে গণ্ডগোলটা করে ফেলেছ।

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তাই বললাম, "কেন ?"

—মুন সেদিন যে পোশাকে দেখেছে তোমাকে সেই পোশাকেই ও চিনবে তোমাকে। সেই লোকটাই ওর মনের মধ্যে ইমপ্রিন্ট হয়ে আছে। আজ তো তোমায় চিনতে পারবে না ভাই।

অবাক হয়ে বললাম, "এ রকম হয় নাকি ?"

—হয়। হয়। মুন, মুন তো এখন, আর পাঁচজনের মতো নর্মাল নয়। ওর ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। কী, রাগ হচ্ছে খুব তাই না ? রাগ কোরো না। এর পরের বার যখন তুমি আসবে, দেখো তখন ও ঠিক তোমাকে চিনতে পারবে। এই অর্ণব ব্যানার্জির ট্রিটমেন্টের গুণ তখন নিজের চোখে দেখতে পাবে।

বলেই হেসে উঠেছিলেন ডাক্তার ব্যানার্জি। শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলাম আমি। যাক, উনি অন্তত আমাকে সন্দেহ করেননি।

মুনকে ফের দেখতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বুটুর বিয়ে আর প্রোজেক্টের কাজ নিয়েই আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে আগামী কয়েকটা দিন। বুটুর বিয়েতে কী প্রেজেন্ট করব, সেটা ভাবতে হবে। মা ওকে একটা সোনার নেকলেস দেবে। আমি কী দেব, ঠিক করতে পারছি না। মাসিদের আত্মীয়স্বজন এমন, বুটু প্রচুর সোনার জিনিস পাবে। বুটুকে তাই এমন কিছু দিতে হবে, পরে যেন মনে রাখে। ব্যায়াম করার ফাঁকে আজ মনটা বারবার অন্য দিকে যাচ্ছে। একেক দিন এটা হয়। তখন বন্ধ করে দিই। আজও তাড়াতাড়ি শেষ করে নীচে নেমে এলাম। আজ একবার বাজারের দিকে যেতে হবে। দরজায় দাঁড়াতেই দেখি, গেটের সামনে চন্দনাদি। ট্যাক্সি থেকে নামছে। বোধহয় ভোরের ট্রেনে উঠেছে বহরমপুর থেকে। মুখ গম্ভীর। মাঝে একদিন ফোন করেছিল। বলেছিল, বইমেলার সময় আসবে। এত আগে চলে এল ? রঞ্জনদার সঙ্গে ঝামেলা কি তা হলে মিটে গেছে ?

ঘাড় ঘুরিয়ে এই সময় চন্দনাদি আমাকে দেখতে পেল। বলল, "ভাই, তুই কোথাও বেরিয়েছিলি নাকি ?"

—হ্যাঁ। তুমি এই সময় ?

—কাল রাতে মা ডেকে পাঠাল যে।

—কাকিমা, না রঞ্জনদা ?

—বাজে বকিস না। ওই লোকটার কথা শুনতে আমার বয়ে গেছে। বাড়িতে বিপদ, আর তুই ইয়ার্কি মারছিস।

সামান্য ব্যাপারে বিচলিত হওয়া চন্দনাদির স্বভাব। ছোটবেলা থেকে দেখছি। হাতে সুটকেসটা তুলে নিয়ে বললাম, "কী বিপদ, দিদিভাই ?"

—তুই কিছু জানিস না ?

—না। কী হল তোমাদের বাড়িতে ?

—কী আবার, তিতলিকে নিয়ে অশান্তি।

—কী করেছে তিতলি ?

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল চন্দনাদি। তারপর বলল, "তোরা শুনিসনি ? তিতলি...প্রেগনেন্ট।"

॥ ছয় ॥

ঋষি ছেলেটাকে মাঝেমধ্যে তিতলির সঙ্গে দেখেছি। কিন্তু ও যে এই সর্বনাশের নায়ক হতে পারে, ভাবতেও পারিনি। বয়স সাতাশ-আটাশ। ছোট্টখাটো চেহারা। গালে পাতলা দাড়ি। চোখ দুটো খুব সুন্দর। কথা বলে নরম স্বরে। এই ধরনের ছেলেদেরই সব থেকে বেশি দেখা যায় কফি হাউসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরা কথা বলে যেতে পারে যে কোনও বিষয় নিয়ে। তিতলির মতোই ছেলেটাকে কোনও দিন গুরুত্ব দিইনি।

চন্দনাদি ঠিকানা জোগাড় করে দিয়েছে। ঋষিকে খুঁজতে এসেছি চেতলায়। ঠিকানা মিলিয়ে গাড়িটা দাঁড় করালাম বাড়ির সামনে। তিতলির কথা মতো, হপ্তাখানেক ধরে ঋষি নাকি উধাও। প্রেগনেন্সির কথা জানার পর থেকে নাকি ও আর তিতলির সঙ্গে দেখা করছে না। শুনে ছেলেটার উপর মারাত্মক রাগ হয়েছে। পারলে আজই ওকে তুলে নিয়ে যাব। সাধারণত আমার শরীরে রাগ-টাগ কম। কিন্তু একটা ছেলে তিতলির সর্বনাশ করে পালিয়ে যাবে, সহ্য করা কঠিন।

বাড়ির সামনে এক ফালি বাগান। সেখানে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন বয়স্ক এক ভদ্রলোক। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। বেশ সৌম্য দর্শন। ঋষির বাবা ? হতে পারেন। লোহার গেটের ও পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, "ঋষি আছে ?"

ভদ্রলোক যেন শুনতেই পেলেন না। কানে কম শোনেন নাকি ? একটু গলা চড়িয়েই ফের ডাকলাম, "ঋষি কি এই বাড়িতে থাকে ?"

না, কোনও সাড়াশব্দ নেই ভদ্রলোকের। খবরের কাগজে ডুবে আছেন। আচ্ছা মুশকিল। হঠাৎই চোখে পড়ল গেটের গায়ে কলিং বেল। টিপতেই বেরিয়ে এল ঋষি। আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "বুবুনদা, আপনি ?"

এই ছেলেটার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে কোনও লাভ নেই। তাই একটু রুক্ষভাবেই বললাম, "ঋষি, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

—আসুন, ভেতরে আসুন।

—না, আমি আর ভেতরে যাব না। তুমি যদি আসতে পারো, ভাল হয়।

ঋষি উড়িয়েই দিল কথাটা। বলল, "তা কী করে হয়, আপনি এই প্রথম আমাদের বাড়িতে এলেন। বাইরে থেকে চলে যাবেন, সেটা কী ভাল দেখায়? অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যও ভেতরে আসুন।"

কথাবার্তায় ছেলেটা খুব চোস্ত। এই ধরনের ছেলেগুলো এ রকমই হয়। বললাম, "ঠিক আছে, আসছি। কিন্তু দু'মিনিটের বেশি বসব না।"

ঋষি আমার কথা শুনে অবাক হচ্ছে। হোক, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না। ওর ন্যাকামি একটু পরেই আর বরদাস্ত করব না। ছোট বাগান পেরিয়ে উঠে এলাম বারান্দায়। ঘর থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। দেখেই মনে হয়, এক সময় খুব সুন্দরী ছিলেন। ঋষি পরিচয় করিয়ে দিল, "ইনি আমার মা।"

ঋষির মা বললেন, "তোমার কথা অনেক শুনেছি বাবা। বোসো। আমি চা করে আনছি।"

চা-ফা খাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। ঋষিকে আমি একটা কথাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, কত শিগ্গির ও বিয়ে করতে পারবে তিতলিকে। কাল রাতে চন্দনাদি আর আমি ঠিক করেছি, সময় নষ্ট করব না। তেমন হলে দু'বোনের বিয়ে একই সঙ্গে হবে। চন্দনাদির বিয়ে ঠিকই হয়ে আছে চৌদ্দই ডিসেম্বর।

ঋষি ওর ঘরে নিয়ে আমাকে বসাল। খুব সুন্দর সাজানো গোছানো। দেওয়াল জুড়ে চার্লি চ্যাপলিনের একটা ছবি। তার পাশে পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউটের সার্টিফিকেট। ঋষি ফিল্ম ডিরেকশনের কোর্স করে এসেছে। ওর একটা ডকুমেন্টারি কিছুদিন আগে প্যারিস না ক্যান, কোথায় যেন পুরস্কার পেয়েছে। ঘরের সর্বত্র রুচির ছাপ। এ ঘরে বসে ভাবাই যায় না, ছেলেটা তিতলিকে প্রেগনেন্ট করেছে।

টেবলের ওপর কিছু কাগজ ছড়ানো সেগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে ঋষি বলল, "পুরুলিয়ার নাচনী সম্প্রদায়কে নিয়ে একটা সিরিয়াল করছি। বসে বসে তারই স্ক্রিপ্ট লিখছিলাম। তিতলি আপনার কাছ থেকে টাকা বের করতে না পারলে, আমাদের এই ভেঞ্চারটা মাঠে মারা যেত।"

যাক, নিজেই তিতলির কথা তুলে ভাল করেছে ঋষি। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তিতলির খবর তুমি রাখো?"

—কেন? কী হয়েছে ওর?

—ক'দ্দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?

—দিন সাতেক। ফলতা থেকে ফেরার পর ও-ই বলল, কলকাতায় থাকবে না। বহরমপুরের বাড়িতে যাবে চন্দনাদিকে আনতে। আমি নিজেও স্ক্রিপ্ট নিয়ে এত ব্যস্ত, দিন কয়েক বাড়ি থেকে বেরোইনি। জানেন বুবুনদা, স্ক্রিপ্টই আসল। এটা ঠিক ভাবে করতে পারলে...

ঋষি আরও কী বলে যাচ্ছে। আমার মাথায় ঢুকছে না। ছেলেটা হয় খুব ভাল, না হয় শয়তান টাইপের। কেমন পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। যা জিজ্ঞাসা করতে

এসেছি, এ বার সরাসরি করা দরকার। জিজ্ঞাসা করতে যাব, এমন সময় পর্দার ফাঁক দিয়ে ডাকলেন ওর মা, "টুটু একবার এ দিকে আসবি।"

ঋষি দ্রুত পায়ে পর্দার ও পাশে চলে গেল। ওর মায়ের গলা শুনলাম, "ফের তোর বাবা বেরিয়ে যাচ্ছে।"

সামনেই জানলা। সে দিকে তাকাতেই দেখলাম, বাইরে বসে থাকা ভদ্রলোক লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। এ দিক-ও দিক তাকাচ্ছেন। ঋষি প্রায় দৌড়েই গেটের কাছে পৌঁছে গেল। বাবা ও ছেলের মধ্যে কী যেন কথা হচ্ছে। ঋষি বাবাকে ধরে ধরে নিয়ে এল।

একটু পরেই ঋষি ঘরে ঢুকে বলল, "আমার বাবা মেন্টালি একটু ডিপ্রেসড হয়ে পড়েছেন। খালি বাইরে চলে যেতে চান। বছর তিনেক রিটায়ার করেছেন। সারাদিন বাড়িতে বসে থাকেন। হঠাৎ মাথায় ঢুকেছে, আমাদের জন্য কিছুই করে যেতে পারেননি।"

ছেলেটা কি কথা ঘোরাচ্ছে? ঠিক বুঝতে পারলাম না। বলছে খুব সরলভাবে। তিতলির প্রসঙ্গ তো তুলবই। তার আগে ওর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা জেনে নেওয়া দরকার। তাই কথার পিঠে বললাম, "তোমার বাবা কী চাকরি করতেন ঋষি?"

—কোল ইন্ডিয়ায়। অ্যাকাউন্টস অফিসার। আসলে উনি খুব সৎ ছিলেন। কারও কাছ থেকে কোনও দিন ঘুষ নেননি। অথচ বাবার থেকেও জুনিয়র অফিসাররা সব ফুলে ফেঁপে গেছেন। চাকরি করতেন খুব ডাঁটের মাথায়। এখন আক্ষেপ করেন, কেন পড়ে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাননি।

—তোমার আর কে আছেন?

—তিন দিদি আর এক বোন।

—সবার বিয়ে হয়ে গেছে?

—না। বড়দি ম্যারেড। আসলে মেজদির বিয়ের সব কিছু ঠিক হয়ে ছিল। পাত্রপক্ষ অনেক জিনিস চেয়ে বসল। সেটা দেওয়া বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার পর বিয়েটা ভেস্তে গেল। বাবা একটা শক পেলেন। এখন একটু অ্যাবনর্মাল হয়ে গেছেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন। তখন আবার ধরে বেঁধে আনতে হয়।

তিতলিকে ফাঁসাবার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া গেল। বাস্টার্ডটা দেখেছে, তিতলির বাবার অনেক সম্পত্তি। কাকাবাবু চোখ বুজলেই, হাতের মুঠোয় তা এসে যাবে। ঘাড়ে তিন বোন। এই ফ্যামিলিতে এসে তিতলির কী হবে, ভাবতেই খারাপ লাগল। ভেতরে ভেতরে রাগ হচ্ছে। মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল কথাটা, "ঋষি, তুমি এই ভাবে কেন সর্বনাশ করলে তিতলির?" পর্দা সরিয়ে ওর মাকে ঘরে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেলাম।

চায়ের কাপ টেবলের ওপরে রেখে ঋষির মা বললেন, "তোমার কি ভাল কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট জানা আছে? ওর বাবাকে তা হলে দেখাতাম।"

আমি বশ মানাতে এসেছি ঋষিকে। ওর মায়ের সঙ্গে অভদ্রতা করার দরকার নেই। বললাম, "কাউকে দেখাননি?"

—রাসবিহারীর মোড়ে একজন বসেন। তাঁকে দেখিয়েছি। লাভ হয়নি। উনি

শুধু ঘুমের ওষুধ দেন। ইদানীং মাঝেমধ্যে ভায়োলেন্ট হয়ে উঠছেন। মেয়েদের সহ্য করতে পারেন না। একমাত্র যা, ঋষির কথা শোনেন।

হঠাৎই ঠাকুরপুকুরের সেবা-র কথা মনে পড়ল। বললাম, "ডাঃ অর্ণব ব্যানার্জি বলে একজনকে আমি চিনি। ওকে দেখাতে পারেন। পরে ঋষিকে আমি ঠিকানা দিয়ে দেব।"

দু'একটা কথা বলে ঋষির মা ভেতরে চলে গেলেন। ঋষি এ বার বলল, "বুবুনদা, আপনি কী জন্য এসেছেন, সেটা তো বললেন না ? নিশ্চয়, তিতলির ব্যাপারে ?"

স্থিরদৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকালাম। গাটস্ আছে। পরক্ষণেই রুক্ষভাবে বললাম, "তিতলির এই অবস্থা তুমি কেন করলে ?"

—কী অবস্থা বুবুনদা ?

—জানো না, ও প্রেগনেন্ট ?

এ বার আমার দিকে তাকিয়ে রইল ঋষি। তারপর বলল, "দাঁড়ান বুবুনদা, মনে হচ্ছে, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। লাস্ট যে দিন ওর সঙ্গে দেখা হয়, সেদিন ও আমাকে বলেছিল কথাটা। কিন্তু..."

—কিন্তু কী ?

—ও আমাকে বলেছিল, এ জন্য দায়ী আপনি।

—কী বলছ তুমি ?

—ঠিক বলছি। ও আমাকে আরও বলেছিল, আপনি নাকি অ্যাবরশন করাতে চাইছেন। আমার হেল্পও নিতে পারেন। তেমন হলে, হাজবেন্ড হিসাবে আমার নামটা ধার দিতে হতে পারে।

—হোয়াট ননসেন্স। এ সব কথা তিতলির সামনে বলতে পারবে তুমি ?

—স্বচ্ছন্দে। আমরা তো সবাই জানি, তিতলির সঙ্গে আপনার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। ওকে আপনি পাওয়ার জন্য মরিয়া। বিয়েটা হচ্ছে না, আপনার মায়ের জন্য। মাসিমার নাকি আপত্তি আছে।

—তিতলি এ সব বলেছে ?

—অনেককে। আমাদের গ্রুপের সবাই জানে। যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

—আমি বিশ্বাস করছি না।

—বিশ্বাস করা না-করা আপনার ব্যাপার। গ্রুপে অবশ্য তিতলিকে আমরা কেউ বিশ্বাস করি না। ও খুব মিথ্যে কথা বলে। স্রেফ টাকার জন্য ওকে রেখেছি। সিরিয়ালটা শেষ হলেই ভাগিয়ে দেব।

গুম হয়ে বসে রইলাম। ঋষির কথা সত্যি হলেও হতে পারে। ও এমন মেয়ে যে কোনও লোকের নামে অপবাদ দিয়ে দিতে পারে। বাড়িতে বলেছে ঋষির নাম। বাইরে আমার। এ কথা যদি মায়ের কানে যায়, শক পাবে। এই মেয়েটা ছোটবেলা থেকেই এ রকম। কাকাবাবুর আয়ু কমিয়ে দিল বছর দশেক। ঋষির উপর থেকে রাগটা সরে যাচ্ছে তিতলির উপর। ওকে ধরতে হবে। খারাপ, খুব খারাপ হয়ে গেছে ও।

ঋষি বলল, "আপনি যদি চান, এখুনি আপনার সঙ্গে ওদের বাড়িতে যেতে আমি

রাজি বুবুনদা। আপনি কি ওকে সত্যিই বিয়ে করবেন ?"

—তোমার মাথা খারাপ ? মেয়েটা উচ্ছন্নে গেছে। ছি ছি, তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই। কড়া কথা বলেছি বলে। আই অ্যাম রিয়েলি সরি।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে।

মিনিট দশেক পর বেরিয়ে এলাম ঋষিদের বাড়ি থেকে। মাথার ভেতর চণ্ডালের রাগ নিয়ে। দু'দিন ধরে যা চলছে, মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। কাল সকালে দেবার সুইসাইড, তারপর তিতলিকে নিয়ে এই অশান্তি। বাড়ির দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে একবার ভাবলাম, তিতলিকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। কাল রাতে চন্দনাদি আর আমি ওকে ধরেছিলাম। ওর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। একবার বলল, "আমি প্রেগনেন্ট, তোর কী রে দিদি ? তুই তো হোসনি।"

চন্দনাদি রেগে বলেছিল, "তার মানে ? এই ভাবে তুই বাবার নাম ডোবাবি ?"

তিতলি বলেছিল, "বাবার সঙ্গে আমাকে জড়াস না দিদি। আমি এখন সাবালিকা। আমি আমার মতো চলব।"

তখনই ইচ্ছে হচ্ছিল, ঠাস করে একটা চড় মারি। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। বিছানার তলা থেকে প্যাকেট বের করে তিতলি দিদির সামনে সিগারেট ধরিয়েছিল। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বলছিল, "তুই আর ন্যাকামি করিস না দিদি। সব জানি। রঞ্জনদা একদিন তোকে চুমু খেয়েছিল। আমি দেখেছি।"

আমি ধমক দিয়েছিলাম, "তিতলি।"

ফের ধোঁয়া ছেড়ে ও বলেছিল, "সত্যি কি না ওকে জিজ্ঞেস করো। রঞ্জনদা এলেই আমি ঘাপটি মেরে থাকতাম। হাতে-নাতে ধরব বলে। ঠিক ধরেছি। আমার কাছে কদ্দিন আর সতীপনা দেখাবি ?

এত কড়া কথা সহ্য করার মেয়ে নয় চন্দনাদি। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। আমি জানি। ঘটনাটা সত্যি। তারপরই চন্দনাদি চলে যায় বহরমপুর। তিতলিকে ধমক দিয়েছিলাম, "থাম। নিজের সঙ্গে দিদিভাইয়ের তুলনা করবি না। তোর জন্য আমরা সবাই ভুগছি।"

বাঁকা চোখে তাকিয়েছিল তিতলি। বলেছিল, "আমি আমার মতো আছি। আমার জন্য কাউকে চিন্তা করতে হবে না।"

কাল রাতে তর্কাতর্কি কম হয়নি। একেক সময় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল টেনে দুটো চড় মারি। তিতলিটা হঠাৎ যেন অবাধ্য হয়ে গে ি কাকাবাবু শখ করে ওকে ভর্তি করলেন লরেটোতে। পড়াশুনোয় দারুণ ছিল। উঁচু ক্লাসে ওঠার পরই ওর পাখনা গজাল। ট্যাশ কালচারের মেয়েদের সঙ্গে পড়ত। অল্প বয়সে পেকে গেল। স্কুল থেকে বেরিয়েই ভর্তি হল লেডি ব্র্যাবোর্নে। ব্যস, ওকে আর পায় কে ? ছোটবেলা থেকেই যত আবদার আমার কাছে। দাদাও ওকে খুব ভালবাসত। প্রকাশ্যেই বলত, "কাকাবাবুর এই মেয়েটা ট্রিমেন্ডাস সাইন করবে।" কলেজে ওঠার পর, ও প্রথম আমাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করে। আমি প্রশ্রয় দিইনি। ধীরে ধীরে মেয়েটা বিগড়ে যায়। চন্দনাদির ওপর হিংসে ওর তখন থেকেই।

গাড়ি চালাতে চালাতে তিতলির কথা ভাবছি। আজ একটা ভুল ধারণা ভেঙে গেল। ঋষির সঙ্গে ওর মাখামাখি দেখে, একটা সময় ভেবেছিলাম, তিতলি বোধহয়

ওকে খুব পছন্দ করে। আজ বুঝলাম, না তা নয়। ওদের সম্পর্কটা নিছক প্রয়োজনের। ঋষির একটা কথা, মনে খচখচ করছে। শেষদিকে, হঠাৎই ও বলে ফেলল, "বুবুনদা, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি। তিতলি কিন্তু আপনাকে প্রচণ্ড ভালবাসে। নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। ওর অনেক খারাপ দিক আছে। তা সত্ত্বেও, এই একটা ব্যাপারে ও কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট খাঁটি। অন্য কোনও ছেলের কথা ও চিন্তাই করতে পারে না।"

কথাগুলো শুনে প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। ঋষির সঙ্গে এ সব কথা আলোচনা করতে হবে, কোনও দিন ভাবিনি। বলেছিলাম, "তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, তা হলে এই প্রেগনেন্সি কি মিথ্যে ?"

—হতেও পারে। ঋষি বলেছিল, "ওকে আমি বছর খানেক দেখছি। মাঝেমধ্যে ও ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডে চলে যায়। তখন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। কোনও কিছু ভেবে-টেবে বলে না। নিজেও জানে না, কী বলছে। আপনার মুখে ওর এই প্রেগনেন্সি সম্পর্কে অন্য কথা শুনে এখন আমার মনে হচ্ছে, একটা হোক্স। ও চাইছে, ওকে নিয়ে সবাই আপনারা ভাবুন। ব্যস্ত হয়ে উঠুন। আমি সাইকোলজির ছাত্র ছিলাম। বুবুনদা, দেখবেন, ও গুল মেরেছে।"

তা হয় নাকি ? ঋষির কথা বিশ্বাস হয়নি। একটা মেয়ে কখনও মিথ্যে অপবাদ নিতে পারে এ ভাবে ? ধরা পড়ার ভয় নেই ? গুল মেরে কতদিন জ্বালাবে ? তাই বলেছিলাম, "তোমার ধারণাটা সত্যি নয় ঋষি। তিতলির পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব। হয়তো এমন একজনের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা আছে, তোমরা কেউ জানো না।"

—মনে হয় না। আমার ধারণা, এটা পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। ওকে একজন ভাল সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।

কথাটা মন্দ বলেনি ঋষি। কথাটা মনে পড়তেই, সেবা-র ডাক্তার ব্যানার্জির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। তিতলিকে ওর কাছেই নিয়ে যেতে হবে। ভদ্রলোককে মাত্র একবার দেখেছি। ভাল লেগেছে। খুব অভিজ্ঞ।

তিতলির মুখটা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল। কাল রাতে অনেক তর্কাতর্কির পর ও ইউরিন দিতে রাজি হয়েছিল। আজ সকালে সেটা প্যাকেটে মুড়ে, বাড়ির কাছে একটা প্যাথলজিক্যাল ল্যাব-এ পাঠিয়েছি বাবলুকে দিয়ে। এখন যাওয়ার সময় রিপোর্টটা নিয়ে যাব। আগে জানা দরকার, প্রেগনেন্সি কতদিনের। চন্দনাদিকে ও একরকম কথা বলেছে, কাকিমাকে অন্যরকম। ওর কোনও কথাই বিশ্বাস করা যায় না। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর, আমরা ঠিক করব, তিতলিকে নিয়ে কী করা হবে। ওর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। যত চিন্তা অন্যদের। কাকাবাবু এত খেপে আছেন, মারধর করতে চাইছিলেন। আমি ঠেকিয়েছি। তাতে আরও পাঁচকান হবে। এ সব ব্যাপার যত কম লোকে জানে, তত ভাল। বাড়িতে মাকেও কিছু বলিনি।

বিডন স্ট্রিটে ঢোকার মুখেই প্যাথলজিক্যাল ল্যাব। গাড়ি থামালাম। বাবার অসুখের সময় প্রায়ই আসতে হত এখানে। ডাক্তারবাবু আমার পরিচিত। রিপোর্ট নেওয়ার জন্য কখনও আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হয়নি। আজ আমার আসার কথা বেলা একটায়। আধ ঘণ্টা দেরি করে ফেলেছি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সরাসরি চেম্বারে ঢুকতেই ডাক্তারবাবু বললেন, "আসুন ঋচীকবাবু, আপনার জন্যই এতক্ষণ বসে

আছি।"

—সরি, আপনার দেরি করিয়ে দিলাম।

—ডাসন্ট ম্যাটার। এই নিন আপনার রিপোর্ট। আনিয়ে রেখেছি।

—দেখেছেন ?

—হ্যাঁ। কে হয় আপনার ?

—আত্মীয়ের মতোই। পাশের বাড়িতে থাকে। বলার সময় বুকটা একবার ধক করে উঠল। ডাক্তারবাবু কী শোনাবেন, কে জানে ?

—প্রেগনেন্সির কোনও লক্ষণ নেই ইউরিনে।

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম, "কী বলছেন আপনি ?"

—এত অবাক হচ্ছেন কেন ঋচীকবাবু ?

—আপনারা কি ঠিক মতো টেস্ট করেছেন ডাক্তারবাবু ?

—সার্টেনলি। যে ইউরিন স্যাম্পেল দিয়েছেন, তাতে এই ভদ্রমহিলা প্রেগনেন্ট হননি।

—উফ্, বাঁচালেন।

—কেন, আপনারা কি প্রেগনেন্সি চাননি ?

—না ডাক্তারবাবু। মেয়েটা আনম্যারেড।

—আই সি।

রিপোর্টটা নিয়ে উঠে পড়লাম। এখুনি গিয়ে খবরটা দিতে হবে চন্দনাদিদের। কাল থেকে ওরা লোক লজ্জার ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন। কাকাবাবু চট করে ভেঙে পড়ার মানুষ না। জীবনে অনেক ঝড় ঝাপটা সামলেছেন। কিন্তু তিতলির এই খবর শুনে একবার আমাকে বলেও ফেললেন, "মেয়েটার জন্য হয়তো আমাকে বহরমপুরেই ফিরে যেতে হবে।" এখন দেখছি, ঋষিই ঠিক। তিতলি মিথ্যে কথা বলেছে। ওর কি কোনও লজ্জা-টজ্জা নেই ? কোনও সুস্থ মেয়ে নিজের সম্পর্কে এ রকম একটা কথা কখনও রটাতে পারে ? অদ্ভুত।

ঋষি ছেলেটা ঠিকই বলেছিল, আমাদের উদ্বেগে রেখে এক ধরনের আনন্দ পায় তিতলি। ওরা সমবয়সী। আড্ডা মারে কাজের ফাঁকে। ঋষির পক্ষে এটা আন্দাজ করা সম্ভব। তিতলিকে বুঝতে হলে, ওর লেভেলে নেমে আসতে হবে। আমাদের পক্ষে তা সম্ভব না। চব্বিশটা ঘণ্টা ফালতু নষ্ট হয়ে গেল। আজ সকালে একবার সাইট-এ যাওয়ার কথা বলেছিল সুমিতাভ। যেতে পারলাম না। না-যেতে পারার কারণটাও ওকে বলা যাবে না। তিতলির উপর তো বটেই, নিজের উপরও আমার রাগ হচ্ছে এখন। কাকাবাবুদের সঙ্গে আমাদের কোনও ব্লাড রিলেশন নেই। কেন ওদের জন্য আমার সময় নষ্ট করব ? একটা সময় আদর দিয়ে দিয়ে ওরা তিতলির মাথা খেয়েছেন। এখন বুঝুন।

বাড়ির ভেতর গাড়িটা ঢোকাবার পরই মনে হল, না, এখন ও বাড়িতে যাব না। আরও কিছু সময় ওরা দুশ্চিন্তায় থাকুক। কাকাবাবু অবশ্য বাড়িতে নেই। দায়িত্বটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, উনি নিশ্চিন্তে হাইকোর্ট গেছেন। ও বাড়িতে গিয়ে চন্দনাদির পাল্লায় পড়লে, বেরোতে বেরোতে বেলা তিনটে বেজে যাবে। খবরটা শুনলে ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। হয়তো বলবে, "আমাদের এখানেই লাঞ্চ করে যা।

ভাই, কতদিন তোর সঙ্গে বসে খাওয়া হয়নি, বল।" ব্যস, তারপর আর উঠে আসা যাবে না। চন্দনাদির কথা আমি ফেলে দিতে পারি না। এমন ভালবাসে, না করা যায় না।

মা বসে খবরের কাগজ পড়ছে দোতলায়। এই সময়টায় রোদ্দুর আসে বারান্দায়। আমাকে তিনতলায় উঠতে দেখে, মুখ তুলে তাকাল। ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়েই বললাম, "মা, রুমকিকে রেডি হতে বলো। চট করে গায়ে জল ঢেলে আমি নেমে আসছি।"

মা হেসে বলল, "বেরুবি নাকি?"

—না। ও বাড়িতে যাব একবার। চন্দনাদি ডেকেছে।

—ওরা দু'বোন তো এতক্ষণ এখানেই ছিল। তোকে খুঁজছিল। ও বাড়িতে কি কিছু হয়েছে? চন্দনাকে দেখে মনে হল, খুব চিন্তায় রয়েছে।

মায়ের মন। ফাঁকি দেওয়া শক্ত। বললাম, "না মা, কিছু হয়নি। বিয়ের কেনাকাটা আছে। চন্দনাদি আমাকে নিয়ে বোধহয় বেরোবে। ওরা কখন চলে গেল?"

—এই মিনিট দশেক হল। দিদি ফোন করেছিল। আমি কথা বলছিলাম। বেরিয়ে এসে দেখি চন্দনা নেই।

তিনতলায় উঠে এলাম। ঘরে পা দিতেই চমক। দেখি, বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে বই পড়ছে তিতলি। পরনে পাতলা টি-শার্ট আর পা জামা। বাড়িতে ও এইরকম অদ্ভুত পোশাকে থাকে। বাড়ির ছোট মেয়ে বলে কেউ ওকে কিছু বলে না। কিন্তু কোনও দিন এ রকম ঢিলে-ঢালা পোশাকে আসেনি। বোঝাই যাচ্ছে, অন্তর্বাস পরেনি। ওর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ওর আহ্লাদে পোশাক দেখেই মাথায় রাগ চড়ে গেল। যে মেয়ে রাইট অ্যান্ড লেফট মিথ্যে কথা বলে, তার সঙ্গে ভদ্রতা করে লাভ নেই। ঋষির কথাগুলো মনে পড়তেই রাগ দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

আমাকে দেখে, বই বন্ধ করে উঠে বসল তিতলি। তারপর বলল, "বইটা দারুণ তো। তুমি কিনেছ? আমাকে পড়তে দেবে বুবুনদা?"

দূর থেকেই বুঝলাম, দ্য ইনভিজিবলস। হিজড়েদের নিয়ে লেখা সেই বইটা। এখনও শেষ করতে পারিনি। কাল রাতে দেবা আর তিতলির কথা ভেবে ঘুম আসছিল না। তখন বইটা খুলে বসেছিলাম। হয়তো টেবলে পড়েছিল। তিতলির চোখে পড়ে গেছে। হ্যাঁ-না কিছু বললাম না। মাথা গরম। হঠাৎ কী করে বসব জানি না। ঋষিকে ও বলেছে, প্রেগনেন্ট হওয়ার জন্য আমি দায়ী। মন অন্য দিকে সরানোর জন্য সোয়েটার আর জামা খুলে আলনায় ঝুলিয়ে দিলাম। বাথরুমে গিজার লাগানো আছে। চান করতে হবে ভাল করে। মাথা ঠাণ্ডা করা দরকার।

খালি গা। আমাকে দেখে তিতলি ফুট কাটল, "মাই মাই...বডিটা তো আর্নল্ড সোয়েৎজারের মতো। তোমার হাবভাবটা কেন ইনভিজিবলস টাইপের বুবুনদা?"

ক্রুদ্ধ চোখে তাকালাম ওর দিকে। আমাকে টিজ করছে। এটা ওর স্বভাব। এত রাগ হচ্ছে আমার, মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে তিতলি। ধীর পায়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর আমার চিবুক ধরে চুকচুক করে বলল, "রাগ হচ্ছে বুবুনবাবু। ছিঃ, রাগ করে না।"

ধমকে উঠলাম, "তিতলি। ভাগ এখান থেকে। যা।"

কোনও ভাবান্তর হল না। ও আরও কাছে এসে আমার শরীরের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে বলল, "কেন গো। আর কদ্দিন পর তো আমি তোমার ওয়াইফ হচ্ছি। এখন থেকেই একটু কনজুগাল লাইফের রিহার্সাল হয়ে যাক না।"

কী হল, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলাম ওকে। তারপর চাপা রাগে বললাম, "তুই, তুই খুব খারাপ হয়ে গেছিস।"

তিতলির চোখে বিস্ময়। ধাক্কাটা বোধহয় একটু জোরেই হয়ে গেছে। খাটের বাজু ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে ক্রুদ্ধ সাপিনীর মতো ফুঁসে উঠেও, ফের শান্ত হয়ে গেল ও। মুখে শয়তানি হাসি। বলল, "আমার বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হল, বুবুনবাবু ?"

—ঋষিকে তুই কী বলেছিস আমার সম্পর্কে ?"

খিলখিল করে হেসে উঠল তিতলি, "কী বলেছি, বলো তো ?"

উত্তর দিতে গিয়ে, কথাটা আটকে গেল মুখে। এ সব কথা সরাসরি বলা যায় ? বলতে পারছি না। আমার মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল।

—কী হল, বলো। হি হি হি। তুমি আমাকে প্রেগনেন্ট করেছ। যদি বলি করেছ, তুমি প্রমাণ করতে পারবে, করোনি ?

কথাটা শুনে ঠাস করে একটা চড় মারলাম। উফ্ করে তিতলি ছিটকে পড়ল সোফায়। ও বিশ্বাস করতে পারছে না, ওকে আমি চড় মারতে পারি। গালে হাত দিয়ে মিনিট খানেক ও চোখ বন্ধ করে রইল। বোধহয় প্রচণ্ড লেগেছে। ব্যথা সইয়ে নিচ্ছে। তারপর হঠাৎই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার গায়ে।

—আমাকে তুমি মারলে ? শয়তান...ইতর কোথাকার।

তিতলির হাতে বড় বড় নখ। আমার পিঠে খামচে ধরেছে। শরীর দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে আমাকে খাটের ধারে নিয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলায় ওর এই পাগলামি অনেক সহ্য করেছি। ওর অনাবশ্যক জেদ অনেক প্রশ্রয় দিয়েছি। নখের আঁচড়ে পিঠটা বোধহয় রক্তাক্ত হয়ে গেল। আর সহ্য করতে না পেরে ওর একটা হাত মুচড়ে ধরলাম।

তিতলির চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে। চুল কপালে লেপ্টে রয়েছে। ওর যন্ত্রণাকাতর মুখটা দেখতে দেখতে বললাম, "তুই নোংরা হয়ে গেছিস। তিতলি, তুই খুব খারাপ হয়ে গেছিস।"

মুখে কোনও আওয়াজ নেই। হাঁফাতে হাঁফাতে ও বলল, "বেশ করেছি। সান অফ আ বিচ।"

হাত ছেড়ে দিয়ে ফের ওকে চড় মারলাম। বিছানার উপর আছড়ে পড়ল তিতলি। মা তুলে গালাগাল দিচ্ছে। ওকে ছাড়া যায় না। রাগে অন্য কিছু আমার মাথায় নেই। ঘাড় ঘুরিয়ে অবাধ্যের মতো ও ফের গালাগাল দিতেই আমি এক হাতে ওর কাঁধ ধরে ফের চড় মারলাম।

ভেবেছিলাম, ও পাল্টা ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। তা কিন্তু করল না। দু' হাঁটু জোড়া করে, শিৎকার করে উঠল। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোয়াল শক্ত করে রয়েছে। চোখ বোজা। মনে হল, তিতলি...শরীরের ভেতরে কী যেন একটা অনুভব করছে। কয়েক সেকেন্ড ও ওই ভাবে পড়ে রইল। তারপর পা

দুটো আলগা করে দিল। ওর চোখ-মুখ শান্ত হয়ে এসেছে। চোখ খুলেই ও খুব সুন্দর করে হাসল। তারপর উঠে বসে, চুলের গোছ সামলে নিয়ে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ বুবুনদা।"

মেয়েদের বোঝা ভার। তিতলি উঠে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ, হঠাৎই যেন ওকে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। আমার কাছে এসে ও বলল, "একটা কথা বলব বুবুনদা, কাউকে বলবে না বলো।"

ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না। চুপ করে তাকিয়ে রইলাম।

তিতলি বলল, "যে ইউরিনটা তোমরা টেস্ট করতে দিয়েছ, সেটা আমার নয়। বিভার। আমাদের কাজের মেয়েটার।"

বলেই দু'হাতে আমার মুখটা টেনে ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলল, "ইউ আর রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল বুবুনদা।"

॥ সাত ॥

সোফায় বসে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছি। হঠাৎ রুমকি এসে বলল, "দাদাবাবু, একটা লোক তোমায় ডাকচে।"

বেলা এগারোটা বাজে। আজ এই সময় কারও আসার কথা নেই! কে এল আবার? বললাম, "উপরে নিয়ে আসতে হবে না। বাইরের ঘরে বসা। আমি আসছি।"

—তুমি এখনও জলখাবার খাওনি?

—কখন দিয়েছিস?

—সে অনেকক্ষণ। তুমি কী গো দাদাবাবু।

—এই খাচ্ছি। লোকটাকে বসতে বল।

টেবলের উপর ঢাকা দেওয়া রয়েছে খাবার। চোখে পড়েনি। কাগজে আজকাল এত অদ্ভুত সব খবর বেরোয়, অবাক লাগে। একটু আগে আনন্দবাজারে এমন একটা খবর পড়লাম, গা ঘিনঘিন করছে। কোন্নগরে একজন স্কুল টিচার শ্মশানে বসে আধপোড়া শবদেহ খুবলে খেয়েছেন। বিশ্বাস করা কঠিন। তান্ত্রিকরা অবশ্য শবসাধনা করেন। কিন্তু শবদেহ ভক্ষণ! আগে কখনও শুনিনি। উন্মাদ না হলে এ কাজ কেউ করে? ভদ্রলোক নাকি পরদিন নির্লিপ্তভাবে স্কুলে গিয়ে ছাত্র পড়িয়েছেন। জেলার পাতায় আরও অদ্ভুত একটা খবর রয়েছে, কিশোরী ভাইঝিকে ধর্ষণ করে কাকা উধাও। এই লোকটাও তো তাহলে মানসিক রোগী। নর্মাল লোক কখনও এ কাজ করবে?

জলখাবার খেয়ে মিনিট দশেক পর নীচে নেমে দেখি, আমারই বয়সী একটা ছেলে সোফায় বসে রয়েছে। চিনতে পারলাম না। বললাম, "কোত্থেকে এসেছেন?"

—আপনি ঋচীক মিত্র?

—হ্যাঁ।

—আমাকে ডাঃ ব্যানার্জি পাঠিয়েছেন। সেবা মেন্টাল হোম থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ঠাকুরপুকুরের ওই হাসপাতালটার কথা। জিজ্ঞাসা করলাম, "কী ব্যাপারে

বলুন তো ?"

—উনি একটা পার্সোনাল চিঠি দিয়েছেন আপনাকে। বলেই একটা খাম এগিয়ে দিল ছেলেটা। খুলে দেখি, মাত্র দু'টি লাইন লেখা। "সময় পেলে একবার আসবেন আমাদের এখানে ? জরুরি দরকার।"

চিঠিটা পড়ে বললাম, "আপনি কি সেবা-র সঙ্গে যুক্ত।"

—হ্যাঁ। আমি সাইকিক সোসাল ওয়ার্কার।

—সেটা কী ?

—আমরা মেন্টাল পেশেন্টদের চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য করি।

—কী ভাবে ?

—তা হলে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে। আপনার সময় আছে ?

—হ্যাঁ।

—একটা কেস-এর কথা বললেই বুঝতে পারবেন, আমাদের রোলটা কী। মাস ছয়েক আগে একজন মেন্টাল পেশেন্ট এলেন আমাদের ওখানে, নাম গোবিন্দ ঘোষ। ছোট একটা মিষ্টি দোকানের মালিক। সঙ্গে ওর স্ত্রী ছিলেন। তিনি বললেন, সবসময় ভদ্রলোক আতঙ্কে ভোগেন। এই বোধহয় কেউ খুন করতে আসবে। দোকানে বসতে চান না। ব্যবসা গুটিয়ে যাওয়ার মুখে।

—তারপর ?

—প্রতিমাদিকে তো দেখেছেন আপনি। আমাদের সাইকোলজিস্ট। উনি কাউন্সেলিং করে করে জানতে পারলেন, পাড়ার মস্তানরা দোকানে এসে ধারে মিষ্টি খেয়ে যেত। টাকা চাইলে শাসাত। একদিন বলল, খুন করে ফেলবে। ব্যস, তারপর থেকে গোবিন্দ ঘোষ অসুস্থ। দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকেন। ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলেন। কিন্তু ভয় আর যায় না।

—তারপর কী হল ?

—ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, এবার তুমি দেখো। পাড়ায় গিয়ে মস্তানদের খোঁজ খবর নিয়ে এসো। আমি গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে এলাম। ও পাড়ায় আমার এক পরিচিত লোক থাকেন। খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। ওর কাছে গেলাম। সব শুনে উনি খুব সাহায্য করলেন। মস্তান ছেলেদের ডেকে, ধমকে দিয়ে বললেন, যাও এখুনি টাকা দিয়ে, গোবিন্দর কাছে ক্ষমা চেয়ে এসো। এইভাবে ভয় ভাঙাতে হল গোবিন্দর।

—উনি কি সুস্থ হয়ে গেছেন ?

—হ্যাঁ। আবার বসছেন দোকানে গিয়ে।

—বাঃ আপনাদের কাজটা তো বেশ ভাল।

—হ্যাঁ, করে খুব আনন্দ পাই। বাই প্রফেশন, আমি স্কুল টিচার। হঠাৎই সেবা-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছি। আমার এক কাকিমা মেন্টালি ইল হয়ে পড়েন। সেবায় দেখাতে নিয়ে যেতাম। কাকিমা কিছুদিন ভর্তিও ছিলেন ওখানে। তখন রোজ যাতায়াত করতাম। ডাক্তারবাবুর ট্রিটমেন্ট খুব ভাল। বসে বসে দেখতাম। আমার আগ্রহ দেখে, একদিন উনি কাজে লাগিয়ে দিলেন। স্কুল শেষ হওয়ার পর রোজ একবার ওখানে যাই।

—ডাক্তার ব্যানার্জি খুব এক্সপেরিয়েন্সড, না ?

—খুউব। একটা সময় ভিয়েনায় ছিলেন। নতুন ধরনের ট্রিটমেন্ট করেন। অ্যাকুয়ালি, মেন্টাল পেশেন্টদের সারানোর জন্য প্রচুর সময় দরকার। বেশিরভাগ সাইকিয়াট্রিস্ট সেই সময়টা দেন না। ডেপথে যেতে চান না। তাঁদের অত সময় নেই। আমাদের ডাক্তারবাবু অন্য রকম । অতটা প্রফেশনাল নন।

—আপনার নামটা কী ভাই ?

—সুজিত চন্দ।

বলেই উঠে পড়ল সুজিত। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আপনার টেলিফোনটা কি খারাপ ? আমি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছি। কেউ ধরছে না। বাধ্য হয়ে এখানে আসতে হল।"

—ঠিকানাটা পেলেন কী করে ?

—ভিজিটার্স বুকে আপনি লিখে এসেছিলেন সেদিন।

—ডাক্তার ব্যানার্জি কেন ডেকে পাঠিয়েছেন, জানেন কিছু ?

—মনে হয়, মুনমুন মিত্রের জন্য। আপনার সাহায্য চান উনি।

মুনমুনের নামটা শুনে একবার বুকের রক্ত চলকে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "কেমন আছে মেয়েটা ?"

—ভাল না।

—ঠিক আছে। ডাক্তার ব্যানার্জিকে বলবেন, আমি সময় পেলে যাব। কখন গেলে ওনাকে পাওয়া যাবে ?

—মঙ্গল আর শনিবার। সকাল দশটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত। আউটডোরে বসেন। এ ছাড়া রাতের দিকে রোজই একবার করে যান। টাইমের কোনও ঠিক নেই। আচ্ছা, আসি তা হলে। অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করে গেলাম।

—আরে না, না। অনেক কিছু জানতে পারলাম আপনার কাছ থেকে।

সুজিত উঠে বেরিয়ে যাওয়ার পরই ফের উপরে উঠে এলাম। আজ কোনও কাজকর্ম নেই। ইচ্ছে করেই রাখিনি। চন্দনাদিকে আশীর্বাদ করতে আসবেন আজ রঞ্জনদার বাবা-মা। কাকাবাবুদের বাড়িতে এখন লোকজনের ভিড়। মা সকাল বেলায় পুজো সেরে চলে গেছে। আমারও সকাল থেকে ও বাড়িতে থাকার কথা। কিন্তু ঠিক করেছি, দুপুরের দিকে একবার গিয়ে, খেয়ে-দেয়ে চলে আসব। সেদিন তিতলির গায়ে হাত তোলার পর, আর ও বাড়িতে যাইনি। তিতলির মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

পরে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। তিতলির গায়ে হাত তোলা আমার উচিত হয়নি। মার খাওয়ার পর হঠাৎ ও বদলে গেল কেন, সেটা আমার কাছে এখনও রহস্য। মেয়েদের মন বোঝা সত্যিই কঠিন। ওর চোখ-মুখে এক ধরনের সুখানুভূতির চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলাম। মার খেয়ে কেউ এমন হয় ? সব থেকে অবাক হয়েছি, আমাকে চুমু খেতে দেখে। ওর কি কোনও লজ্জা নেই ? জীবনে কোনও দিন এই অভিজ্ঞতাটা হয়নি। সত্যি বলতে কী, পরে যতবার এই চুমুর কথা মনে পড়ছে, ততবারই ভাল লাগছে। জোর করে মন থেকে সেই ভাবনাটা সরাচ্ছি। আর যাই হোক, তিতলিকে আমি অন্তত বিয়ে করছি না। কাকাবাবু চাইলেও না। ছোটবেলা

থেকে ওকে সে চোখে দেখিনি। ও যদি কিছু ভেবে নিয়ে থাকে, তা হলে ভুল ভাবছে।

আধ ঘন্টা আগে জলখাবার খেয়েছি। বেলা দু'টোর আগে ও বাড়িতে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। হাতে ঘন্টা দু'য়েক সময় আছে। টি ভি দেখে সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। কেব্‌ল লাইনে সাঁইত্রিশটা চ্যানেল। খেলা দেখার জন্যই কেব্‌ল লাইন নিয়েছিলাম। এখন খেলা দেখার সময় পাই না। মা বাংলা সিরিয়াল খুব দেখে। তাই টি ভি এখন মায়ের ঘরে। বেলা একটায় রোজ রুমকিই মনে করিয়ে দেয়, "দিদা, সীমারেখা দেখবে না ?" দু'জনে তখন টি ভি-র সামনে বসে যায়। তোলা যায় না। বোকা বোকা সব সিরিয়াল। আমার হাসি পায়।

দোতলায় ওঠার পরই কী মনে হল, মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। চোখে পড়ল, আলমারিতে চাবি লাগানো রয়েছে। মা বোধহয় শাড়ি বের করার পর, চাবি খুলে নিতে ভুলে গেছে। বাড়িতে অবশ্য মায়ের আলমারিতে হাত দেওয়ার কেউ নেই। রুমকি আছে। খুব বিশ্বাসী। টাকা-পয়সা পড়ে থাকলেও ফিরে তাকায় না। আলমারি থেকে চাবি বের করে, সেটা মায়ের বালিশের তলায় গুঁজে রাখলাম।

দরজার সামনে পায়ের শব্দ। ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখি রুমকি । চোখ-মুখে সংকোচ। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু বলবি ?"

একটু ইতস্তত করে ও বলল, "দাদাবাবু, বাবলুদা...." বলেই থেমে গেল রুমকি।

—বাবলুদা কী রে ?

—গোয়াবাগানের ছেলেরা বাবলুদাকে পেলে মারবে।

—কেন ?

—দিদির ব্যাপারটা নিয়ে ও পাড়ায় গিয়ে রোয়াবি মেরেছিল। জামাইবাবু পাড়ার ছেলেদের নিয়ে ঘোঁট পাকিয়েছে। পাড়ার ছেলেরা খচে আছে।

—চুমকি কি এখনও তোদের বাড়িতে আছে ? গোয়াবাগান যায়নি ?

—না, শ্বউরবাড়ি যায়নি। তুমি বাবলুদাকে বলো, দিদির সঙ্গে যেন মেলামেশা না করে। মা বলছে, বাবলুদাই ঘর ভাঙিয়েছে দিদির।

—বাবলু আছে নীচে ?

—না। ও বাড়ির মিষ্টি আনতে গেছে। কী দরকার বাবা তোর ঝুট ঝামেলায় যাবার ?

রুমকির মুখটা দেখে একটা সন্দেহ হল। আমাদের অকছয়কুমারের প্রেমে পড়ে গেল নাকি মেয়েটা ? চুমকির তুলনায় এই মেয়েটা অনেক সভ্যভব্য। মা-ই বলে। পড়াশুনা করেছে ক্লাস ফোর পর্যন্ত। পরনে মায়ের পুরনো শাড়ি। বস্তির মেয়ে বলে মনে হয় না। মনে মনে হেসে বললাম, "ঠিক আছে, বাবলুকে ধমকে দেব। তোদের বাড়িতে যেন আর না যায়। তা তুই এখনও চন্দনাদিদের বাড়ি যাসনি কেন ?

—এইবার যাব।

রুমকি চলে যেতেই মায়ের বিছানায় টানটান হলাম। হাতের কাছে বই থাকলে পড়া যেত। হঠাৎই মনে পড়ল, বাবার আলমারিতে কিছু বই আছে। খুব কিনতেন এক সময় বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পাবলিশ করা বই। আগে পড়তে খুব মজা লাগত। অনেকদিন বইগুলো কেউ নাড়াচাড়া করেনি। কথাটা মনে হতেই, উঠে

গিয়ে আলমারিটা খুললাম। হঠাৎই একটা চটি বই চোখে পড়ল। 'মানসিক রোগে মেসমেরিজম ও হোমিওপ্যাথি।'

মাই গড, মানসিক রোগ নিয়ে তখনকার দিনেও বই বেরিয়েছিল! বইটা হাতে নিয়ে, বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে পড়তে লাগলাম। প্রথম চ্যাপ্টার মানুষের মনোরাজ্য। ইন্টারেস্টিং।

'একাদশ ইন্দ্রিয়ের সমবায়ে মনুষ্য-শরীর গঠিত, ইহাই শাস্ত্রকারগণের মত। উহাদের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা ইত্যাদি পাঁচটি হইতেছে জ্ঞানেন্দ্রিয় (অর্থাৎ ইহাদের সাহায্যে মন বাহিরের কোনও অবস্থা জানিতে বা বুঝিতে পারে)। আর মুখ, হাত, পা, জননেন্দ্রিয়, পায়ু, ইত্যাদি পাঁচটি হইতেছে 'কর্মেন্দ্রিয়,' (অর্থাৎ ইহাদের সাহায্যে মন দেহ-রাজ্যের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মাদি সম্পাদন করাইয়া লয়)।

তৎপর মনু সংহিতায় বলা হইয়াছে—"একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেন উভয়াত্মকম। যস্মিন জিতে জিতৌ উভৌ ভবতঃ ইন্দ্রিয়গণে।" অর্থাৎ মন হইতেছে একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং ইহার নিজস্ব গুণে ইহা উভয়াত্মক, অর্থাৎ ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়—দুই-ই। এবং এই মনের উপর অধিকার জন্মিলে দেহী তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয় শ্রেণীকেই স্বেচ্ছায় পরিচালিত করিতে পারে।

'অন্য কথায় সোজা করিয়া বলিতে হইলে মনই হইতেছে সমগ্র দেহ রাজ্যের অধিনায়ক। ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে বাহিরের অবস্থা বুঝিতে পারে এবং দেহরক্ষার সুরক্ষার্থে নিজ বিবেচনা মতো কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে নির্দেশ দিয়া আবার যথোচিত কাজকর্ম করাইয়া লয়। বাকি দশটি ইন্দ্রিয়ের মতো মন কোনও স্থূল প্রত্যঙ্গ নহে, ইহা একটা সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অবস্থা মাত্র। তথাপি ইহা শরীরের স্থূল ইন্দ্রিয়াদির বিকলতা হেতু নিজেও রুগ্ন হইতে পারে, কিন্তু ওই কেবলমাত্র অনুভূত হয়, চোখে দেখা যায় না।

'এই মন যাহার সুস্থ ও সবল থাকে, তাহার দেহও সুস্থ এবং কর্মঠ থাকিতে বাধ্য। মন বিকল হইলে সমগ্র নর-দেহই ব্যাধিগ্রস্ত হইতে বাধ্য। মনে যদি কোনও ভুল ধারণা জন্মিয়া যায়, তবে উহার ভুল নির্দ্দেশে মনুষ্য শরীর বিপন্ন হয়। উহার যে কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রুগ্ন হইয়া পড়ে। এমনকী, মানুষ নিজেকে নিজে হত্যা করিয়া অপমৃত্যু ঘটায়।'

প্যারাগ্রাফটা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। 'মনে যদি কোনও ভুল ধারণা জন্মিয়া যায়, তবে উহার ভুল নির্দ্দেশে মনুষ্য শরীর বিপন্ন হয়।' এই লাইনটায় চোখ আটকে গেল। ভদ্রলোক তো ঠিকই লিখেছেন। ভুল ধারণা থেকেই যাবতীয় সমস্যা। মানসিক বৈকল্য। এই যে দেবা, বউ আর মেয়েকে খুন করে নিজে সুইসাইড করল, এটাও তো একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে, মিতুনকে সুস্থ করে তুলতে পারবে না। সুস্থ করে তোলার মতো আর্থিক সঙ্গতি ওর নেই। মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ও ব্যাঙ্ক জালিয়াতিতে জড়িয়ে পড়ল।

আর মুন? ওর মনেও একটা ভুল ধারণা জন্মেছে। কালো কোট পরা একটা ছেলেকে ভয় পাচ্ছে। ভয় থেকে অনিদ্রা, উদ্বেগ, জীবন সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে যাওয়া, বিষাদ। শেষ পর্যন্ত আত্মহননের চেষ্টা। অথচ ওর বয়সী কত মেয়ে স্বভাবিক জীবন-যাপন করছে।

নির্জন ঘরে শুয়ে থাকতে থাকতে আশপাশের আরও কিছু চরিত্র আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল। ঋষির বাবা, চুমকির বর, বড়মাসি, চন্দনাদি, তিতলি, সন্ধ্যা এমনকী বাবলুও। ঋষির বাবার মনে একটা ভুল ধারণা জন্মে গিয়েছে, সৎপথে থেকে জীবনে উনি কিছুই করতে পারলেন না। চুমকির বর ভাবছে, সেক্স লাইফে কোনও দিন সুখী হবে না। বড়মাসি আতঙ্কে রয়েছে, পুলুদার ওপর দাবি আর খাটাতে পারবে না। যে ছেলেকে নিজের করে মানুষ করেছে, সে এখন অন্য একটা মেয়ের দখলে চলে যাচ্ছে। চন্দনাদির সন্দেহ, রঞ্জনদা অন্য মেয়ের প্রতি আসক্ত। তিতলির আক্রোশ, কাকাবাবুর ওপর। নিশ্চয়ই এর কোনও কারণ আছে। আর বাবলু নিজেকে অকছয়কুমার ভাবছে। সিনেমার পর্দায় দেখা অকছয়কুমারের বীরত্ব ও দেখাতে যাচ্ছে নিজের জীবনেও। এরা কেউই বোধহয় মানসিকভাবে সুস্থ নয়। হঠাৎ মনে হল, কোনও মানুষই কি মনের দিক থেকে পরিপূর্ণ সুস্থ ? এই হাইটেকের যুগে মানুষের পক্ষে সুস্থ থাকা সম্ভব ?

চারপাশে অসুস্থ একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। ছুটতে হবে, জীবনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তোমাকে সবার আগে ছুটতে হবে। আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে একটা নার্সারি স্কুল হয়েছে। যাতায়াতের পথে বাচ্চাদের চোখে পড়ে। মায়েরা অনেকে স্কুলে পৌঁছে দেয়। স্কুল শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। মায়েদের টুকরো আলোচনা কখনও কানে আসে। সবাই চায়, তার ছেলে ফার্স্ট হোক। চার-পাঁচ বছরের বাচ্চাগুলোর জন্য আমার কষ্ট হয়। বইটা পড়ে এখন হঠাৎই মনে হচ্ছে, বাচ্চা বয়স থেকে এই ছেলে-মেয়েদের মনে একটা ভুল ধারণা গেঁথে দেওয়া হচ্ছে—তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে। কেউ হবে, কেউ হবে না। যারা হবে না, জীবন সম্পর্কে নিশ্চয়ই তারা হতাশ হয়ে পড়বে। একটার পর একটা ভুল করে যাবে।

চান-টান করে আধ ঘণ্টা পর তিতলির বাড়িতে যখন গেলাম, তখন আশীর্বাদের পালা চলছে। রঞ্জনদার বাবা, কাকারা একে একে ধান-দুর্বো দিয়ে আশীর্বাদ করছেন চন্দনাদিকে। ঘরের মধ্যে কুড়ি-পঁচিশ জনের ভিড়। অধিকাংশই মহিলা। অনেককে চিনি না। উঁকি দিয়ে চন্দনাদিকে একবার দেখার চেষ্টা করলাম। সুন্দর লাগছে। এই চন্দনাদির সঙ্গে, রিসার্চ স্কলার চন্দনাদির কোনও মিল নেই। বিয়ের সময় বোধহয় মেয়েদের চেহারা বদলে যায়।

ভিড়ের মাঝে হঠাৎই চোখে পড়ল তিতলিকে। মাই গড, চেনা যাচ্ছে না। একটা পিঙ্ক কালারের জামদানি শাড়ি পরেছে। সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ। চুলে খোপা, নাকে নাকছাবি। সিঁথিতে টিকলি। ওকে আর এখন তরুণী বলে মনে হচ্ছে না। এক লাফে যেন যুবতী হয়ে গেছে। আগে কখনও শাড়ি পরতে ওকে দেখিনি। শাড়ির কথা তুললে বলত, ন্যাস্টি। আজ মা-কাকিমাদের সঙ্গে উলু দিচ্ছে। শিখল কোথায় ? ওর চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করছে খুশিতে। হঠাৎই হাসতে হাসতে ও পাশ ফিরল। আমার দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

ওর বদমাইশির শেষ নেই। পাছে কিছু ভেবে বসে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কতক্ষণ এ সব চলবে, জানি না। কাকাবাবুর বাড়িতে প্রথম অনুষ্ঠান। বেশ ঘটা করেই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছেন। কাকাবাবুদের আত্মীয়স্বজন প্রচুর। মিলমিশ আছে। আমাদের মতো নয়। আমাদের বাড়িতে কিছু

হলে, হয়তো কাকারা আসবেও না।

একতলায় কাকাবাবুর চেম্বারটা এখন ফাঁকা। কারও আসার চান্স নেই। ওই ঘরে ঢুকে সিগারেট ধরালাম। আর ক'দিন পর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে চন্দনাদি। থাকবে গিয়ে রঞ্জনদাদের বালিগঞ্জ প্লেসে একেবারে এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে। দেখাসাক্ষাৎ হবে কম। চন্দনাদি পর হয়ে যাবে। কেমন অদ্ভুত, না। এত লেখা-পড়া শিখিয়ে কাকাবাবু যে মেয়েকে মানুষ করে তুলল, তাঁকে এখন অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছে। এই বাড়িতে এখন থেকে রাজত্ব করবে শুধু তিতলি।

—এটা খাও।

পাশ ফিরে দেখি, তিতলি। ওর হাতে একটা ট্রে। তাতে সরবতের গ্লাস। এ বাড়ির দস্তুর, সরবত খাওয়ানো। তিতলির দিকে সন্দেহের চোখে তাকালাম। নুন মিশিয়ে আনেনি তো ? ও সব পারে।

—কী হল, তাকিয়ে আছ ? নাও।

বললাম, "আমার জল তেষ্টা পাচ্ছে না।"

তিতলির পাশে এসে দাঁড়াল একটা মেয়ে। ওরই সমবয়সী। বলল, 'হ্যাঁ রে, এই তোদের বুবুনদা।"

তিতলি মিষ্টি করে হাসল। তার পর পরিচয় করিয়ে দিল, "এ হল রঞ্জনদার পিসতুতো বোন ঝিমলি। তোমাকে দেখার জন্য পাগল হয়ে ছিল।"

—কেন ?

ঝিমলি বলল "তিতলির কাছে আপনার সম্পর্কে এত কথা শুনেছি, দেখার খুব ইচ্ছে ছিল।"

শুনেই সতর্ক হয়ে গেলাম। তিতলি কী বলেছে কে জানে ? বানিয়ে বলার জুড়ি নেই ওর। হয়তো বলেছে, ওর প্রেমে আমি পাগল। ঝিমলি যা-ই শুনে থাকুক, ওর ধারণা ভেঙে দেওয়া দরকার। ঋষির কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রাগ উঠে গেল। সরবতের গ্লাসটা তিতলি এগিয়ে ধরেছে। সেটা হাতে নিয়ে, জানলা দিয়ে ফেলে দিলাম।

তিতলির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখের কোণে জল। ঝিমলিও একটু অবাক। একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। তার পর তিতলির দিকে। প্রাণপণে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে তিতলি। এ সব অভিনয়। দু'হাতে মুখ ঢাকল ও। তারপর এক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঝিমলিও পা বাড়িয়েছে। যাবার আগে মুখ ফিরিয়ে বলল, "এটা আপনি কী করলেন বুবুনদা। খুব অন্যায় কিন্তু।"

আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার কি কোনও ভুল হল বোঝার ? এমনও হতে পারে, তিতলির কোনও দুষ্টবুদ্ধি ছিল না। আমার সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ করতে চাইছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাবার সেই বইয়ের একটা লাইন মনে পড়ল, "মনে যদি কোনও ভুল ধারণা জন্মিয়া যায়, তাহা হইলে উহার ভুল নির্দেশে মনুষ্যশরীর বিপন্ন হয়।" আমি কি তা হলে ভুল ধারণা করলাম ? সিগারেটটা নিভিয়ে দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় উঠে গেলাম। আমি জানি, তিতলি এখন কোথায় যেতে পারে।

দরজায় পর্দা ফেলা। বিছানায় উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে তিতলি। বিছানায় বসে ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ঝিমলি। পর্দার পাশেই দাঁড়িয়ে শুনলাম তিতলি বলল,

"ওকে আমি এত ভালবাসি, অথচ ও কেন আমাকে ভালবাসবে না ?"

এ কী বলছে তিতলি ! ওর ধারণাটা ভেঙে দেওয়া দরকার। ঘরে ঢুকে আমি বললাম, "ঝিমলি একটু বাইরে যাবে ? তিতলির সঙ্গে একা একটু কথা বলতে চাই।"

॥ আট ॥

সেবায় ডাক্তার ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে আছি। অথচ ডাক্তার ব্যানার্জি বা প্রতিমাদি— কারও পাত্তা নেই। বেলা সাড়ে দশটা বাজে। আউটডোরের রোগীরা সব বাইরে বসে। ঢোকার সময় লক্ষ করেছি, একটা চেয়ারও খালি নেই। এই রোগটা কি বেড়ে গেছে ? এই রকম ছোট্ট হাসপাতালে যদি এত ভিড় হয়, তা হলে অন্য জায়গায় তো অবস্থা আরও খারাপ। পাপিয়া বলে মেয়েটা একটু আগে ঘরে ঢুকে, আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে গেল। এক সময় নিজেও নাকি পেশেন্ট ছিল। সেরে উঠেছে। এখন ডাক্তার ব্যানার্জিকে সাহায্য করে। না, এ জন্য কোনও মাইনে পায় না। বলল, ভাল লাগে বলে করে। সুজিতের মতো।

সুজিত সেদিন আমার বাড়িতে যাওয়ার পর, মাঝে দিন পাঁচেক কেটে গেছে। আসার সময় পাইনি। আজ সকালে ইস্টার্ন বাইপাসের প্রোজেক্টে গেছিলাম। তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে গেল। তাই সেবায় এসেছি। জানি না, ঠিক কী ব্যাপারে ডাক্তার ব্যানার্জি কথা বলতে চান। মুন সম্পর্কে অবশ্যই। মুন আমার কেউ হয় না। রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই আমার সঙ্গে। তবু আজ ছুটে এসেছি। কেন না, কাল রাতে ওকে নিয়ে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।

ভোর রাতে স্বপ্নে দেখলাম, তিতলির সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। দাদা আর লিন্ডা বউদি এসে গেছে জুরিখ থেকে। কমলামাসি, বুটু, পুলুদা, সবাই আমাদের বাড়িতে। প্যান্ডেল বাঁধার কাজ চলছে। লিন্ডা বউদি আমার সঙ্গে উঠতে-বসতে ইয়ার্কি মারছে। বিউটি পার্লারে গিয়ে সোনালি চুল কালো করে এসেছে, দারুণ লাগছে লিন্ডা বউদিকে। মাঝে বুটু গিয়েছিল তিতলিদের বাড়ি। ফিরে এসে খবর দিল, "ছোড়দা, সত্যিই তোর ভাগ্যটা ভাল রে। এমন একটা বউ পাচ্ছিস, একেবারে চৌখস।" এমন সময় মা উঠে এল আমার ঘরে। মায়ের আঁচল মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। হাঁফাতে হাঁফাতে মা বলল, "বুবুন, তুই এ কী সর্বনাশ করেছিস ?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী করেছি মা ?"

মা বলল, "নীচে একটা মেয়ে এসে বলছে, তুই নাকি ওকে বিয়ে করেছিস ?"

শুনে আমি কোনও কথা বলতে পারলাম না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মা বলল, "তুই সত্যি কথা বল বাবা। মেয়েটাকে কি সত্যিই তুই বিয়ে করেছিস ?"

কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখি, ছাদের দিকের দরজায় মুন। ওর কোলে ফুটফুটে একটা বাচ্চা। ঘরে ঢুকে ও বলল, "ঋচীক, এই নাও তোমার বাচ্চা। আমি চললাম।"

মুন সত্যি সত্যিই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কোথায় গেল, তা দেখার জন্য আমি ছাদে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ দেখি, কার্নিশের সামনে দাঁড়িয়ে মানুদার বউ। গায়ে শুধু মাত্র একটা গামছা। আমায় দেখে হেসে বলল, "বুবুন, বেশ হয়েছে। বেশ

হয়েছে।"

ফের ঘরে ঢুকে দেখি, মা মেঝেয় পড়ে আছে। জ্ঞান নেই। আমি তখন মা বলে চিৎকার করে উঠলাম। কমলামাসি সেই চিৎকার শুনে উঠে এসে বলল, "বুবুন, মাকে তুই এমন কষ্ট দিলি?" আমি কেঁদে ফেললাম। আর তখনই আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

স্বপ্নের কি কোনও মানে আছে? কোথায় যেন পড়েছি, অবচেতন মনে লোকে যা ভাবে, সেটাই স্বপ্নে দেখে। মা খুব বলে, ভোর রাতের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। তিতলিকে নিয়ে তো আমি কোনও দিন ভাবি না। তা হলে ও আমার অবচেতন মনে থাকবে কী করে? ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর, সেদিন অনেক কথা ভেবেছি। মুনের কোলে ওই বাচ্চাটাই আমাকে অবাক করেছে। আর মানুদার বউ। উনি শুধু গামছা পরে কেন? স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয়? যদি হয়, তা হলে মায়ের কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

মুনের কথা মা শুনেছে। আমি বলার আগেই, ওর কথা মায়ের কাছে বলে দিয়েছে বাবলু। সুদীপা একদিন ফোন করেছিল। সেদিন সুদীপাও মায়ের কাছে মুনের গল্প করেছে। মা একদিন বলেছে, "মেয়েটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হয় রে বুবুন। এত অল্প বয়স। এর মধ্যেই মনের রোগ বাধিয়ে বসল।" আমি তখন গা করিনি। সত্যি বলতে কী, আমার হাতে মুনের সেই কামড়ের দাগটা এখনও মিলিয়ে যায়নি। তেল মাখতে গিয়ে কখনও সেই দাগটা চোখে পড়লে মুনের কথা মনে পড়ে।

আজ সকালেই ঠিক করেছিলাম, ডাক্তার ব্যানার্জিকে একবার জিজ্ঞাসা করব স্বপ্নটার কথা। উনি কী ভাববেন, কে জানে? তবু একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। অবচেতন মনে আমি কি মুনকে তা হলে চাইছি? হতে পারে। এই যে, মিনিট কুড়ি ধরে ডাক্তার ব্যানার্জির জন্য সেবায় বসে আছি, এটাও আশ্চর্যের। কারও জন্য বসে থাকা আমার ধাতে নেই। এখানে ঢুকে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। এ এক আলাদা জগৎ। উঠে যেতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। ভেতরের দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল পাপিয়া। ওর হাতে সরবতের গ্লাস। এগিয়ে দিয়ে বলল, "নিন খান। ফোন করেছিলাম। ডাক্তারবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। এলেন বলে।"

এ সব খাওয়ার অভ্যেস নেই। তবুও চুমুক দিলাম। সেদিন এই রকমই সরবতের গ্লাস এগিয়ে দিয়েছিল তিতলি। তার পর ... অনেক ঘটনা। পরিষ্কার মনে আছে। উপুড় হয়ে তিতলি কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতেই ও বলল, "ওকে আমি এত ভালবাসি। ও কেন আমাকে চায় না?" ঘরে ঢোকার আগে কথাটা আমি শুনে ফেলেছিলাম। ছোটবেলা থেকেই ও প্রবলেম চাইল্ড। ওকে নিয়ে আমি অন্তত কোনওদিন মাথা ঘামাইনি। ওর ওই কথাটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার থেকে বছর পাঁচেকের ছোট। ও যে আমাকে প্রেমিক হিসাবে দেখতে শুরু করেছে, কে জানে?

ঝিমলি বলে মেয়েটা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরই আমি ডাকলাম, "তিতলি ওঠ, কাঁদিস না।"

ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে একবার ও দেখল। তারপর ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর, "কেন, কেন তুমি আমাকে ইনসাল্ট করলে ঝিমলির সামনে, বলো।"

বলেই ও এলোপাতাড়ি হাত চালাতে শুরু করেছিল। নিজেকে বাঁচানোর জন্যই আমি ওর হাত ধরে ফেললাম। এই অবস্থায় ও কী করতে পারে, আমার একবার অভিজ্ঞতা হয়েছে। বাড়ি ভর্তি লোক। যে কেউ উপরের ঘরে উঠে আসতে পারে। তখন লজ্জার শেষ থাকবে না। বন্ধ করা দরকার। হাতটা ধরে মুচড়ে দিলাম। যন্ত্রণায় ওর মুখ কুঁচকে উঠল। উফ্ বলে ও বিছানায় বসে পড়ল। এরপরই খাটের বাজুতে ভর দিয়ে আচমকা একটা ধাক্কা মারল আমাকে। হাতটা ছাড়িয়ে নিল। কাঁধ থেকে ওর আঁচল সরে যেতেই স্তন দুটো দেখতে পেলাম। তিতলি আর ছোট নেই। তিতলির মুখে ফের শয়তানি হাসি। কয়েক সেকেন্ড আমাকে লক্ষ করে ও বুঝতে পারল, কী দেখে আমি অবাক হয়েছি। ব্লাউজের দুটো হুক ও ছিঁড়ে ফেলল। তারপর বলল, "ডাকব, ডাকব তোমার কাকাবাবু আর দিদিভাইকে। ডেকে বলব, তুমি আমাকে রেপ করতে চাইছিলে ?"

আমি ধমকে উঠলাম, "তিতলি, তুই এত নোংরা হয়ে গেছিস ?"

—হ্যাঁ হয়েছি। আমি খারাপ। আর তুমি খুব ভাল, তাই না ? তা হলে আমার বুকের দিকে তাকিয়ে আছ কেন ?

আর সহ্য করতে পারিনি। ঠাস করে একটা চড় মেরেছিলাম। কাত হয়ে ও পড়ে গিয়েছিল। খাটের ওপর পাশ ফিরে, হাঁটু জোড়া করে কয়েক সেকেন্ড ও নির্জীবের মতো পড়ে রইল। চোখ বোজা। চোয়াল শক্ত। হঠাৎই ও একটু কেঁপে উঠল। তার পর পা দুটো আলগা করে, চোখ খুলল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছিলাম। কয়েকদিন আগে আমার ঘরেও ও এরকম করেছিল। চোখ খোলার পর তিতলি বলল, "আমাকে একটু তুলে বসাবে বুবুনদা। শরীরে কোনও জোর পাচ্ছি না।"

হঠাৎই ও শান্ত হয়ে গেছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে ওকে তুলে, বসিয়ে দিয়েছিলাম। চোখে চোখ রেখে বলেছিলাম, "তুই মাঝেমধ্যে এমন পাগলামি করিস কেন বল তো ?"

—জানি না। তুমি আমাকে মারলে, জানো, আমার শরীরে একটা সেনশেসন হয়। আমার খুব ভাল লাগে।

বলেই মুখটা নীচে নামিয়ে ফেলেছিল তিতলি। আমার হাত ধরে ছিল। হাতটা আমি ছাড়িয়ে নিতেই বলেছিল, "তুমি আমার উপর রাগ কোরো না বুবুনদা। তোমরা আমাকে যতটা খারাপ ভাব, আমি কিন্তু ততটা খারাপ না।"

কথাগুলো ও বলল খুব আস্তে আস্তে। সেই ঔদ্ধত্য নেই। কেমন যেন হেরে যাওয়া মনোভাব থেকে। এই স্বরে ওকে কথা বলতে কোনও দিন শুনিনি। বললাম, "এই একটু আগে যে কথাটা বললি, সেটা কি ভাল মেয়েরা বলে ?"

—আই অ্যাম সরি বুবুনদা। অ্যাপোলজি চাইছি।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোর ঝিমলি বোধহয় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে যেন কিছু না বলে দেয়।

—না। ও কাউকে কিছু বলবে না।

এর পরই তিতলি উঠে গিয়ে ড্রেসিং টেবলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুখ মুছে হালকা পাউডার বুলিয়ে, চুলে চিরুনি চালিয়ে আমার কাছে এসে বলেছিল, "তোমার খুব খিদে পেয়ে গেছে, তাই না ? তুমি বসো। আমি খাবার নিয়ে আসছি। এই ঘরে

আমার সামনে বসে তুমি আজ খাবে।" কথাগুলো এমন নরমভাবে বলল যে, দশ মিনিটের ব্যবধানে দেখা দুই তিতলিকে আমি ঠিক মেলাতে পারছিলাম না। মনে হয়েছিল, এই তিতলিকে আমি যা বলব, শুনবে।

.... সেবার আউটডোরে বসে তিতলির কথা ভাবছি। এমন সময় পাপিয়ার সঙ্গে ঘরে ঢুকে ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "সরি ঋচীকভাই, অনেকক্ষণ তোমাকে বসিয়ে রেখেছি।"

বললাম, "আরে না। না। পাপিয়ার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিলাম।"

ডাক্তার ব্যানার্জি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "সর্বনাশ। মিস বহরমপুর শুনলে তো তা হলে তুলকালাম করবে। হ্যাঁ রে পাপিয়া, কী গল্প করছিলি তুই?"

হেসে বললাম, "শুধু গল্পই নয়, পাপিয়া সরবতও খাইয়েছে আমাকে।"

—চমৎকার। ওকে সারিয়ে তুললাম আমি। আর সরবত খাচ্ছ তুমি। এই দুনিয়াটাই বেইমান হয়ে গেছে।

ডাক্তার ব্যানার্জি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এই সময় প্রতিমাদিকে ঘরে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেলেন। এতক্ষণে বুঝলাম, উনি কেন একটু আগে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন। প্রতিমাদির পরনে সাধারণ একটা শাড়ি। ভদ্রমহিলা বোধহয় সাজগোজ করেন না। আগের দিনও দেখেছিলাম, কোনও বাহুল্য নেই প্রতিমাদির মধ্যে।

সোফায় বসে প্রতিমাদি লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "সরি, একটু দেরি হয়ে গেল।" কতক্ষণ এসেছেন, ঋচীকবাবু?"

—প্রায় ঘণ্টাখানেক।

—ছেলের স্কুলের বাস আসেনি আজ। ওকে স্কুলে পৌঁছে দিতে হল। ওখানেই অনেকটা সময় নষ্ট হল।

ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "অত সংকোচ করার কিছু নেই প্রতিমা। আমিও আজ আধঘণ্টা লেট।"

—মুনের ব্যাপারে কথা বলেছেন ঋচীকবাবুর সঙ্গে?

—এখনও কিছু বলিনি। তোমার জন্য বসিয়ে রেখেছিলাম।

—আমি কথা বলব?

—বলো। আমি ততক্ষণ রোগী দেখি। তুমি বরং ওকে ওপরে নিয়ে যাও। প্রতিমাদি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর বললেন, "আপনার একটু সাহায্য দরকার ঋচীকবাবু। মুনমুনের জন্য।"

কথা বলতে বলতেই আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে এলেন প্রতিমাদি। জিজ্ঞাসা করলাম, "ও কেমন আছে এখন?

—ভাল। কিন্তু সুস্থ নয়। ওর সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলেছি। একটা ভয় ওর মনের মধ্যে রয়েছে। সেটাকে তাড়িয়ে দেওয়া দরকার। সাম হাউ, ওর মনে হয়েছে আপনি ওর সেভিয়র হতে পারেন। সেই কারণেই আপনাকে ডাকা।

—আমাকে কী করতে হবে, বলুন।

—মাঝেমধ্যে আপনাকে আসতে হবে এখানে। ওকে ভরসা দিতে হবে।

—বেশ আসব।

—এখন আপনাকে ওর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। দেখি, কীভাবে রিঅ্যাক্ট করে। তারপর কোর্স অব অ্যাকশন ঠিক করব।

—চলুন।

প্রতিমাদি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। পেছন পেছন আমি। এর আগে আর একবার ওপরে গেছি। সেদিন মুন চিনতে পারেনি। আজ কপালে কী আছে, জানি না। আমার জন্য একটা মেয়ে যদি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরে, আমার আপত্তির কিছু নেই। সেদিন উপরে ওঠার সময় খুটিয়ে কিছু দেখিনি। আজ দেখলাম, নীচে পনেরো-ষোলোজন মেয়ে নানা কাজে ব্যস্ত। কয়েকজন হাঁ করে দেখছে। বাড়ির ভেতরটা খুব ঝকঝকে। ওঠার সময় দেখলাম, সিঁড়িটা এমন পরিষ্কার যে, মুখ দেখা যায়।

তিনতলায় পা দিয়েই আমি মুনকে দেখতে পেলাম। সবে স্নান করে উঠেছে। পাখার নীচে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছে। লোহার খোঁচার ভেতর পাখা ঘুরছে। হোমের সব ঘরের পাখাই এরকম খাঁচার ভেতর। আমাকে দেখতে পেয়ে আগ্রহভরে কাছে এল মুন। বলল, "বাজে লোক, তুমি এতদিন আসোনি কেন গো? ডাক্তারবাবুকে রোজ বলছি তোমার কথা।"

মুনের চোখ-মুখে অসুস্থতার কোনও চিহ্ন নেই। সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। প্রতিমাদিকে ও বলল, "দিদি, আপনি ওকে চেনেন?"

—হ্যাঁ। অনেকদিন।

—আমাকে তো বলেননি।

—বলব কী, তুমি তো আমার সঙ্গে কথাই বলতে চাও না।

—আচ্ছা, এখন থেকে বলব।

—কথা দিচ্ছ কিন্তু?

—ডেফিনিট।

—মুন, তুমি বাজে লোকের সঙ্গে গল্প করো। আমি পাশের ঘরে দিদাকে দেখতে যাচ্ছি।

মুন আমাকে হাত ধরে বসাল বিছানায়। তারপর বলল, "কলকাতায় তুমি কতদূরে থাকো গো।"

—অনেক দূর।

—বাসে করে যেতে হয়?

—হ্যাঁ।

—আমাকে নিয়ে যাবে একদিন।

—তুমি ভাল হয়ে যাও, তার পর।

—আমি ভাল হয়ে গেছি।

—তোমাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে।

—আচ্ছা বাজে লোক, আমি কি পাগল হয়ে গেছি?

—কে বলল?

—সুদীপাদিদির বাড়িতে একটা কাজের মেয়ে আছে, সে বলছিল।

—সেই মেয়েটাই পাগল।

—মনে হয়।

—এখানে তোমার কেমন লাগছে।

—বহরমপুরের জন্য মন কেমন করছে। আমার কলেজ কামাই হয়ে গেল অনেক দিন।

—কোন কলেজে পড়ো ?

—ওখানে তো একটাই কলেজ, মেয়েদের।

—ওখানে তোমার কোনও বন্ধু নেই ?

—আছে। স্নিগ্ধা আর সংঘমিত্রা।

—কোথায় থাকে ?

—গোরাবাজারে। অজানা সংঘের পুজোটা যেখানে হয়, তার পিছনে।

—বহরমপুর আমার খুব ভাল লাগে।

—তুমি গেছ কখনও ?

—অনেকবার।

—আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকবে ?

—নিশ্চয়।

—তুমি থাকলে আমার খুব ভাল লাগবে বাজে লোক।

—তুমি আমাকে বাজে লোক বলে ডাকো কেন ?

—তোমার নাম তো আমি জানি না।

—আমার নাম ঋচীক।

—এ মা। এটা কী ধরনের নাম। আমার মনে থাকবে না।

—তা হলে তুমি আমাকে বুবুন বলে ডেকো।

—বুবুন। তোমাকে আর কে ডাকে এই নামে।

—সবাই। আমার মা, পাড়ার লোক সবাই।

—তোমার মা তোমাকে খুব ভালবাসে ?

—খুব।

—আমার মাও। মা তোমার উপর রাগ করেছে।

—কেন ?

—তুমি আমার খোঁজ করোনি কেন ?

—কে বলেছে ? তোমাকে আমি দেখতে এসেছিলাম।

—যাঃ, কবে ?

—অনেকদিন আগে। তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না।

—হবে হয়তো। আমার শরীরটা তখন খারাপ ছিল। বুবুন, তুমি রোজ আসবে ? আমার তা'লে ভাল লাগবে।

—রোজ তো আসতে পারব না।

—না, তুমি রোজ আসবে। না হলে আমি ওষুধ খাব না।

—ঠিক আছে। আসব তা'লে।

—আমার না আগে খুব ভয় করত।

—এখন ?

—করে না। ভয় পেলেই তোমার কথা ভাবি। গুণ্ডাদের তুমি খুব মারবে। জানো, আমার বাবাকে ওরাই মেরে ফেলল।

—কারা ?

—নাম জানি না।

—দেখলে তুমি চিনতে পারবে ?

—বোধহয় না। ডাক্তারবাবু আমায় বলেছে, গুণ্ডাদের খুব মারবে। পারবে ওদের সঙ্গে ডাক্তারবাবু ?

—আমিও ডাক্তারবাবুর সঙ্গে থাকব।

—তোমার খুব সাহস, না ?

—খুব। এখানে তুমি কেমন আছ মুন ?

—ভাল। পাশের ঘরে একটা দিদা থাকে। তার খুব কষ্ট।

—কেন কী হয়েছে ?

—দিদার ছেলের বউটা ভাল না। ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। দিদাটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি বলছি, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তুমি ভাল হলে, আমি তোমাকে বহরমপুরে নিয়ে যাব।

—এখানে সবার সঙ্গে তুমি গল্প করো বুঝি ?

—নীচের মেয়েদের সঙ্গে না। ওরা খুব নোংরা। ঝগড়ুটে।

—তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে ?

—না। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। প্রতিমাদিকে বলেছি !

—তোমার মা রোজ আসেন ?

—মা তো এবার ভর্তি করে চলে গেছে। ইন্দ্রর হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষা।

—সুদীপারা কেউ আসে না ?

—খুব কম আসে। মায়া বলে একটা মেয়ে আছে। ও কী বলছিল জানো। এখানে ভর্তি করে প্রথম প্রথম বাবা-মায়েরা খুব আসে। তার পর আসা কমিয়ে দেয়। তার পর আর আসে না। বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় না। পাগলকে কে নিয়ে যাবে, বলো ?

কথাটা শুনে বুকটা মুচড়ে উঠল। মুনের দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে বললাম, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মুন, আমি অন্তত আসব। তোমাকে আর কেউ নিয়ে যাক বা না যাক, আমি নিয়ে যাব।" মুখে বললাম, "যাঃ, তাই হয় নাকি ?"

—হ্যাঁ হয়। দিদা ভাল হয়ে গেছে। তবু ছেলে নিয়ে যাচ্ছে না। আমি নিজের কানে শুনেছি। দিদার ছেলে ডাক্তারবাবুকে রিকোয়েস্ট করছিল। এখানে রেখে দেওয়ার জন্য।

আমি কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রতিমাদি। তারপর বললেন, "মুনমুন, এ বার তুমি খুশি তো ? তোমার বাজে লোক রোজ আসবে বলেছে।"

—দিদি, আমরা আর একটু গল্প করব ?

—আজ আর নয় মুনমুন। এখন লাঞ্চ টাইম। এ বার তোমায় নামতে হবে।

—বুবুনের সঙ্গে যাব ?

—চলো তা হলে !

নীচে নামার সময় মুন আমার হাত জড়িয়ে ধরল। দেখে প্রতিমাদি হাসলেন।

॥ নয় ॥

কাল রাতের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল। আজ সকালে মেঘ সরে যেতেই বেশ রোদ্দুর উঠেছে। উত্তর দিক থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ছাদে রোদ্দুরে বসে খবরের কাগজটা পড়ব বলে রুমকিকে ডাকলাম। বাবা নীচে একটা ইজিচেয়ার ব্যবহার করতেন। সাহেব আমলের জিনিস। পার্ক স্ট্রিটের এক সাহেব ওটা বিক্রি করেছিলেন বাবার কাছে। কিছুদিন হল ওই ইজিচেয়ারটা আমি ওপরে নিয়ে এসেছি। হাতলটা বেশ চওড়া। চামড়ার গদি। মাঝেমধ্যে ছাদে বসে রিল্যাক্স করি।

একবার ডাকলেই রুমকি এসে হাজির হয়। ও যেন বুঝতে পারে, কী জন্য আমি ডাকছি। হাতে খবরের কাগজটা দেখে ও ইজিচেয়ার নিয়ে এসে পেতে দিল ছাদে। মাঝেমধ্যে রুমকি আমাকে অবাক করে দেয়। সারাদিন মুখ বুজে কাজ করে মেয়েটা। বেশ চালাক-চতুর। সব দিকে ওর নজর। আমার মায়ের ট্রেনিং। রুমকির একটাই নেশা টি ভি দেখা।

—দাদাবাবু, আজ একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে ?

—কেন রে ?

—টি ভি-তে অক্ষয়কুমারের সিনেমা আছে।

—ওর বই তোর খুব ভাল লাগে ?

—খুউব।

—আমাদের অক্ষয়কুমারটা কোথায় জানিস ?

শুনে খুব মজা পেল রুমকি। হেসে বলল, "সক্কালে একবার এসেছিল। তুমি নেই বলে দলবল নিয়ে গেল নিমতলা।"

—নিমতলা কেন ?

—মিত্তিরবাবুর বাবা মারা গেছে ভোর রাতে। মড়া পোড়াতে গেছে।

—তোর মায়ের রাগ কমেছে বাবলুর ওপর ?

—হ্যাঁ। দিদি ফের শ্বশুরবাড়ি গেছে। বাবলুদাই দিদিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গোয়াবাগানে দিয়ে এসেছে।

—আমার কাছে এটা একটা খবর। দাদাগিরি করার জন্য বাবলু সব সময় মুখিয়ে থাকে। কিন্তু এ তো রীতিমতো স্যাক্রিফাইস! বোধহয় লেটেস্ট কোনও বইয়ে অক্ষয়কুমারকে এইরকম আত্মত্যাগ করতে দেখেছে। সিনেমায় আকছার এ সব হয়। তখন লোকের বুক ফেটে যায় অক্ষয়কুমারের দুঃখে। যত সব বোগাস ব্যাপার। রুমকি যায়নি। বোধহয় কিছু বলবে। ওর দিকে তাকাতেই বলল, "দাদাবাবু একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। আজ ধলাসোনাটাকে, বিলুদাদাদের হুলো বেড়ালটা তাড়া করেছিল।"

নীচে আমার যে খরগোস দু'টো আছে, তার একটার নাম রুমকি দিয়েছে ধলাসোনা। সময় পেলেই কোলে নিয়ে আদর করে। জিজ্ঞেস করলাম, "তার পর ?"

—ভাগ্যিস আমার চোখে পড়েছিল। তাড়া করতেই হুলোটা পালিয়ে গেল।

—খাঁচা খোলা পেল কী করে রে?

—কী জানি, কী করে বেরুল?

—সব সময় বন্ধ করে রাখবি।

বলেই কাগজটা মেলে ধরলাম। দিল্লিতে গুজরাল সরকার ভাঙার মুখে। রাজীব গাঁধী হত্যার রিপোর্ট ফাঁস হয়ে গেছে। দিল্লিতে জট পাকিয়েছে। ফের ভোট হতে পারে। এই তো ক'দিন আগে একবার ভোট হয়ে গেল। আবার? বামপন্থী নেতারা দোষ দিচ্ছেন কংগ্রেসের সীতারাম কেসরীকে। কী দরকার ছিল, সাপোর্ট তুলে নেওয়ার? হেডিংগুলোয় চোখ বোলাতে বোলাতে হঠাৎ চারের পাতায় একটা খবরে নজর গেল, "স্ত্রীর নির্যাতনে মনোরোগ বেড়ে যাচ্ছে স্বামীদের।" খবরটা পড়তে শুরু করলাম।

"রাঘব নামে এক ভদ্রলোক প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের তিন বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই প্রেম শেষ। স্ত্রী যে অমন ভয়ঙ্করী রূপ ধরবেন, রাঘব তা ভাবতেও পারেননি। প্রচণ্ড মানসিক চাপে পড়ে তিনি একটা সময় আত্মহত্যার কথা ভাবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যান। সাইকিয়াট্রিস্টদের মতে, বিগত দু'দশক ধরে এই ধরনের মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। অনেক মহিলাই এখন শ্রীমতী ভয়ঙ্করী হয়ে উঠছেন। আধুনিক মহিলারা যেন এখন একটু বেশিই পুরুষ নির্যাতন শুরু করেছেন। এই মন্তব্য, দিল্লির এক সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ মণিকা চিবের।"

আগে এই সব খবর পড়তাম না। সেবায় যাতায়াত শুরু করার পর থেকে পড়ি। খবরটা বেশ ইন্টারেস্টিং। হাসপাতালের সম্মোহনবিদ (হিপনোথেরাপিস্ট) বনিত নলওয়া বলেছেন, মহিলারা এখন যথেষ্ট মানসিক পীড়ন চালাচ্ছেন পুরুষদের উপর। সেই কারণে মনস্তত্ত্ববিদদের চেম্বারে ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। কোনও কোনও স্ত্রী তাঁদের কাঙ্ক্ষিত জিনিস আদায়ের জন্য যৌন সম্পর্ক ব্যবহার করতেও দ্বিধা করছেন না। রোগীরা নিজেরাই এসে এ কথা ডাক্তারদের জানাচ্ছেন।

আর এক মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ চন্দ্র বলেছেন, মহিলারা ক্রমশ উগ্র, অসহিষ্ণু এবং অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠেছেন। অনেকে বংশগত কারণে উগ্র স্বভাবের হন। বিশেষ করে, যাঁদের ক্ষেত্রে বাবা শান্ত, মা প্রখরা— তাঁদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মেয়েরা অধিকাংশই মায়ের স্বভাব পান। এ ছাড়া, ছোটবেলার পরিবেশ, ব্যক্তিত্বের সংঘাত, মাদকাসক্তির কারণেও মহিলারা উগ্র প্রকৃতির হয়ে যান।

মনস্তত্ত্ববিদ সঞ্জয় চুঘ অবশ্য বিষয়টাকে একটু অন্য চোখে দেখছেন। তাঁর মতে, মেয়েরা এতদিন মুখ বুজে পুরুষদের অনেক অন্যায় আচরণ মেনে নিতে বাধ্য হতেন। সামাজিক নিন্দার ভয়ে। এখন দিনকাল বদলেছে। মেয়েরা রুখে দাঁড়াতে শিখেছেন। মেয়েদের এই প্রতিবাদী ভূমিকা দেখতে পুরুষ সমাজ অভ্যস্ত নয়। মেয়েরা এখন একতরফা মার খেতে চান না। ফলে সমস্যা জটিল হচ্ছে।

পুরো খবরটা পড়ে মনে হল, ডাঃ চুঘ ঠিকই বলেছেন। মেয়েরা আমাদের সমাজে বরাবরই অত্যাচারিতা। ছোটবেলা থেকে তাঁদের শেখানো হত, পতি পরম দেবতা। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য ইত্যাদি। স্বামী অবিচার করলেও তার প্রতিবাদ করা যাবে না। আশপাশেই অনেক নজির। যেমন, আমার বড়মাসি। মেসোমশাই সারা জীবন

জোর খাটিয়ে গেলেন মাসির উপর। একবার নিজের চোখেই দেখেছি, খেতে বসে মেসোমশাই কাঁসার ভারী বাটি ছুড়ে মেরেছিলেন মাসিকে। কারণ, ভাতে চুল পড়েছিল। মাসির কোনও দোষ ছিল না। তবুও প্রতিবাদ করেনি। পুলুদা যদি আজ এই ব্যবহার করে, তা হলে সহ্য করবে বউদি ? কখনও না।

ছোটবেলা থেকে মাসির মুখে আমি কখনও হাসি দেখিনি। মেসোমশাইয়ের ভয়ে সব সময় কুঁকড়ে থাকত। আমাদের বাড়িতে এসে, এক মিনিট দেরি হলে উসখুস করত। মেসোমশাইয়ের দেওয়া ফিরে যাওয়ার টাইম না মানলে চলবে না। শ্যামপুকুরে দাদুর সেই সম্পত্তি নিয়ে মেসো আর বাবার সঙ্গে যখন মনোমালিন্য তুঙ্গে সেই সময় ফোনে মাসিকে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখে মেসো নাকি মাসির গায়ে হাত তুলেছিল।

মাসি যে এতদিনে মেন্টাল পেশেন্ট হয়ে যায়নি, এটাই আশ্চর্যের। সেই তুলনায় মা অনেক ভাগ্যবতী। বাবা কখনও মাকে কষ্ট দেননি। রোজ বাড়ি ফিরে বাবা জলখাবার খাওয়ার সময় মায়ের সঙ্গে গল্প করতেন। সারাদিনে কী করেছেন, সে সব গল্প করতেন। মা সেই সময় মেয়েদের হাতের কাজ শেখাত। বাবার কাছে রোজ পরামর্শ নিত কোনও সমস্যায় পড়লে। স্কুলে পড়ার সময় তো বটেই, কলেজে ঢোকার পরও আমি বাবা-মাকে গল্প করতে দেখেছি। মাসি একেক সময় বলত, "তোর কপালটা খুব ভাল রে নমি। বাবা পয়সা দেখে, একটা জানোয়ারের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিল। তোকে দেখি, আর ভাবি সে কথা।"

কাগজটা পড়া হয়ে যেতেই ভাঁজ করে হাতলে রাখলাম। ঘণ্টা চারেক নিশ্চিন্ত। কোনও কাজ নেই। চোখ বুজে রোদ্দুর পোহাতে লাগলাম। সকালের দিকে একটা বড় কাজ করে এসেছি। দেখা করতে গেছিলাম আই টি সি-র বড় এক কর্তার সঙ্গে। ইস্টার্ন বাইপাসের প্রোজেক্টে ফ্ল্যাট বিক্রির ব্যাপারে। গেস্ট হাউস করার জন্য ওঁরা কয়েকটা ফ্ল্যাট কিনতে চান। খবরটা পেয়েছিল সুমিতাভ। কথাবার্তা আজ বেশ ভাল এগিয়েছে। সাইটে নিয়ে গিয়ে ওদের দেখাতে হবে। যদি ডিল পাকা হয়ে যায়, আটটা ফ্ল্যাট ওঁরা নেবেন। মনটা তাই হালকা। মাঝে প্রোমোটিং বিজনেসে একটু মন্দা এসেছিল। এখন আবার পিক আপ করছে।

—বুবুন, তুই এখানে ? আর চন্দনা তোকে তখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। চোখ খুলে দেখি, মা। পরনে পাট ভাঙা শাড়ি, শাল। বোধহয়, কোথাও বেরোচ্ছে।

—কোথাও যাচ্ছ মা ?

—হ্যাঁ রে। ও বাড়ির দিদি কালীঘাটে যাচ্ছে। আমাকেও নিয়ে যাচ্ছে। চন্দনার বিয়ের মানত রাখতে।

—চন্দনাদি কি আমার খোঁজ করছিল, মা ?

—দু'বার ঘুরে গেল। কী নাকি দরকার তোর সঙ্গে। তোকে ও বাড়িতে যেতে বলেছে।

—কোথাও যাব না। আগে চান-খাওয়া। শ্বশুরবাড়িতে গেলে তো আর আমায় চিনতেও পারবে না।

মা হেসে বলল, "বকিস না। চন্দনা ও রকম মেয়েই না। শোন, যে জন্যে এলাম। আজ সন্ধের দিকে কি তুই বাড়ি থাকবি ?"

—তুমি বললে থাকব। কেন মা ?

—তোর সঙ্গে আলাপ করতে আসবে একজন।

মায়ের মুখে চাপা হাসি। দেখে আর কথা বাড়ালাম না। কিছুদিন হল কমলামাসির মাথায় ভূত চেপেছে। মাকে বোঝাচ্ছে, ছেলের বিয়ে দিয়ে দে। কোত্থেকে একটা পেত্নি ধরে আনবে, তখন পস্তাবি। কমলামাসি এর আগে একটা সম্বন্ধ এনেছিল। আমাকে কিচ্ছু বলেনি। দু'জনে মিলে বলল, আজ একটু বেলগাছিয়ার পরেশনাথের মন্দিরে নিয়ে যাবি বাবা। নিয়ে গেলাম। দেখি, আরেকটা ফ্যামিলিও সেখানে গেছে। তাদের সঙ্গে কুড়ি-বাইশ বছরের একটা মেয়ে। ভাল করে দেখিওনি। রাতে বাড়ি ফিরে মা জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগল রে মেয়েটাকে ?" তখন বুঝলাম। মাকে বলে দিয়েছি, বিয়ে-টিয়ে এখন না।

কমলামাসি বোধহয় আবার কাউকে জোগাড় করেছে। উৎসাহের শেষ নেই। মায়ের বন্ধু। আমার মায়েরই মতো। কড়া কথা তো আর বলা যায় না। তাই মাকে বললাম, "তুমি ঘুরে এসো। আমি আছি।"

মা বলল, "রুমকি রইল। খাওয়ার সময় ডেকে নিস। বাবলুটা এলে বলিস, সন্ধের দিকে যেন থাকে। মিষ্টি আনিয়ে রাখতে হবে।"

কথাগুলো বলে মা নেমে গেল। আজ আবার আমাকে অস্বস্তিতে পড়তে হবে। মা-বাবার সামনে হয়তো আবার কোনও মেয়েকে বসিয়ে দেবে। আড়ষ্ট হয়ে সে বসে থাকবে। মুখ নিচু করে সে উত্তর দেবে। আর আমিও লজ্জায় কোন প্রশ্ন করব, বুঝে উঠতে পারব না। মেয়ে পছন্দ করার এই সিস্টেমটা খুব খারাপ। মাসির বাড়িতে কয়েকবার বুটুকে পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছে। ঘটনাচক্রে আমি একবার সেখানে ছিলাম। বুটুর অবস্থা দেখে এত খারাপ লেগেছিল, সেদিনই ঠিক করেছিলাম, নিজে কখনও কোনও মেয়ে দেখতে যাব না। সব থেকে বাজে ব্যাপার, পছন্দ না হলে সেটা বলা। আমার কোনও অধিকার নেই, কাউকে ছোট করার।

এই সব ঝামেলায় পড়তে হয়নি দাদাকে। জুরিখ যাওয়ার বছর খানেক পর দাদা মাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, লিন্ডাবউদির কথা। বছর দেড়েক লিন্ডাবউদিদের বাড়িতেই পেয়িং গেস্ট ছিল। মাঝেমধ্যে ফোন করত। তখন ফোনে লিন্ডাবউদি মায়ের সঙ্গেও কথা বলত। তার পর দাদা একদিন ফোন করে জানাল, বিয়ে করছে। মা তখন আপত্তি করেনি। পরে প্রথম যে বার দাদা বউ নিয়ে এল, সে বার বউদিকে দেখে মা খুব খুশি। আমার মা অন্যদের মতো নয়। আমি জানি, আমি যদি কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, মা কখনও আপত্তি করবে না। শুধু বলবে, "যা করছিস, একটু ভেবে-চিন্তে করিস।"

বেলা বাড়ছে। রোদ্দুরটা গায়ে লাগছে খুব। এবার স্নান করা দরকার। ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠতে যাব, এমন সময় ফোন। লং ডিসট্যান্স। জুরিখ থেকে। লিন্ডাবউদির গলা শুনে আমি লাফিয়ে উঠলাম। ইদানীং বউদি অল্প অল্প বাংলা বলতে শিখেছে। বলল, "বুবুন, তুমি কেমন আছ ?"

—ভাল। তোমরা ?

—ঠাণ্ডায় জমে গেছি। এখানে এখন বরফ পড়ছে। মা কোথায় ?

—এখন নেই। তোমরা কবে আসছ বলো। মা কালই তোমাদের কথা বলছিল।

—দাদার সঙ্গে কথা বলো। ধরো।

—দাও।

ও প্রান্তে হাত বদল হল রিসিভার। দাদার গলা, "বুবুন, চন্দনার বিয়েটা কবে রে?"

—তোমরা আসছ? চৌদ্দই ডিসেম্বর।

—ইস। বিয়েটা কি পিছনো যায়? কাকাবাবু ক'দিন আগে ফোন করেছিল। খুব করে যেতে বলল। মুশকিল হচ্ছে, ক্রিসমাসের ছুটি শুরু উনিশে। বিয়েটা যদি আর ক'দিন পরে হত, তা হলে অ্যাটেন্ড করতে পারতাম।

—চৌদ্দর পরে তো আর বিয়ের ডেট নেই। পৌষ মাস পড়ে যাচ্ছে। তুমি ক'দিন আগে আসতে পারবে না?

—না রে। হবে না। চেষ্টা করেছিলাম। অফিস ছাড়বে না। বল তো, চন্দনাকে কী প্রেজেন্ট করা যায়? আমি তো ভেবেই ঠিক করতে পারছি না।

—আমি কী বলব, বউদিকে জিজ্ঞেস করো। মা থাকলে, বলতে পারত।

—মা ভাল আছে?

—হ্যাঁ। কালীঘাটের মন্দিরে গেছে। এসে আপসোস করবে।

—তুইও তো ফোন করতে পারিস। হ্যাঁ রে, তোর প্রোজেক্ট কেমন চলছে?

—ভাল।

—এখানে দেবজিৎ আর সুপর্ণকে একদিন তোর প্রোজেক্টের কথা বলছিলাম। ওরা তোর ফ্ল্যাট কিনতে চায়। অ্যারেঞ্জ করতে পারবি?

—হ্যাঁ। এখনও বুকিং চলছে। ওদের বলো, আরও কয়েকজন এন আর আই আমার ওখানে ফ্ল্যাট কিনছে। এন আর আই-দের কিছু সুবিধা দিচ্ছি।

—তা হলে গোটা তিনেক ফ্ল্যাট ওখানে রাখিস। ক্রিসমাসের সময় সুপর্ণ কলকাতায় যাচ্ছে। তোর সাথে তখন যোগাযোগ করবে। রিজনেবল প্রাইসে করে দিস।

—ও সব নিয়ে ভেবো না। তুমিও চলে এসো না।

—না রে এখন যাওয়া হবে না। মার্চের দিকে যেতে পারি। সিঙ্গাপুরে আমাদের একটা কনফারেন্স আছে। তখন ফেরার সময় কলকাতায় যাব। মাকে তা হলে বলে দিস, কেমন?

—ঠিক আছে।

—আর শোন। একটা সুখবর আছে। এখানকার গভর্নমেন্ট আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছে। এরা থার্ড ওয়ার্ল্ডের নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনগুলোকে অনেক ফাইনান্সিয়াল হেল্প করে। সোশ্যাল সার্ভিসের জন্য নানা প্রতিষ্ঠানকে টাকা দেয়। সে প্রচুর টাকা। ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্টে কারা সেই টাকা পাবে, তা আমাকে ঠিক করার দায়িত্ব এরা দিয়েছে। আমি ভাবছি, বাবার নামে কোনও কিছু করা যায় কি না। তুই একটু ভাব।

—কী ধরনের সোশ্যাল সার্ভিস, দাদা?

—আমরা এখানে একটা অর্গানাইজেশন করেছি। বুড়ো-বুড়িদের চান করানোর ব্যবস্থা। খুব পপুলার হয়েছে। কলকাতায় এ কথা শুনলে লোকে হাসবে। ওখানে

অন্য রকম কিছু করতে হবে। এই যেমন ধর, বস্তির ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, সোনাগাছির সেক্স ওয়ার্কারদের জন্য কিছু করা...একটা চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিও করতে পারিস। আমাদের বাড়ির নীচে তো বেশ কয়েকটা ঘর খালি পড়ে আছে। ভাব না। আমি পরে কথা বলব। টাকার জন্য ভাবিস না।

—ঠিক আছে দাদা, মানুদাদের সঙ্গে কথা বলব ?

—হ্যাঁ, বল। এ সব কাজে ওর খুব ন্যাক। হাতে এখনও মাস তিনেক সময় আছে। মার্চে গিয়ে আমি ফাইনাল শেপ দেব। এর মধ্যে তোরা প্রোজেক্ট ঠিক করে ফ্যাল। কাগজ-পত্তর তৈরি রাখবি। এখানে মুখে কোনও কাজ হয় না। ছাড়ি তা হলে ?

—নেক্সট উইকে তোমাকে ফোন করব।

—করিস। এই সময়।

বলেই দাদা লাইনটা কেটে দিল। দাদার সঙ্গে কথা বলে হঠাৎ খুব ভাল লাগল। দাদা আমার মতো নয়। পাড়ার সবার সঙ্গে খুব মিশত। দাদা আর মানুদা মিলে, এখানে একটা ফ্রি কোচিং ক্লাস খুলেছিল। বিকেল বেলায় ছেলে-মেয়েদের বিনে পয়সায় পড়াত। লোকের জন্য কিছু করার অভ্যাস দাদার ছোটবেলা থেকেই। সেই অভ্যেসটা এখনও যায়নি। দাদা বাড়িতে এলে এখনও, রোয়াকে বসে মানুদাদের সঙ্গে আড্ডা মারে। ক্যারাম খেলে পাড়ার স্বামীজি সঙ্ঘে। আমাদের বাড়ি থেকে সিমলা স্ট্রিট খুব বেশি দূরে নয়। ওখানে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি। দাদা স্কুলে পড়ার সময়ই স্বামীজির নামে ক্লাব করেছিল। এখনও এলে ক্লাবের জন্য কিছু না কিছু করে দেয়।

আমি কোনওদিন ক্লাব-ট্লাব করিনি। খুব বেশি মেশামেশি করিনি পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে। তবে ওরা এলে পুজো, ফাংশান বা অন্য কোনও কারণে চাঁদা চাইলে, দিই। চড়কের সময় আমাদের এখানে বিরাট একটা মেলা হয়। বিডন স্ট্রিট কয়েকটা দিন গমগম করতে থাকে। গাজনের সন্ন্যাসীরা আসে। গত বছর পাড়ার ছেলেরা কাকাবাবুকে মেলা কমিটির প্রেসিডেন্ট করেছিল। বাধ্য হয়ে তাই মাথা গলিয়েছিলাম। এ বার এলে না বলে দেব।

বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা। এ বার চান করে নেওয়া দরকার। ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে আজ। খবরের কাগজটা উড়ে গিয়ে কখন রেলিংয়ে আটকে গিয়েছে, লক্ষ করিনি। সেটা আনতে গিয়ে, হঠাৎ মানুদাদের বাড়ির দিকে চোখ পড়তেই, দাঁড়িয়ে গেলাম। মানুদার বউ উঁচু তারে ভিজে শাড়ি মেলছে। সদ্য স্নান করে এসেছে। একটা গামছা কোমরে গিঁট দেওয়া। আরেকটা বুকের ওপর মেলা। উঁচু তারে নাগাল পাচ্ছে না। বুকের গামছাটা সরে যাচ্ছে। ধবধবে ফর্সা দুটো স্তন দেখা যাচ্ছে। এক হাতে সেই গামছা সামলাতে গিয়ে মানুদার বউ বেশ মুশকিলে পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে আজ পর্যন্ত কথা বলিনি। যদিও, মানুদাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেশ ভাল। দাদা যখন এখানে ছিল, মানুদা রোজ আসত। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর থেকে লোকটা অন্য রকম হয়ে গেল। কিছুদিন আগে মানুদার বউ খুব ঝগড়া করেছিল চুমকির সঙ্গে। আমাদের বাড়ির এঁটো-কাঁটা, মুখে করে নিয়ে গিয়ে কাক খাচ্ছিল মানুদার ঘরের সামনের ছাদে। ভদ্রমহিলা যা-ইচ্ছে তাই বলতে শুরু

করেছিলেন। রুমকি হলে হয়তো কিছু বলত না। কিন্তু তখন চুমকির রাজত্ব এ বাড়িতে। সেই বা ছাড়বে কেন ? পরে মাকে সামাল দিতে হয়।

মায়ের মুখে তখন শুনেছি, মানুদার বউ নাকি দিনে চার-পাঁচ বার চান করে। সে গরমের সময় হোক, অথবা শীতকাল। শুচিবাই আছে। বিলু...মানুদার ভাই বলে, বউদির মাথা খারাপ। ওই ঝগড়ার পর আমাকে বলেছিল, "জানিস বুবুন, বউদি কখনও হাত পেতে টাকা-পয়সা নেয় না। আঁচল পেতে নেয়। বলে, এই পয়সা কত লোকের হাত ঘুরে এসেছে। জার্ম লেগে যাবে। বউদির ভীষণ ঘেন্না। দাদা অফিস থেকে ফিরলে রোজ চান করায়। না করলে পাশে শুতে দেয় না। দাদার জীবনটা শেষ করে দিল বউদি। তোরা কিছু মনে করিস না।"

মানুদার বউয়ের দিকে ফের চোখ চলে গেল। বিলুদের ঠাকুর ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গামছা নিংড়োচ্ছে। এই সময়টা আশপাশের কোনও বাড়িতে কোনও পুরুষ মানুষের থাকার কথা নয়। সবাই অফিস-কাছারিতে। মানুদার বউ বোধহয় এই কারণেই অসতর্ক। রেলিংয়ের সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। চোখে পড়লে হয়তো চিৎকার শুরু করে দেবে। রুমকিও হঠাৎ উঠে আসতে পারে ছাদে। দেখে ফেললে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। ভাববে, দাদাবাবু লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েদের দেখছিল। কাগজটা কুড়িয়ে, একটু উবু হয়েই ঘরে ঢুকে গেলাম।

পাড়ায় ভাল ছেলে বলে আমার সুনাম আছে। কোনও দিন ঝুটঝামেলায় নিজেকে জড়াইনি। দাদার ছোটভাই হিসাবেই সবাই আমায় চেনে। সত্যি কথা বলতে কী, চন্দনাদির জন্য আমি কোনও দিন আড্ডা মারতে পারিনি। পুজোর পর পাড়ার ছেলেরা ভাসানে যেত। গঙ্গার ঘাট এমন কিছু দূরেও নয়। দিদিভাই আমাকে যেতে দিত না। একবার খুব জেদ ধরায়, নিজে রিকশা করে নিয়ে গেছিল। তখন বলত, "তুই ভাসানে যাবি কেন ? বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ালেই তো ভাসানের সব ঠাকুর দেখতে পাবি।" কথাটা তো মিথ্যে নয়। বিডন স্ট্রিট দিয়েই নর্থ ক্যালকাটার সব ঠাকুর ভাসানে যায়। দশমীর দিন সে এক দেখার মতো দৃশ্য। ওই দিন গুলু ওস্তাগর লেন থেকে শুভ আমাদের বাড়িতে চলে আসত। তখন অবশ্য আমি কলেজে পড়ি।

ঘরে ঢুকে, চান করার জন্য বাথরুমে যাওয়ার কথা ভাবছি, এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠে চন্দনাদি। পরনে সালোয়ার-কামিজ। বয়স কমে গেছে মনে হল। অনেকদিন পর চন্দনাদিকে এই পোশাকে দেখলাম। ঠাট্টা করে বললাম, "কী ব্যাপার, দিদিভাই ? হঠাৎ ভোল বদল করে ফেললে ?"

—আর তো পরতে পারব না। তাই এখন পরে নিচ্ছি।

—কেন, কোথাও চলে যাচ্ছ বুঝি ?

—বকিস না তো। সেদিন ডুব মারলি কেন রে ? ডিনারে যাব বলে তোকে ডাকতে এলাম। এসে দেখি, তুই হাওয়া।

সত্যি সত্যি সেদিন আমি কেটে পড়েছিলাম। দিদিভাইকে তাজ বেঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল রঞ্জনদার। আমাকে আর তিতলিকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল চন্দনাদির। কিন্তু আমি যাব কেন ? দেশবন্ধু পার্কে শ্যামবাজার টেনিসের ফাইনাল সেদিন। এক সময় আমিও ওখানে টেনিস খেলতাম। বিকেলবেলায় ওখানে গিয়ে বসে ছিলাম। চন্দনাদি এখনও ভোলেনি। তাই বললাম, "কেমন হল,

তোমাদের ডিনার ?"

—তুই গেলি না। তিতলিও লাস্ট মোমেন্টে বেঁকে বসল। আমরা দু'জন একা একা খেয়ে ফিরে এলাম।

তিতলিটার তা হলে বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে। যায়নি। বললাম, "কী দিল রঞ্জনদা সেদিন তোমায় ?"

—তোকে বলব কেন ?

—ঠিক আছে বোলো না। তবে দেওয়ার সময়, কী ডায়লগ দিল, সেটা অন্তত বলো।

—ভাই, তুই কিন্তু খুব পেকে গেছিস।

—পেকে তো যাবই। বয়স কম হল নাকি ? ঠিক সময়ে তোমরা আমার বিয়ে দিলে...এতদিনে তুমি পিসি হয়ে যেতে।

ভেবেছিলাম, দিদিভাই রেগে উঠবে। কিন্তু রাগল না। বলল, "আর ক'টা দিন অপেক্ষা কর। বাবা বলছিল, জষ্ঠিমাসেই তোর গলায় তিতলিকে ঝুলিয়ে দেবে।"

—আমি কি ল্যাম্প পোস্ট যে আমার গলায় ঝুলিয়ে দেবে ?

—ফাজলামো করিস না তো। আমার আশীর্বাদের দিন তিতলির সঙ্গে তোর কী হয়েছিল রে ?

—কিচ্ছু হয়নি।

—তবে যে ঝিমলি আমায় বলছিল, তোর সঙ্গে ঝগড়া করেছে।

—তোমার বোনকে জিজ্ঞেস করেছ ? সে কী বলছে ?

—সে এখন বাবার সঙ্গে বসে দাবা খেলছে।

—কী বললে ? সূর্য কি আজকাল পূর্ব দিকে ডুবছে ?

—না রে, তিতলিটা একদম পাল্টে গেছে।

—কী রকম, শুনি।

—এখন আর জেদাজেদি করে না। বাড়ি থেকে হুটহাট বেরিয়ে যায় না। জানিস, মায়ের কাছে রান্না পর্যন্ত শিখছে।

—তা হলে ওর টিভি সিরিয়াল ? আমার কাছ থেকে যে টাকা নিয়ে গেল সিরিয়ালের নাম করে ?

—কী জানি। সে দিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, ঋষির সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে।

—আমার টাকাটা জলে গেল বোধহয়।

—তুই আমার কাছ থেকে নিয়ে নিস।

—মাথা খারাপ। রঞ্জনদা এসে তার পর ধরুক আর কী।

—জানিস, আমার না খুব ভয় ভয় করছে।

—আমারও।

—তোর ? কেন ?

—বিয়ের পর যদি রঞ্জনদা ফের বিগড়ে যায় ! এমনিতেই তো একটু পাগলাটে। যদি তোমাকে আর ভাল না বাসে ?

—তা হলে কী হবে রে আমার ?

—কোনও ভয় নেই। রোজ ভাইফোঁটা দেওয়ার জন্য আমি রেখে দেব তোমায়।

—ইয়ার্কি মারিস না ভাই।

—এক কাজ কোরো দিদিভাই। রঞ্জনদাকে ঘরজামাই করে রাখো।

—কেন, তুই তো আছিসই।

—মামদোবাজি নাকি ? ঋচীক বোস কারও ঘরজামাই হয়ে থাকবে না। অলরেডি সে অন্য মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছে।

—কে রে ?

—এখন মেন্টাল নার্সিং হোমে আছে।

—বাছতে তা'লে ভুল করিসনি। ওখানকার মেয়েই তোর উপযুক্ত।

—বিশ্বাস করলে না তো ? যখন নিয়ে আসব, দেখতে পাবে।

—তোর মা জানে ?

—এখনও কিছু বলিনি।

—তুই কি সত্যি বলছিস, ভাই ?

—হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে চন্দনাদি বলল, "এ সব তুই করতে যাস না ভাই। অনেক লোককে তুই কষ্ট দিবি।"

—যেমন ?

—যেমন তিতলি, বাবা, মা। ওরা তো ধরেই নিয়েছে, তিতলির সঙ্গে...

—ধরে নিলে আমি কী করতে পারি বলো ?

—তিতলির মতো ড্যাশি মেয়ে তুই পাবি ?

চন্দনাদির গলায় সামান্য রাগ। এখনও বুঝতে পারছে না, আমি সত্যি কথা বলছি, না ঠাট্টা করে যাচ্ছি। বললাম, "কত ফি নিচ্ছ আজকাল ?"

—কীসের ফি ?

—এই ঘটকালির।

—ইয়ার্কি ছাড়। একে নিজের জ্বালায় মরছি। তার উপর ঢুকল তিতলির চিন্তা।

—তোমার আবার কীসের জ্বালা ? আর কদিন পর তো হাওয়ায় উড়বে। বিয়ের পর চিনতে পারবে আমাকে ?

—না রে ভাই, সত্যি সত্যি চিন্তা হচ্ছে।

—তোমার চিন্তার শেষ আছে ? হয়তো রঞ্জনদা তোমায় আদর করছে...এমন সময় তোমার মাথায় চিন্তা ঢুকল...এ মা, ভাইয়ের পাখি আর খরগোসগুলোকে তো আজ রুমকি খাবার দেয়নি...ব্যস...

—ভাই, তুই একটা যাচ্ছেতাই। তোর সঙ্গে আর কথা বলা যাবে না।

রাগ করে চন্দনাদি বেরিয়ে গেল।

॥ দশ ॥

খবরটা এসে দিল রুমকি, "তোমার সেই পুলিশ-বন্ধুটা ফোন করেছে।"

পুলিশ-বন্ধু মানে অতীন। আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। এখন আমাদের থানার ও সি। সুদীপার সঙ্গে অতীনের গভীর প্রেম ছিল একটা সময়। তাড়াতাড়ি কর্ডলেসটা হাতে নিলাম। কাল রাতে মায়ের ঘরে বসে গল্প করছিলাম। সেই সময় সুমিতাভ ফোন করেছিল। কর্ডলেসটা মায়ের ঘরেই পড়ে ছিল। সুমিতাভ এখুনি আসবে। দু'জনে মিলে যাওয়ার কথা আর্কিটেক্টের বাড়িতে। জামা-প্যান্ট পরে তাই নীচের ঘরে বসে আছি। আর পাঁচ মিনিট পর ফোন করলে অতীন আমাকে পেত না। ওর সঙ্গে মাঝে বেশ কিছুদিন যোগাযোগ নেই। হঠাৎ ফোন ? দেবার সেই ব্যাঙ্ক ফ্রড নিয়ে ফের কোনও ঝামেলা হল নাকি ?

ফোনে আমার গলা শুনেই অতীন বলল, "ঋচীক, তোর সঙ্গে জরুরি একটা কথা আছে।"

বুকটা ধক করে উঠল। বললাম, "কী ব্যাপার রে ?"

—সুমিতাভ ব্যানার্জি বলে কাউকে চিনিস ?

—হ্যাঁ। আমার বিজনেস পার্টনার।

—কেমন ছেলে রে ?

—ভাল। কেন ?

—ছেলেটার বিরুদ্ধে সিরিয়াস একটা চার্জ আছে।

—কী বলছিস তুই ? চার্জটা কী ?

—বধূ নির্যাতন। লালবাজার থেকে আমার ওপর ইলট্রাকশন এসেছে, ছেলেটাকে অ্যারেস্ট করার জন্য।

—মাই গড। ওর বিরুদ্ধে কমপ্লেনটা কার ?

—ওর স্ত্রী, রমলা ব্যানার্জির। ইন ফ্যাক্ট রমলা ব্যানার্জি অ্যাটেম্পট টু মার্ডারের কমপ্লেনও করেছে।

অতীনের কথা শুনে আমি ধপ করে সোফায় বসে পড়লাম। বধূ নির্যাতনের অভিযোগ মানে মারাত্মক ব্যাপার। পুলিশ কারও কথা শুনবে না। আগে অ্যারেস্ট করবে। এই কেসে চট করে জামিন পাওয়া মুশকিল। কিন্তু সুমিতাভ অ্যারেস্ট হলে আমার বিপদ। আমাদের প্রোজেক্টে বিরাট ঝাড়। প্রচুর টাকা ঢেলেছি। ঠিক সময়ে কাজ শেষ করতে না পারলে প্রফিট কমে যাবে।

কোনও রকমে বললাম, "রমলা এই কমপ্লেন করেছে ?"

অতীন বলল, "হ্যাঁ। আমি নিজে ইনভেস্টিগেশনে গেছিলাম। রমলা ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলেছি। কথায় কথায় উনিই তখন তোর নামটা করলেন।"

—রমলা এখন কোথায় ?

—বাপের বাড়িতে। গরাণহাটায়। উনি যা বললেন, তাতে মনে হচ্ছে সুমিতাভ ছেলেটা প্যারানয়েড টাইপের। প্রচণ্ড সন্দেহবাতিক। ইদানীং মারধরও করত। জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে ভদ্রমহিলার। তুই কিছু জানিস ?"

আমি জানি, সুমিতাভর সঙ্গে রমলার সম্পর্ক ইদানীং ভাল যাচ্ছিল না। রমলার

কথা জিজ্ঞাসা করলে এড়িয়ে যেত। কিন্তু এ নিয়ে যে থানা-পুলিশ হবে, ভাবতেও পারিনি। ওদের পয়সাকড়ির অভাব নেই। হরি ঘোষ স্ট্রিটে বিশাল বাড়ি। জয়েন্ট ফ্যামিলি। সুমিতাভর আরও দুই দাদা আর বউদি আছে। প্রেম করে বিয়ে ওদের। বাড়ির অমতে। বিয়েতে সাক্ষীও দিয়েছিলাম আমি। পরে ওর পার্সোনাল লাইফ নিয়ে অবশ্য কোনওদিন মাথা ঘামাইনি। ওর বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান হলে গেছি। রমলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ভাল।

অতীনকে বললাম, "ওর কনজুগাল লাইফ যে ভাল যাচ্ছিল না বুঝতাম। তবে সুমিতাভ ওর বউকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে, এটা বিশ্বাস হয় না।"

—আমি অন্তত জানি না।

—ছেলেটা নাকি প্রায়ই শোভাবাজারে একটা মেয়ের বাড়িতে যায়। নাম নন্দিনী। এ ছাড়া ফড়েপুকুরেও একটা ফ্ল্যাটে রোজ যাতায়াত করে।

নন্দিনীর নামটা শুনেই বুঝতে পারলাম ফালতু অভিযোগ। বললাম, "নন্দিনী মেয়েটা আমাদের টাইপিস্ট। সুমিতাভকে দাদার মতো দেখে। ওর কথা কে বলল তোকে?"

—কে আবার? রমলা ব্যানার্জি। ওর কিন্তু অন্য ধারণা।

—ভুল। অতীন, আমার মনে হয়, কোনও স্ট্রং অ্যাকশন নেওয়ার আগে তুই একটু কথা বল সুমিতাভর সঙ্গে। ও স্ট্রেটকাট ছেলে। যদি প্যারানয়েড হত, তা হলে আমি অন্তত বুঝতে পারতাম।

—ছেলেটাকে আমার কাছে ধরে আনতে পারবি? ওর স্ত্রীকেও ডেকে পাঠাব তা হলে। থানায় বসে মিটমাট করা যায় কি না, একবার দেখি।

—সেটাই ভাল হবে। যাক গে, তোর খবর কী বল।

—চলছে। আরে হ্যাঁ, তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সেদিন হঠাৎ গড়িয়াহাটে দেখা সুদীপার সঙ্গে। তোর সম্পর্কে একটা খবর দিল। সত্যি নাকি রে?

—কী খবর রে?

—তুই নাকি এক সাইকিক পেশেন্টের প্রেমে পড়েছিস?

হেসে বললাম, "সুদীপা আর কী বলল?"

—বলল, মেয়েটাকে যদি তুই বিয়ে করিস, লাইফ হেল হয়ে যাবে।

—ঠিকই বলেছে।

—তুই শালা প্রেম করার আর মেয়ে পেলি না?

—জুটল না রে।

—যা করবি, ভেবেচিন্তে করিস ভাই। তুই সেই গুডবয়ই রয়ে গেলি।

—সুদীপার সঙ্গে তোর পুনর্মিলন কেমন হল, সেটা তো বললি না।

—শুনলে তো তুই কানে আঙুল দিবি। ছাড়ি রে। সুমিতাভকে তা হলে আমার কথা বলিস।

—বলব।

অতীন ফোনটা ছাড়ার পর চুপ করে বসে রইলাম। সুদীপা তা হলে সবার কাছে মুনের কথা বলে বেড়াচ্ছে। বলুক, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না। অতীন যা বলল, তাতে মনে হচ্ছে সুদীপার সঙ্গে ফের ওর সম্পর্কটা গাঢ় হয়েছে। একটা সময়

তো বেশ গভীরই ছিল। কেন সেই সম্পর্কটা ভেঙে গেছিল, ওরা কেউ পরিষ্কার করে বলেনি। সুদীপাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও বলেছিল, "অতীনটা ব্যাটাছেলে কি না, আমার সন্দেহ আছে।" পরে অতীনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। ও বলেছিল, "শি ইজ এ ব্লাডি হোর। হাতির খিদে বুঝলি। ওকে স্যাটিসফাই করা, আমার পক্ষে অসম্ভব।" তখন আমি কিছুই বুঝিনি। তবে দু'জন যে ভাবে উত্তর দিয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল, পরস্পরের প্রতি অসম্ভব ঘৃণা জমা করে রেখেছে। ওরা যে আবার দেখা-সাক্ষাৎ করছে, এটা শুনেই আমার অবাক লাগল। জগতে তা হলে সবই সম্ভব!

সুদীপা-অতীনের কথা মন থেকে চলে যেতেই রমলার মুখটা ভেসে উঠল। সুমিতাভ সম্পর্কে অনেক দিন আগে রমলা একবার আমার কাছে অভিযোগ করেছিল। কী একটা অনুষ্ঠানে ওদের বাড়ি গেছিলাম। হঠাৎ একা পেয়ে রমলা আমাকে বলেছিল, "আপনার পার্টনারের এত সন্দেহবাতিক কেন ঋচীকদা?"

আমি বলেছিলাম, "যাঃ, কী বলছ?"

—ঠিকই বলছি। কারও সঙ্গে কথা বলতে দেবে না। ছাদে উঠতে দেবে না। একা বাইরে যেত দেবে না। এমন লোক, হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে যদি দেখে পর্দাটা সামান্য সরানো, তা হলেই প্রশ্ন শুরু করবে, পর্দা কেন সরানো? কে এসেছিল? কাকে দেখছিলে?

শুনে হাসি পেয়েছিল। এখনকার যুগে এই ধরনের লোক আছে নাকি? আমাকে হাসতে দেখে রমলা ফের বলেছিল, "হাসছেন? তা হলে শুনুন। দিল্লি থেকে একদিন আমার জামাইবাবু এলেন। উনি আমার কাকার বয়সী। একটা সময় কোলে নিয়েছেন। সেদিন উনি এসে আমায় আলতো করে জড়িয়ে ধরেছিলেন। পরে, তা নিয়ে সুমিতাভ যে সব নোংরা কথা বলেছে, তা শুনলে কানে আঙুল দেবেন। বলেছে, জামাইবাবুর সঙ্গে নাকি আমি শুতাম।" এই সব কথা বলতে বলতে রমলা সে দিন কেঁদে ফেলেছিল।

পরে একদিন সুযোগ পেয়ে একবার সুমিতাভকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "হ্যাঁ রে, রমলার চেহারাটা এত খারাপ হয়ে গেল কেন রে?

সুমিতাভ তাচ্ছিল্য করে উত্তর দিয়েছিল, "মনে মনে কূট প্রকৃতির হলে, চেহারা খারাপ হবেই।"

—কী রকম?

—আর বলিস না। দিনে দশবার খোঁজ নেবে, আমি কোথায়? ওর যত সন্দেহ নন্দিনীকে নিয়ে। জানিস, বাড়িতে কাজের মেয়েটার সঙ্গে কথা বললেও ও চটে যায়। উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে। সে সহ্য করবে কেন? সে দিন কাজ ছেড়ে চলে গেল।

—এ সব সন্দেহ খারাপ। বাড়তে দিস না।

—কেন? ও কি তোকে কিছু বলেছে? ওর সঙ্গে ফোনে তোর কথাবার্তা হয় নাকি?

তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলাম, "না, না। কোথায় যেন মায়ের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। সেদিন মা-ই আমাকে বলছিল।"

—রমুর এত সন্দেহবাতিক, জানলে বিয়েই করতাম না।

—কেন, কী আবার হল ?

—সে দিন টকি শো হাউসের উল্টো দিকে, ফড়েপুকুরের একটা ফ্ল্যাটে দেখা করতে গেছিলাম একজনের সঙ্গে। হয়তো দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম কোনও মেয়ের সঙ্গে। আমার মনেও নেই। মেজ বউদি সিনেমা দেখতে গেছিল বোধহয়। চোখে পড়েছে। বাড়ি ফিরে ঠাট্টা করে কথাটা বলায় রমলার মুখ গম্ভীর। লাইফ হেল করে দিল আমার তা নিয়ে।

সুমিতাভকে সেদিন বলেছিলাম, "এই সব সন্দেহ বাড়তে দিস না। আসলে তুই সময় দিচ্ছিস না রমলাকে। কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকিস। মাঝেমধ্যে একটু সময় বের করে নে।"

—তুই বলছিস বেশ। সাইটে পড়ে না থাকলে কাজ উঠবে ? লেবারদের হ্যান্ডেল করা কী কঠিন, তুই তো দেখছিস। শালা, আমার সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে টাকার পেছনে দৌড়চ্ছি...থিয়েটার করা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছি...এত শখ ছিল...আর ও বাড়িতে বসে খাচ্ছে, বিউটি পার্লারে গিয়ে টাকা নষ্ট করছে..."

সুমিতাভর মুখে এ সব শুনে, সে দিন আমি আর কথা বাড়াইনি। কিন্তু এখন দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা যেখানে গেছে, সুমিতাভর সঙ্গে আমাকে কথা বলতেই হবে। সন্দেহ জিনিসটা খুব খারাপ। এর জন্য সম্পর্কটা একবার ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগানো বেশ কঠিন। সেবায় ডাক্তার ব্যানার্জির ওখানে বসে মাঝেমধ্যে এ সব কেস দেখি। প্যারানয়েড পেশেন্ট। খুন-খারাপি পর্যন্ত গড়ায়। এও এক ধরনের মানসিক রোগ। সাইকোথেরাপি দরকার। হঠাৎই মনে হল, সুমিতাভকে সেবায় নিয়ে গেলে কেমন হয় ? ও অবশ্য প্রচণ্ড ইগোইস্ট। ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে যেতে চাইলে, কিছুতেই যাবে না। উল্টে বলবে, রমলাকে নিয়ে যা। আমাকে একটু চালাকি করতে হবে। মুনকে দেখানোর কথা বলে, সুমিতাভকে নিয়ে যেতে হবে। তবে তার আগে ডাক্তার ব্যানার্জিকে পুরো ঘটনা বলা দরকার।

আজই আমার সেবায় যাওয়ার কথা। আর্কিটেক্টের বাড়ি ঘুরে দু'জনে একবার সাইটে যাব। সুমিতাভকে নামিয়ে তার পর যাব সেবায়। চন্দনাদিকে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়েছে রঞ্জনদা। বিয়ের পর হনিমুন করতে সিঙ্গাপুর গিয়েছিল। ফিরে যখন এল, তখন খুব সুন্দর লাগছিল চন্দনাদিকে। ইদানীং কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার চোখে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ না। মাঝে একদিন এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। সন্ধেবেলার দিকে রঞ্জনদা গল্প করতে এল আমার সঙ্গে। তখন কথায় কথায় হঠাৎ বলে ফেলল, "তোমার দিদিভাইকে একবার ডাক্তার দেখানো দরকার বুবুন।"

ডাক্তার মানে, ভাবলাম বোধহয় গায়নোকোলজিস্টের কথা বলছে। খুব হালকা ভাবেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কী হয়েছে দিদিভাইয়ের ?"

রঞ্জনদা বলল, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই। অসম্ভব ভয় পাচ্ছে আরশোলা দেখলে।"

কথাটা শুনেই আমার মনে হয়েছিল, ফোবিক ডিসঅর্ডার। সেবায় গিয়ে গিয়ে আজকাল আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, এই সব রোগের নাম। আরশোলা, টিকটিকি বা কীটপতঙ্গ দেখে ভয় পাওয়া—এক ধরনের মানসিক রোগ। অনেকের মধ্যে আছে।

কেউ গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু দেখেছি, এই ভয় পাওয়ার পিছনে গুরুতর কোনও কারণ লুকিয়ে রয়েছে। সাইকোথেরাপি করলে সেটা নির্মূল করা যায়। কিছুদিন আগে, আউটডোরে একটা মেয়ে এসেছিল তার মায়ের সঙ্গে। সদ্য বিয়ে হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে নাকি বনিবনা হচ্ছে না।

কেন শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চাইছে না, মেয়েটা কিছুতেই আর বলে না। ডাক্তার ব্যানার্জি কথা বলতে বললেন প্রতিমাদিকে। দিন দুই কথা বলার পরও তার পেট থেকে কিছু বের করা গেল না। তখন আসতে বলা হল তার স্বামীকে। ছেলেটা একদিন এল। বেশ স্মার্ট, হাউসিং ডিপার্টমেন্টের চাকুরে। ছেলেটাই ডাক্তার ব্যানার্জির সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ বলে ফেলল, "জানেন ডাক্তারবাবু, আমাদের সেক্সচুয়াল লাইফ, বলতে গেলে শুরুই হয়নি। রাতে শোয়ার পর ওর গায়ে হাত দিলে কেমন যেন সিঁটিয়ে যায়। ওর তরফ থেকে কোনও তাগিদ দেখতে পাই না।"

পরে মেয়েটাও প্রতিমাদির কাছে স্বীকার করল, "আমার যখন তেরো-চোদ্দো বছর বয়স, তখন দুটো টিকটিকিকে ইন্টারকোর্স করতে দেখেছিলাম। কেন জানি না, সেদিন থেকেই টিকটিকি দেখলে আমার ভয় লাগে। বিয়ের পর, ও যেদিন প্রথম আমাকে চাইল, হঠাৎ আমার সেই টিকটিকির কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরটা ঠাণ্ডা মেরে গেল। ও দু'চারদিন জোর করে...আমার খুব ব্যথা লেগেছে। সেই ভয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে পারিনি।"

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর, প্রতিমাদির কাছে সব শুনে ডাক্তার ব্যানার্জি বলেছিলেন, "এই রকমই কিছু আমি আন্দাজ করেছিলাম। মেয়েটার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়েছ? নিশ্চয়ই বাবা অথবা মা-কে প্রচণ্ড ভয় পেত?"

—হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। বাবাকে।

—ঠিকই আছে। সেই ভয়টাই ওর অবচেতন মনে রয়ে গেছে। বিয়ের পর সেই ভয় এ ক্ষেত্রে একটা স্মল অবজেক্টে বাসা বেঁধে নিয়েছে। কারও ক্ষেত্রে এটা আরশোলা হতে পারে, কারও ক্ষেত্রে টিকটিকি। সেটাই সেক্স লাইফকে ডিসটার্ব করছে। মেয়েটাকে ফ্রিজিড করে দিচ্ছে। এই ভয়টাকেই তাড়িয়ে দেওয়া দরকার।

ধীরে ধীরে সেই ভয়টাকে কেমনভাবে তাড়ানো হয়, তার পদ্ধতিগুলো দেখেছি। প্রথম দিন মেয়েটাকে শম্পার কাছে বসিয়ে দিলেন প্রতিমাদি। হোমের মেয়েরা যে ঘরে হাতের কাজ শেখে, সেখানে। শম্পা আঁকা শেখাতে লাগল মেয়েটাকে। আঁকিবুকি থেকে হঠাৎ ফুটে উঠল টিকটিকি। প্রথমবার মেয়েটা চমকে গেল। চোখ বন্ধ করে ফেলল। কিন্তু শম্পা বোঝাতে লাগল, "এটা তো ছবি। ভয় পাওয়ার কী আছে। তুমিও আঁকার চেষ্টা করো না ভাই।" কয়েকদিন পর দেখলাম, মেয়েটা দিব্যি টিকটিকির ছবি আঁকছে।"

সেবায় এ সব ট্রিটমেন্ট দেখে আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। সে দিন রঞ্জনদাকে আমিই ডাক্তার ব্যানার্জির কথা বলি। আজ চন্দনাদিকে ওখানে নিয়ে যাবে রঞ্জনদা। সুমিতাভর সঙ্গে কাজটা সেরে আমারও সেবায় যাওয়ার কথা। হাতঘড়িতে দেখলাম, বেলা এগারোটা। অনেক সময় আছে। অনেকক্ষণ বাবলুটার কোনও পাত্তা নেই। ইদানীং মাঝেমধ্যে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কোথায় ঘোরে, কে জানে? বাবলু যদি না আসে, গাড়িটা নিয়ে আমাকেই আজ বেরোতে হবে। অতীনের ফোনটা এসে সব

গণ্ডগোল করে দিল। ফোনে আমাকে কথা বলতে দেখে, বাবলুটা বোধহয় কোথাও দাদাগিরিতে ব্যস্ত।

ভেতরের দিকে পা বাড়াব, এমন সময় দেখি তিতলি। দেখেই ঠিক করে নিলাম, তাড়াতাড়ি কাটিয়ে দিতে হবে। পরনে নীল রঙের শাড়ি, ম্যাচিং ব্লাউজ। চুলে ফ্রেঞ্চ রোল। কাঁধে একটা চামড়ার ব্যাগ। মনে হল, কোথাও বেরোচ্ছে। ঘরে ঢুকে হাসিমুখে তিতলি বলল, "দিন কয়েকের জন্য বহরমপুর যাচ্ছি। মাঝেমধ্যে ও বাড়ির একটু খোঁজখবর নিয়ো।"

বাড়ির জন্য ওর এত চিন্তা ? একটু অবাক হওয়া সত্ত্বেও বললাম, "কদিনের জন্য যাচ্ছিস ?"

—যতদিন ভাল লাগে থাকব।

—হঠাৎ ! এখানে ভাল লাগছে না বুঝি।

—একদম না।

—কেন ?

—জানি না। আসলে দিদির বিয়ের পর থেকে বেকার হয়ে গেছি।

—বহরমপুরে গিয়েই বা কী করবি ? ওখানে তো লোকজন আরও কম।

—বসে বসে ভাবব, এখন আমার কী করা উচিত।

—তোদের সেই সিরিয়ালের কী হল ?

—ডকে উঠে গেছে। ঋষিটা একটা ফালতু আঁতেল। ওর কথা শুনে তোমার টাকাটা আমি জলে দিলাম।

—তার মানে ফেরত পাওয়ার কোনও চান্স নেই।

—মনে হয়, না।

—মানুষ চিনতে তুই এত ভুল করিস কেন ?

—উল্টোটাও হতে পারে। আমাকে চিনতেই লোকে ভুল করে বোধহয়। ভাবছি, বাইরে কোথাও চলে যাব।

—কোথায় যাবি ?

—স্টেটসে। করেসপন্ডেন্স করছি। লেগে একটা যাবেই।

—কাকাবাবু ছাড়বে ?

—না ছাড়ার তো কারণ নেই। আমার সঙ্গে ট্রুস হয়ে গেছে।

—আমার কিন্তু মনে হয় না।

—কী করব বলো, বাবা যা চায়, তা হবে না। আমি যাই চাই, তাও হবে না।

—তুই কী চাস, নিজে জানিস ?

—দেখো বুবুনদা, ছোটবেলা থেকে আমি যা চেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছি। দিদির থেকে আমি অনেক বেশি লাকি। দিদি খুব ভয় পেত বাবাকে। কিছু চাইতে পারত না। আমি কোনওদিন ভয় পাইনি। আদায় করে নিয়েছি। এখন দেখছি, জীবনে এমন অনেক কিছু আছে, যা চেয়ে পাওয়া যায় না। তবু মাঝেমধ্যে রাগ হয়। তখনই পাগলামো করে ফেলি।

—সূর্য আজ কোনদিকে উঠেছে রে ?

—ঠাট্টা করছ ? করো। হ্যাঁ, যে কারণে তোমার কাছে এলাম। বাবলুকে একটু

বলবে আমায় শেয়ালদায় পৌঁছে দিতে ?

—ক'টার ট্রেনে যাবি ?

—একটা পঞ্চাশ।

—তোদের গাড়ি কী হল ?

—বাবা কোর্টে নিয়ে গেছে। আসলে বাবাকে বলিনি বহরমপুরে যাচ্ছি। গাড়ি চাইলে নানা কৈফিয়ত দিতে হত।

—এটাও তোর এক ধরনের পাগলামি। কাকাবাবুকে ট্রাবল দেওয়া।

—কেন, ট্রাবলের কী আছে ? তোমাকে তো বলে গেলাম। তুমি না হয় বলে দিয়ো।

—বহরমপুরেই যে যাচ্ছিস, তার প্রমাণ কী ?

—বিশ্বাস হচ্ছে না ? ঠিক আছে গিয়ে তোমায় ফোন করব।

—টাকাপয়সা সঙ্গে আছে ?

—তেমন কিছু নেই। দিতে পারো।

—না গেলে নয় ? কাল সকালের ট্রেনেও তো যেতে পারিস।

—অত সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আমার নেই। তুমি তো জানো, আমি খুব লেজি।

—আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যাবি ?

—সূর্য আজ কোনদিকে উঠেছে বুবুনদা ? ঠিক আছে, জায়গাটা আগে শুনি, তারপর না হয় ডিসিশন নেব।

—মেন্টাল হোমে।

—জায়গাটার নাম শুনেই তিতলির চোখ-মুখ বদলে গেল। প্রচণ্ড রাগে হিসহিস করে বলল, "নিজেকে তুমি কী ভাবো বুবুনদা ? কোন দুঃখে আমি মেন্টাল হসপিটালে যাব ? তোমার কাছে আসাই আমার অন্যায় হয়েছে।

—রাগছিস কেন ? একটু বাদে আমি সত্যি সত্যিই একটা মেন্টাল হোমে যাচ্ছি।

—চন্দনাদিও ওখানে যাবে। ওদের ওখানে আজ একটা অনুষ্ঠান আছে।

তিতলির রাগ আরও বাড়ল, "তুমি যাও। তোমার চন্দনাদিকেও নিয়ে যাও। এর মধ্যে আমাকে আবার টানছ কেন ? অ্যাম আই লুনাটিক ? ডু আই লুক লাইক লুনাটিক ? বলো ?

—আমি কি তা বলেছি ?

—স্পষ্ট করে বলোনি। কিন্তু মিন করেছ। বাবাও আমাকে একবার সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। এখন বোধহয় তোমার সঙ্গে প্যাক্ট করেছে। এখন তুমি ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে।

এ বার আমি রাগতে শুরু করেছি, "কথাটা হচ্ছে তোর আর আমার মধ্যে। কাকাবাবুকে টানছিস কেন ?"

—তোমরা সবাই সমান। আই হেট ইউ। অল অব ইউ।

আর যাতে কথা না বাড়ে, সে জন্য পকেট থেকে পার্স বের করে কয়েকটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললাম, "নে। তোর ট্রেনের দেরি হয়ে যাবে।"

—বয়ে গেছে তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে। ওই টাকা তুমি মেন্টাল হোমে

দিয়ো।

এক পা এগিয়ে ওর হাতে টাকাগুলো গুঁজে দিয়ে বললাম, "এই কারণেই সবাই তোর ওপর চটে।"

—চটুক। আমার কিছু আসে-যায় না। বহরমপুরে আমি যাব না। কোথায় যাচ্ছি, কাউকেই বলব না। দেখি, তোমরা কেমন শান্তিতে থাকো, ক'টা দিন।

—সে তোর ইচ্ছে।

কথাটা বলে আর দাঁড়ালাম না। তিতলি ফের একটা সিন ক্রিয়েট করতে চাইছে। বাড়িতে রুমকিটা আছে। চোখে পড়লে, বিচ্ছিরি একটা ধারণা করবে। তিতলিকে নিয়ে আমার বেশ কয়েকদিন কথা হয়েছে ডাক্তার ব্যানার্জির সঙ্গে। সব কিছু খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করার পর উনি বলেছিলেন, "মেয়েটা ম্যাচোসিস্ট। এই ধরনের মেয়েরা আত্মনিপীড়ন করে যৌনসুখ পায়। মেয়েটাকে ট্রিটমেন্ট করা দরকার। একবার নিয়ে আসতে পারবে ঋচীকভাই?" তিতলিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আজই চাপ দিলে, ও আজেবাজে কথা বলত। আমি রেগে যেতাম। হয়তো গায়ে হাত তুলে ফেলতাম। কী দরকার, ফালতু ঝামেলায় নিজেকে জড়ানো?

মুনের সঙ্গে যত মিশছি, মনটা ততই শক্ত হয়ে যাচ্ছে। মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। মুন ফোন করে মাঝে মাঝে। মা বোধহয় বুঝতে পারে। একদিন আমাকে জিজ্ঞেসও করেছে, "মুন মেয়েটা কেমন আছে রে?" ভাল, বলে আমি অন্য কথায় চলে যাচ্ছিলাম। মা খুঁটিয়ে জানতে চাইল, ওদের পরিবারে আর কে কে আছে। একবার ভাবলাম, মাকে সব বলে দিই। কিন্তু কথায় কথায় এক সময় মা বলে ফেলল, "মনের রোগ সারা খুব মুশকিল রে।" ওই কথাটা শুনে আর আমি এগোইনি। মা তো জানে না, আজকাল নতুন নতুন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। সেরে যাওয়া সম্ভব।

এই তো, কয়েকদিন আগে সেবায় বসে গল্প করছি। হঠাৎ মানসবাবু সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন একটা মেয়েকে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। বিবাহিতা। ঘরে ঢুকে মানসবাবু বললেন, "ডাক্তার ব্যানার্জি, দেখুন কাকে নিয়ে এসেছি।"

ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "কী রে সুমনা। কেমন আছিস?"

—ভাল। অনেকদিন আসিনি। মন খারাপ করছিল। তাই একবার এলাম।"

—বেশ করেছিস। যা ওপরে ওদের সঙ্গে দেখা করে আয়।

মেয়েটা ওপরে চলে যেতেই ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "এই মেয়েটা আমাদের হোমের প্রথম পেশেন্ট। বছর খানেক এখানে ছিল। ভাল হয়ে ফিরে গেছে। বিয়ে থা হয়েছে। হাজব্যান্ড ব্যাঙ্কে চাকরি করে।"

মানসবাবু বললেন, "যখন এসেছি, তখনকার কথা মনে আছে ডাক্তার ব্যানার্জি? টোটালি ভায়োলেন্ট। রেশমিদিকে প্রথম দিন তো কামড়েই দিয়েছিল। সেই মেয়েকে আজ দেখলে চেনা যায় না।"

মানসবাবু সেবা-র সেক্রেটারি। স্কুল মাস্টার। বেহালারই কোনও একটা স্কুলে পড়ান। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয় খুব কম। দুপুরের দিকে উনি আসতে পারেন না। প্রথম পরিচয় অবশ্য ফোনে। আরতিকে যেদিন ক্যালকাটা হসপিটালে নিয়ে যাই, তার পরের দিন উনি আমাকে ফোন করে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। ভদ্রলোক খুব

কম কথা বলেন। কোনও ব্যাপারে সামনে আসেন না। কিন্তু সেবায় গিয়ে গিয়ে, এখন মনে হয়, ওই ভদ্রলোকই প্রতিষ্ঠানটার প্রাণ। টাকা-পয়সা জোগাড় করে, উনিই সেবা-কে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

সুমিতাভর অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে সেবা-র কথা ভাবছি। বেলা সাড়ে এগারোটা বাজতে চলল, এখনও ওর পাত্তা নেই। ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছি। টাইম দিলে সুমিতাভ কখনও দেরি করে না। কেন আসছে না, বুঝতে পারলাম না। ওর বাড়িতে ফোন করে লাভ নেই, অতীন বলে গেছে, ও বাড়িতে নেই। এর মধ্যে কোনও ঝামেলায় পড়ল না তো ? পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা। তবে পুলিশ মহলেও সুমিতাভর কম জানাশুনো নেই। ও ঠিক বেরিয়ে আসবে। এই সব ভাবনার মাঝেই হঠাৎ ফোন। সুমিতাভরই, "ঋচীক, আজ প্রোগ্রামটা ক্যানসেল করতে হবে।"

—কেন রে ? তোর জন্যই যে আমি বসে রয়েছি।

—সরি। একটা পার্সোনাল প্রবলেমে পড়েছি। পরে বলব। তুই তো আজ ঠাকুরপুকুরে যাবি, তাই না ? কখন ফিরবি রে ?

—বলতে পারছি না।

—ঘুরে আয়। সন্ধেবেলায় একবার ফোন করব।

ও প্রান্তে সুমিতাভর পাশে একটা মেয়ের গলা শুনতে পেলাম। বলল, "এই, সন্ধেবেলায় কী করে তুমি ফোন করবে ? সুজনের পার্টিতে যাবে না ?"

সুমিতাভ তাঁকে ফিসফিস করে কী যেন বলল। তার পর আমাকে বলল, "ঠিক আছে, তা হলে ছাড়ি ?"

—তুই কোত্থেকে ফোন করছিস ? তোর সঙ্গে আমার জরুরি দরকার।

—এখন ব্যস্ত রে। পরে শুনব। বলেই লাইনটা কেটে দিল সুমিতাভ।

মেয়েটা কে, বুঝতে পারলাম না। তা হলে ওর সম্পর্কে অতীন যা বলে গেল, সেটা ঠিক ? কে জানে ? মানুষ চেনা খুব মুশকিল। কাজ ছেড়ে সুমিতাভ কোনও মেয়ের সঙ্গে আড্ডা মারছে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না। মেয়েটা আর যে-ই হোক, নন্দিনী না। নন্দিনীর গলা আমি চিনি। মাঝেমধ্যেই ফোন করে আমাকে। এই মেয়েটার গলা একটু হাস্কি। রমলা তা হলে মিথ্যে সন্দেহ করেনি। আজই অতীন এসে ওদের ঝগড়ার কথা বলল। আর আজই সুমিতাভ আমার কাছে ধরা পড়ে গেল।

সুমিতাভ আর রমলার কথা মাথা থেকে সরিয়ে দিলাম। ফালতু দেরি করিয়ে দিল। গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে রওনা দিলাম ঠাকুরপুকুরের দিকে। সেবার দিকে যখন যাই, তখন খুব ভাল লাগে। আমি পৌঁছনো মাত্রই মুন ওপর থেকে নেমে আসে। আউটডোরে বসে দু'জনে গল্প করি। সেবায় সবাই জানে, আমাদের সম্পর্কটা। মাঝেমধ্যে পাপিয়া অথবা প্রতিমাদিও এসে বসে আড্ডায়। ঘণ্টাখানেক গল্প করে চলে আসি। ইদানীং লক্ষ করেছি, সুদীপাদের কথা উঠলেই মুন এড়িয়ে যায়। বোধহয় মুনকে নিয়ে কোনও মনোমালিন্য হয়েছে দুই ফ্যামিলিতে।

আমি জানি, কেন ডাক্তার ব্যানার্জি আমাকে এত প্রশ্রয় দেন। মুনকে আমার সঙ্গে মিশতে দেন। মাঝে একদিন খোলাখুলি বলেওছেন। একদিন গ্রুপ ডিসকাশন করছিলেন। সব পেশেন্টকে নিয়ে বসে কথা বলার সেশন। এটাও এক ধরনের

ট্রিটমেন্ট। কথা বলতে বলতে অনেকে হঠাৎ গোপন কথা বলে ফেলে। একেক দিন একেক রকম আলোচনা। বিষয়টা ভয়, ভালবাসা, রাগ, সাহস, রং—যে কোনও বিষয় নিয়ে হতে পারে। সে দিন কথা হচ্ছিল রং নিয়ে। হঠাৎ মুন বলল, "কালো রঙের কোট দেখলেই আমার ভয় করে।"

ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "কেন রে ? কালো রঙের কোট পরলে তো খুব স্মার্ট লাগে।"

—বিচ্ছিরি।

—ঋচীকভাই যদি কোনও দিন কালো স্যুট পরে আসে ?

—আমি কথাই বলব না।

—কালো কোট পরে কি কেউ তোকে ভয় দেখিয়েছিল ?

—মনে পড়ছে না।

—ওই সময় উমা হঠাৎ বলে উঠেছিল, "ডাক্তারবাবু, আমার কিন্তু কালো রঙের একটা কাশ্মীরি শাল ছিল। সেটা গায়ে দিয়ে আমি একবার বিয়ে বাড়িতে গেছিলাম।"

—কোথায় রে ?

—টালিগঞ্জে।

—কার বিয়ে ?

—মনে নেই।

—কে কিনে দিয়েছিল তোকে শালটা ?

—আমার বর।

—তাই নাকি ? কোত্থেকে কিনে দিয়েছিল মনে আছে ?

—শীতের সময় কাশ্মীর থেকে একটা ছেলে তখন শাল বিক্রি করতে আসত। সে-ই ছেলেটা মাসে একশো টাকা করে নিয়ে যেত।

—তুই কিনতে চেয়েছিলি, না তোকে বর কিনে দিয়েছিল ?

—আমার বর কিনে দিয়েছিল।

—তোর বর কী করত রে ?

—মনে নেই।

—তোরা কোথায় থাকতি ?

—তাও মনে নেই।

—তোর বরের নাম কী ছিল, মনে আছে ?

—না। তাও মনে নেই।

ডাক্তার ব্যানার্জি তখন চোখাচোখি করেছিলেন প্রতিমাদির সঙ্গে। সে দিন গ্রুপ ডিসকাশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর বলেছিলেন, "আজ একটা নতুন ইনফর্মেশন পাওয়া গেল। উমা ম্যারেড।"

প্রতিমাদি বললেন, "জেল থেকে ওর যা কেস হিস্ট্রি পাঠিয়েছে, তাতে কিন্তু কোথাও লেখা নেই। এর আগে অনেকদিন আমি জিজ্ঞেস করেছি। কখনও বলেনি।"

—গ্রুপ ডিসকাশনে এটাই লাভ। দেখলে, হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে এল কী রকম।

প্রতিমা, তুমি ছেড়ো না। ওর বরের কথা পেট থেকে বের করো। যদি খোঁজ পাওয়া যায়, তা হলে হয়তো বাড়িতে ফিরে গেলেও যেতে পারে।

—আমি চেষ্টা করব।

ডাক্তার ব্যানার্জি এ বার আমাকে বলেছিলেন, "ঋচীকভাই, তুমি একটা কাজ করতে পারবে?"

—বলুন।

—মুনের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করো, কালো রঙের কোট দেখে ও এত ভয় পায় কেন? না, সরাসরি জানতে চেয়ো না। বলবে না। কথাটা অন্যভাবে বোলো।

—ঠিক আছে।

তার পর থেকে দু'একদিন চেষ্টা করেছি। কিন্তু মুন উত্তর দেয়নি। আজ ঠিক করেই যাচ্ছি, ফের জিজ্ঞেস করব। আমাকে জানতেই হবে, রহস্যটা কী। জানতে না পারলে মুন ভাল হবে না। সেটা আমি বুঝে গেছি। উমা এখন ভাল হওয়ার পথে। প্রতিমাদি অনেক কিছু জানতে পেরে গেছেন। উমার বাড়ি ছিল বর্ধমানে। বাড়ির অমতে বিয়ে করে পালিয়ে এসেছিল হাওড়ায়। বর তেমন রোজগারপাতি করত না। ছোট্ট একটা লেদ মেশিনের কারখানায় চাকরি জুটিয়েছিল। বছর খানেকের মধ্যে উমাকে ফেলে পালাল। উপায় না দেখে উমা তখন ওর দিদির বাড়ি যায়। সেখান থেকে কী ভাবে ও প্রেসিডেন্সি জেলে গেল, সেটা ওর মনে নেই।

মাঝে প্রতিমাদি একদিন ডাক্তার ব্যানার্জিকে বলছিলেন, "উমার জামাইবাবুর কাছে কাউকে পাঠানো যাক। হয়তো উনি রেসপন্স করবেন।"

ডাক্তার ব্যানার্জি তখন বললেন, "মন্দ কী। তা হলে সুজিতকেই পাঠানো যাক।"

সুজিত গেছে কি না, জানি না। আমার খুব কৌতূহল, এ নিয়ে। সাধারণত, এ সব কেসে বাড়ির লোক পেশেন্টকে ফিরিয়ে নিতে চায় না। সামাজিক লজ্জা তো আছেই, তার উপর চিকিৎসার এক ঝঞ্ঝাট। উমার ভাগ্যে কী আছে, কে জানে? মেয়েটা দেখতে বেশ সুশ্রী। এই সেই মেয়েটা, যার উরুতে ঘা। প্রথম দিন আমার সামনেই স্কার্ট তুলে, প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় প্রতিমাদিকে ঘা দেখিয়েছিল। তখন ওর বোধশক্তি ছিল না। সেবায় যত্ন পেয়ে এখন অনেক স্বাভাবিক।

সেবায় যখন পৌঁছলাম, বেলা তখন দেড়টা। নীচে আউটডোরে বসে মানসবাবুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন ডাক্তার ব্যানার্জি। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। এই পোশাকে কখনও ওঁকে দেখিনি। বয়স যেন কমে গেছে। উল্টো দিকের সোফায় বসে চন্দনাদি আর রঞ্জনদা। চেয়ারে প্রতিমাদি। আমাকে দেখেই ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "কী ব্যাপার ঋচীকভাই, আজ এত লেট?"

বললাম, "মাঝেরহাটে ট্রাম ডিরেলইড হয়েছে। ট্রাফিক জ্যাম।"

—তোমার চন্দনাদি তো তোমার উপর খেপে গেছেন।

চন্দনাদির দিকে তাকিয়ে আমি হাসলাম। আমার উপর রাগ? কতক্ষণ থাকবে? এখুনি ভিজিয়ে দেওয়া যাবে। কী একটা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় পর্দা সরিয়ে মুন ঘরে ঢুকল। পরনে প্রিন্ট কালারের জামদানি শাড়ি। চুল টান করে করে বাঁধা। রাজেন্দ্রাণীর মতো লাগছে। হলঘরটা যেন ঝলমল করে উঠল। মুনের হাতে একটা ট্রে। তাতে চায়ের কাপ। ওকে দেখেই, ডাক্তার ব্যানার্জি ফুট কাটলেন, "মিস

বহরমপুর এসে গেল।"

ইশারায় দেখিয়ে দিলাম। চন্দনাদি অবাক হয়ে মুনকে দেখছে। ডাক্তারবাবুর মন্তব্যটা শুনে আমাকে বলল, "এই মেয়েটা আমাদের ওখানকার নাকি রে?"

—হ্যাঁ, গোরাবাজারের।

—তাই এত মিষ্টি দেখতে।

॥ এগারো ॥

বহরমপুর থেকে প্রসাদকাকা এসেছেন। বিভা এসে বলল, "কত্তাবাবু, তোমায় ডাকছে দাদাবাবু। এখখুনি চলো।"

কত্তাবাবু মানে, কাকাবাবু। নিশ্চয়ই জরুরি দরকার। না হলে এ সময় ডেকে পাঠাতেন না। তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বেশ গরম পড়ে গেছে। সকাল থেকে লোডশেডিং। তাই ঘামছি। আমাদের এ অঞ্চলে সাধারণত লোডশেডিং হয় না। আশপাশে হাসপাতাল আছে। তবু কেন হল, জানি না।

চেম্বারে বসে রয়েছেন কাকাবাবু। উল্টো দিকের চেয়ারে প্রসাদকাকা। আমাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে দেখে দু'জনে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ঘরে ঢুকতেই কাকাবাবু বললেন, "বুবুন, শোনো, প্রসাদ কী খবর নিয়ে এসেছে। এই মেয়েটা কি সারাজীবন আমাকে ট্রাবল দিয়ে যাবে?"

—কী হল কাকাবাবু?

—প্রসাদের মুখে শোনো।

প্রসাদকাকা ইতস্তত করে বললেন, "তিতলি দিদিমণি খুব অত্যাচার শুরু করেছে ওখানে।"

—কী করল?

—কিছু ছেলে-মেয়ে জুটিয়েছে। নেশাভাঙ করছে।

—সে কী!

—গোরাবাজারে একটা ছেলে আছে, সুবীর। ছেলেটা নটরিয়াস। মার্ডার-ফার্ডারও করেছে। সেই ছেলেটা দেখি, রোজ বাড়িতে আসছে। তিতলি দিদিমণি এমন প্রশ্রয় দিয়েছে, একদিন আমাকেই বলে বসল, আপনি কাজের লোক, কাজের লোকের মতো থাকবেন।

শুনে রাগ হয়ে গেল। তিতলি ভেবেছেটা কী? প্রসাদকাকা দীর্ঘদিন নায়েবের কাজ করছেন ও বাড়িতে। বুক দিয়ে আগলে রাখেন সব। কাকাবাবুদের জমি-জমা আছে নসীপুরে। জায়গাটা লালগোলার কাছে। সেখানে চাষবাস হয়। জমিজমা সব দেখেন প্রসাদকাকা। নির্লোভ মানুষ। তাঁকে অপমান করেছে তিতলি? ভাবতেই পারছি না। দিন পনেরো হল, ও ওখানে গেছে। এর মধ্যেই এত অশান্তি?

—কী করা যায় বলো তো? জিজ্ঞেস করলেন কাকাবাবু।

প্রসাদকাকা বললেন, "মাঝে একদিন বন্দুক নিয়ে নসীপুরে গেছিল। বগারি পাখি মারতে। এ সময় বগারি কোথায়? কাদের হাঁস মেরেছে। তাঁরা এসে চোটপাট করে গেছে প্রসন্নর উপর।

কাকাবাবু বললেন, "ও জায়গাটা বাংলাদেশ বর্ডারে। খুব সেন্সেটিভ। লোকজন খেপে গেলে জমিজমা রাখা মুশকিল হবে।"

প্রসাদকাকা বললেন, "আমি অনেক চেষ্টা করেছি বোঝাবার। শুনবেই না। আপনারা কেউ চলুন। তিতলি দিদিমণিকে আমি সামলাতে পারছি না।"

কাকাবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি একবার যেতে পারবে বুবুন?"

কাকাবাবুর কোনও অনুরোধে আমি না করি না। একটু অসুবিধা হবে। সুমিতাভকে নিয়ে অতীনের কাছে যাওয়ার কথা আজ সন্ধ্যায়। দু'বার ও থানায় গেছে। আজ রমলাও আসবে। সুমিতাভকে ডিভোর্সে রাজি করাতে। আমি চেষ্টা করছি, যাতে ডিভোর্স না হয়। আমার থাকা দরকার ওদের মাঝে। তা ছাড়া দুপুরে একবার সাইটে যাওয়ার কথা। সেখান থেকে ঘুরে আসব সেবায়। মুনের হঠাৎ কী যেন হয়েছে। গুম হয়ে বসে থাকে, চিন্তা করে। এটা হয়েছে, স্টোরি টেলিংয়ের দিন থেকে। ডাক্তার ব্যানার্জি বেশ চিন্তিত। হঠাৎ কেন ওর ডিপ্রেশন হল, ধরতে পারছেন না।

কাকাবাবু উদগ্রীব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে। বললাম, "কবে যেতে হবে?"

—পারলে আজ ভাগীরথী ধরেই চলে যাও। ওকে নিয়ে এসো। তোমার কথা না করতে পারবে না।

—ঠিক আছে, যাব। প্রসাদকাকাও কি আমার সঙ্গে যাবে?

—না। ও আলাদা যাবে।

বাড়ি ফিরে মাকে বললাম, বহরমপুর যাওয়ার কথা। শোনার পরই মায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিতলিকে মা পছন্দ করে না। শুকনো মুখে বলল, "কবে ফিরবি?"

—দু'একদিনের মধ্যেই মা।

—আমার শরীরটা ভাল নেই, বাবা।

—কেন, কী হয়েছে মা?

—জ্বর জ্বর লাগছে। বুটুর বিয়েতে দিন কয়েক অনিয়ম হয়েছে। শরীরের আর দোষ কী।

—তা হলে কাকাবাবুকে বলে আসি। আমি যাব না।

—না। তুই যা। উনি তোর গার্জেনের মতো। ওর কথা তোর শোনা উচিত।

—কিন্তু তোমাকে এই অবস্থায় রেখে গেলে আমি যে চিন্তায় থাকব মা।

—দূর বোকা। কিচ্ছু হবে না। চিরদিন কি আর আমি বেঁচে থাকব রে?

—কমলামাসিকে একবার বলে আসব, এখানে দু'দিন থাকার জন্য?

—বলে আয়।

—ডাক্তারকাকাকে একবার ডেকে আনি।

—না, না। ডাকতে হবে না। ও একটু আধটু জ্বর ভাব হয়ই।

মনে কেন জানি না, একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল। বেরিয়ে গিয়ে আমি ডাক্তারকাকাকে ডেকে আনলাম। আমাদের সঙ্গে অনেক দিনের সম্পর্ক। চেম্বারে ভিড় থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারকাকা উঠে এলেন।

বাড়িতে এসে দেখি, দোতলার ঘরে মা শুয়ে আছে। পায়ের সামনে রুমকি বসে।

পা টিপে দিচ্ছে। এই সময় মাকে কখনও শুয়ে থাকতে দেখিনি। দেখেই বুকটা ধক করে উঠল। ডাক্তারকাকাকে দেখে মা বিছানায় উঠে বসল। তার পর বলল, "আপনাকে আবার ডেকে আনল কেন ?"

রুমকিকে দেখে ডাক্তারকাকা বললেন, "জ্বর মেপেছিস, এই মেয়েটা। কী যেন নাম তোর ?"

রুমকি ঘাড় নেড়ে বলল, "নিরানব্বই।"

—থার্মোমিটার দেখতে পারিস ?

—হ্যাঁ, এখন একবার দেখব ?

—দ্যাখ।

কথা বলতে বলতে ডাক্তারকাকা পালস্ দেখে নিলেন। তার পর বললেন, "সিজন চেঞ্জ তো। এই সময় জ্বর হয়। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি। আনিয়ে নাও বুবুন।"

—ভয়ের কিছু আছে, কাকা ?

—দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। ওষুধ দিলাম। কেমন আছে, রাতে গিয়ে কেউ যেন আমায় বলে আসে।

দু'চার মিনিট কথা বলে ডাক্তারকাকা উঠে পড়লেন। প্রেসক্রিপশন নিয়ে আমিও পিছন পিছন বেরিয়ে এলাম। ডাক্তারকাকার ছেলে সুদীপ আমার বন্ধু। স্কটিশ চার্চে একসঙ্গে পড়তাম। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর ডাক্তারকাকার চেম্বারের পাশেই ও ওষুধের দোকান খুলেছে। সেখান থেকে ওষুধ কিনে যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন মা উঠে বসেছে। মাকে দেখে মনটা হালকা হয়ে গেল। ভাগীরথী এক্সপ্রেস সন্ধের দিকে। এখনও অনেক সময় আছে। দুটো নাগাদ বেরোলেই হবে। একবার সাইটে ঘুরে, শেয়ালদা চলে যাব।

স্নান করার জন্য তিনতলায় উঠতেই ফোন। লেবারদের সর্দার বিহারীর। বলল, "ঋষিবাবু, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। একবার আসতে পারবেন ?"

বিহারী আমার নামটা সঠিক উচ্চারণ করতে পারে না। ডাকে ঋষিবাবু বলে। ওর এই দলটা আসে জামালপুর থেকে। আমাদের সাইটেই ওরা তাঁবু খাটিয়ে থাকে। এই সময়টায় দেশের বাড়িতে, খেতির কাজ থাকে না। তখন এসে জনমজুরের কাজ করে। সাইটে থাকে বলে চুরি চামারি কম। বিহারী খুব বিশ্বস্ত। পাঁচটা প্রোজেক্টে আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে। পেমেন্ট নিয়ে এর সঙ্গে ঝামেলা হয়নি বললেই চলে। লেবারদের আমরাও খুব দেখি। অসুখে পড়লে খরচ দিই। আমাদের কপাল ভাল, আজ পর্যন্ত আমাদের প্রোজেক্টে কখনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। তাই অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে একটু অবাকই হলাম।

—কী হয়েছে বিহারী ?

—কাল একটা জায়গায় ঢালাই করছিলাম। আজ তার নীচে কাজ করছিল দু'জন। হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে। আমার দুটো লোকের চোট লেগেছে ঋষিবাবু।

—তারা এখন কোথায় ?

—নন্দিনী দিদিমণি ওদের হাসপাতালে নিয়ে গেছে। আপনাকে ফোন দিয়েছিল। কিন্তু আপনি তখন ছিলেন না।

—কখন হয়েছে এ সব?

—আধা ঘণ্টা আগে।

—ঢালাই কি ভাল হয়নি ?

—বুঝতে পারছি না। মনে হয় সিমেন্টে গণ্ডগোল আছে।

—সুমিতাভ যায়নি ?

—না।

—ঠিক আছে। আমি এখুনি আসছি।

সকাল থেকে শুধু আজ খারাপ খবর। প্রথমে তিতলির পাগলামি, তারপর মায়ের জ্বর। এখন অ্যাক্সিডেন্ট। সারা দিনটাই বোধহয় আজ বাজে কাটবে। অবাক লাগছে, সুমিতাভ সাইটে যায়নি শুনে। কয়েকটা দিন ও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সাইটের সব ঝামেলা ও-ই দেখে। সিমেন্ট, বালি, ইট, স্টোন চিপস—কেনার দায়িত্ব ওর। এ সব ব্যাপারে ও এক্সপার্ট। মুখে মুখে সব দাম বলে দেয়। ওকে ঠকানো খুব কঠিন। তা সত্ত্বেও, খারাপ কোয়ালিটির সিমেন্ট ঢুকল কোত্থেকে ? কয়েকটা দিন থানা-পুলিশ করছে সুমিতাভ। বোধহয় সেই কারণেই নজর দিতে পারছে না।

স্নান-খাওয়া সেরে সাইটে পৌঁছলাম বেলা দেড়টা নাগাদ। এই প্রোজেক্টে সেভেন্টি পার্সেন্ট বুকিং হয়েছে। শুরু করেছিলাম এগারোশো টাকা স্কোয়ার ফুটে। এখন দাঁড়িয়েছে পনেরোশোতে। তাতেও লোকে নিচ্ছে। একতলা কমপ্লিট হয়ে গেল, মনে হয় দর উঠবে আঠারোশোতে। জায়গাটা খুবই ভাল। উল্টো দিকেই হাসপাতাল। দু' কিলোমিটারের মধ্যে গড়িয়াহাট। বাইপাস দিয়ে গেলে এয়ারপোর্ট খুব দূরে নয়। চার-পাঁচ বছরেই জায়গাটা জমজমাট হয়ে উঠবে।

সাইটে ছোট্ট একটা অফিস ঘর করেছে সুমিতাভ। সেখানে যেতেই দেখি নন্দিনী কাকে যেন ফোন করছে। আমাকে দেখেই বলল, "ওহ্, আপনি এসে গেছেন। এই মাত্র বিডন স্ট্রিটে ফোন করেছিলাম।"

—সুমিতাভ আসেনি ?

—না।

—খবর দিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ। প্রথমবার বলল, আসছি। তার পর করতে গিয়ে দেখছি, মোবাইল অফ করে রেখেছে।

—স্ট্রেঞ্জ। লেবার দু'জনের ইনজুরি কেমন নন্দিনী ?

—সিরিয়াস কিছু নয়। স্টিচ করে ছেড়ে দিয়েছে।

—বিহারী বলল, সিমেন্টের জন্য ঢালাই নাকি ভাল হয়নি। এ বার কি দাস বিল্ডার্স সিমেন্ট দেয়নি ?

—না। ওদের কাছ থেকে সিমেন্ট নেননি সুমিতাভদা। এ বার এখানকার একজনকে ফিট করেছে। এখানকার পার্টির এক ক্যাডারকে।

—চেঞ্জ করল কেন ?

—জানি না।

—আশ্চর্য, আমাকে কিছু বলেওনি।

একটু ইতস্তত করে নন্দিনী বলল, "বুবুনদা, একটা কথা বলব ?"

—কী রে ?

—আপনি এই প্রোজেক্টে একটু সময় দিন।

—কেন রে ? কিছু হয়েছে ?

—তেমন কিছু না। তবে সুমিতাভদাকে একটু অন্য রকম দেখছি।

—কী রকম ?

—এখনও পুরো বুকিং হয়নি। লোকে খোঁজ করতে আসছে। কিন্তু তাদের কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে দিন দু'জন এন আর আই আপনার খোঁজে এলেন। বললেন, আপনার দাদা নাকি পাঠিয়েছেন। তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করল সুমিতাভদা, দুই ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

—আগে কেন বলিসনি ?

—পাছে আপনি কিছু মনে করেন। এই কথাটা যে আপনাকে বলেছি, প্লিজ সুমিতাভদাকে আপনি বলবেন না।

নন্দিনীর কথা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। প্রোজেক্টের কাজ ভাল চলছে। এই সময় সুমিতাভ আমাকে ডোবাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু দাস বিল্ডার্সের জায়গায় অন্য সাপ্লায়ার নিয়ে আসার মানেটা বুঝতে পারছি না। এই প্রোজেক্টের অনেক দায়িত্ব আমি ওর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। এ বার থেকে নজর রাখতে হবে। নন্দিনীকে এখনই কিছু বলব না। পরে বাড়িতে ডাকব। তারপর সুমিতাভর সম্পর্কে আলাদা করে জিজ্ঞেস করব। ওকে বললাম, "আমি দিন দু'য়েকের জন্য একটু বহরমপুরে যাচ্ছি। এখানকার কাজকর্মে একটু খেয়াল রাখিস।"

নন্দিনী কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘরে ঢুকল বিহারী। বলল, "ঋষিবাবু, ঢালাইয়ের কাজ কি এখন বন্ধ রাখব ?"

—দু'তিন দিন কোরো না।

—তখনই সুমিতবাবুকে বললাম, ফালতু লোকের কাছে সিমেন্ট নেবেন না। শুনল না। বলল, না নিলে, পার্টির লোকেরা হুজ্জুত করবে।

—ওই সিমেন্টের বস্তা আর খুলো না বিহারী। যেমন আছে, থাকুক। সুমিতাভকে বলে, সব ফেরত দেব। ক'বস্তা আছে ?

—চালিশ বস্তা হবে।

—ঠিক আছে, যাও। অন্য কাজ করো। তোমার লোকেদের সব খরচা আমার।

বিহারী চলে যাওয়ার পর আমি উঠে পড়লাম। আমার সেবায় যাওয়ার কথা। সময় খুব অল্প। ওখানে খুব বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। দশ-বারোদিন আগে ডাক্তার ব্যানার্জি আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আরতির ব্যাপারে। সেই কাজটা করেছি। সেটাই জানিয়ে আসব। আজ সেবায় একটা অনুষ্ঠান আছে। রোল মেকিং। এটাও এক ধরনের ট্রিটমেন্ট। পেশেন্টদের এক একটা রোল দেওয়া হয়। ওরা ডায়লগ বানিয়ে অভিনয় করে। অনেক সময় অভিনয় করতে গিয়ে, সত্যি কথা বলে ফেলে। অনেকটা সেই স্টোরি টেলিংয়ের মতো।

এর আগে একবারই মাত্র রোল মেকিংয়ের সেশন দেখেছি। ইন্দ্রাণীকে মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলা হল। আর মীনাকে মেয়ের। দু'জনে মিলে সে দিন দারুণ জমিয়ে দিয়েছিল। ইন্দ্রাণীর মুখ দিয়ে ওর মায়ের অনেক কথা সে দিন বেরিয়ে

এসেছিল। তখনই জানা গেল, ওর নিজের বাবা নেই। যাকে বাবা বলে জানি, তিনি স্টেপ ফাদার। এই তথ্যটা চেপে গেছিলেন ওর মা। চেপে রেখে ভুল করেছিলেন। ইন্দ্রাণীর মুখে এই খবরটা পেয়ে ডাক্তার ব্যানার্জি অন্যরকম ট্রিটমেন্ট শুরু করেছিলেন।

গড়িয়াহাটের দিকে গাড়ি চালাচ্ছে বাবলু। পিছনের সিটে বসে আমি ডাক্তার ব্যানার্জির কথা ভাবছি। রোগ আর রোগী নিয়েই ভদ্রলোক মজে আছেন। মাঝেমধ্যে অনেক রোগীই বলে ফেলেন, "ডাক্তারবাবু, আপনি আমাদের ভগবান।" মাঝে উনি গ্যাংটক গেছিলেন দিন তিনেকের জন্য। বোধহয় কোনও কনফারেন্স ছিল সাইকিয়াট্রিস্টদের। ওই তিনদিন অনেককেই বলতে শুনেছি, "ডাক্তারবাবু না থাকলে আমাদের ভাল লাগে না।"

প্রতিমাদিও একদিন বললেন, "ডাক্তার ব্যানার্জি পেশেন্টদের সঙ্গে এমন র‍্যাপো করেন, তাতেই অর্ধেক রোগ সারিয়ে দেন।"

এ সব কথা ভাবছি, আশ্চর্য, হঠাৎ দেখি, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডাক্তার ব্যানার্জি। বোধহয় গাড়ি বিগড়ে গেছে। বাবলুকে থামতে বলে, আমাদের গাড়ি ব্যাক করালাম। ডাক্তার ব্যানার্জির চোখ-মুখে একরাশ বিরক্তি। কিন্তু আমাকে দেখেই হেসে বললেন, "কোথায় চললে ঋচীকভাই?"

—সেবায় যাচ্ছিলাম। আপনি?

—যাব এসপ্ল্যানেডে। সাব'স ক্লিনিকে। গাড়িবাবু গররাজি।

—উঠে আসুন। আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

—চলো তা হলে।

গাড়িতে উঠে ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "গাড়িরও যে মন আছে, আজ তা টের পেলাম।"

—কী রকম?

—এটা আমাদের পৈতৃক গাড়ি। মাস দু'য়েক ধরেই ভাবছি, এই ফিয়াট বাবুকে বিদেয় করে একটা মারুতি জেন-দিদিমণিকে কিনব। বিশ্বাস করো ঋচীকভাই, তারপর থেকেই ফিয়াটবাবু আমায় ট্রাবল দিচ্ছে। মনে মনে খুব বোধহয় অসন্তুষ্ট।

কথা শুনে হেসে ফেললাম। তার পর বললাম, "এই মনের রোগটা সারাবেন কী করে?"

—তারও ওষুধ আছে। পরে ভাবব। আগে সেবা-র মেয়েদের একটা হিল্লে করি, তার পর।

—ডাক্তার ব্যানার্জি, ভাগীরথী এক্সপ্রেসে আজ আমি বহরমপুর যাচ্ছি।

—তাই নাকি? কবে ফিরবে?

—দিন তিনেকের মধ্যে।

—ফিরেই দেখা করবে কিন্তু।

কথায় কথায় এসপ্ল্যানেড এসে গেল। সাব'সে নামার পর ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "ঋচীক ভাই, মুনের কথা তো তুমি জিজ্ঞেস করলে না?"

—কেমন আছে এখন মুন?

—ভাল না। ফের ডিপ্রেশন হয়েছে। এটা হয়। একবার ভাল, একবার খারাপ।

তুমি তো বহরমপুর যাচ্ছ। ওর মা আর ভাইকে একবার আসতে বোলো তো। ওর যে রিলেটিভরা এখানে থাকে, তারা বোধহয় ইন্টারেস্ট নেয় না।

—নিশ্চয়ই বলব।

—মুনের সঙ্গে মাঝে কি তোমার কোনও কথা হয়েছে ?

—তেমন কিছু না। আগের মতো ও এখন রিঅ্যাক্ট করছে না।

—কবে থেকে এটা লক্ষ করছ ?

—চন্দনাদি প্রথম যেদিন সেবা-য় গেল, তারপর থেকে।

—তোমার চন্দনাদি কি ওকে এমন কিছু বলেছে, যা থেকে ডিপ্রেশন হতে পারে ?

কথাটা একটা ধাক্কা মারল আমাকে। কিন্তু ডাক্তার ব্যানার্জিকে কিছু বুঝতে দিলাম না। বললাম, "না। আমার তা মনে হয় না।"

ডাক্তার ব্যানার্জি চিন্তিত মুখে ঢুকে গেলেন ক্লিনিকে। মুখ দেখে আমার মনে হল, কথাটা উনি বিশ্বাস করলেন না।

বাবলু যখন আমাকে শেয়ালদায় নামিয়ে দিল, সন্ধে তখন ছ'টা। মিনিট কুড়ির মধ্যেই ট্রেন ছাড়বে। ভাগীরথী এক্সপ্রেসে ফার্স্ট ক্লাস এসি আছে। টিকিট কেটে উঠে বসলাম। সন্ধের এই ট্রেনে বেশ ভিড়। তবে এ সি কামরায় লোক কম। কামরাটা এখনও বেশ ঝকঝকে। উজ্জ্বল আলো। বাইরে বেশ গরম। ভেতরে ঢুকতেই শরীরটা জুড়িয়ে গেল। এই লাইনে কৃষ্ণনগরের পর লোকে খুব কম টিকিট কাটে। দিনের বেলার ট্রেনে চেন টেনে যেখানে-সেখানে লোক নেমে যায়। সাধারণ কামরায় হকারদের ভীষণ উৎপাত। এখনও ডাবল লাইন হয়নি। কোনও কোনও জায়গায় গাড়ি দাঁড়িয়েই থাকে।

আগে কখনও এই ভাগীরথী এক্সপ্রেসে যাইনি। গাড়ি ছাড়ার পর বেশ ভাল লাগল। সব স্টেশনে দাঁড়ায় না। শুনেছি, মাত্র পাঁচ-ছটা স্টপেজ। সাড়ে দশটার মধ্যে পৌঁছে দেবে। সাধারণ ট্রেনগুলোর তুলনায় সময়ও নেয় কম। ঘণ্টা চারেক রিল্যাক্স করা যাবে। তাই সিটে গা এলিয়ে দিলাম। আজ সকালেও ভাবিনি, আমাকে বহরমপুর যেতে হবে। মাস পাঁচেক পর ফের যাচ্ছি। এবার এমন একজনকে নিয়ে আসতে, যাকে এড়াতে পারলে বাঁচি।

—কোথায় চললেন মিঃ বাসু ?

চোখ খুলতেই দেখি, সুরেশ কাজারিয়া। নাম করা প্রোমোটার। আমাদের লাইনের লোক। তাই খুব ভাল করে চিনি। সেন্ট্রাল ক্যালকাটায় প্রচুর অ্যাপার্টমেন্টস তৈরি করেছেন। আগে যিনি পুলিশ কমিশনার ছিলেন, তাঁর সঙ্গে খুব দোস্তি ছিল এই কাজারিয়ার। তখন চুটিয়ে ব্যবসা করেছেন। পুলিশ, মস্তান— কারও ঝামেলায় পড়েননি। গায়ের জোরে বস্তি উচ্ছেদ করে বাড়ি বানিয়েছেন। কলকাতা থেকে খাটাল তুলে দেওয়ার জন্য একটা সময় পিছন থেকে কাজারিয়া-বাজোরিয়ারা প্রচুর পয়সা ঢেলেছিলেন। সেখানে বড় বড় বাড়ি। এখন সুরেশ কাজারিয়া একটু অসুবিধায় আছেন। এখনকার সি পি একেবারেই নাকি পছন্দ করেন না এঁকে।

আগে কাজারিয়া আমাদের মতো মাঝারি ধরনের প্রোমোটারদের পাত্তাই দিতেন না। এখন দেন। হোম সেক্রেটারি আমার আত্মীয়, এটা জানার পর। সিটের সামনে কাজারিয়া দাঁড়িয়ে। বললাম, "আপনি কোথায় চললেন ?"

—পলাশি। ওখানে একটা সুগার মিল কিনেছি।

—ভাল আছেন। একটা ধরছেন, একটা ছাড়ছেন।

—কিছু করে খেতে হোবে তো মশাই। এরা তো মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং আর করতে দেবে না কলকাতায়।

সি পি পুলক রুদ্রর সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানি। তাও জিজ্ঞেস করলাম, "কেন আপনার চ্যানেল তো ভালই।"

পাশে বসে পড়লেন কাজারিয়া। বললেন, "কী ভাল। আমি নাক-কান মুলেছি, বিল্ডিং তৈরিতে আর না। আমরা কলকাতাকে সাজিয়ে দিচ্ছিলাম। স্লাম এরিয়ায় সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানাচ্ছিলাম। কিন্তু গাভমেন্ট না চাইলে আমরা কী করব ? এই তো দেখলেন, সেন্ট্রাল গাভমেন্ট কলকাতা সিটিকে এ ওয়ান বানিয়ে দিল।"

—খুব অন্যায় করেছে।

—করবেই। আপনি দিল্লি-বোম্বাই-বাঙ্গালোর যান, ইভন আমেদাবাদে— কমপেয়ার করুন, তখন দেখবেন আপনারই মনে হবে ক্যালকাটা ইজ অ্যান আগলি সিটি। আমি তো ঠিক করে রেখেছি, এই স্টেটে এখন আর টাকা ঢালব না। যা ইনভেস্টমেন্ট করব, সব বাঙ্গালোরে।

কাজারিয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। তবুও বললাম, "আসলে কী জানেন, প্রোমোটারদের সম্পর্কে একটা বাজে ধারণা হয়ে গেছে।" বলতে চাইলাম, আপনাদের মতো প্রোমোটারদের সম্পর্কে। কিন্তু কথাটা মুখ দিয়ে বেরোল না।

কাজারিয়া বললেন, "বাজে ধারণার কোনও মানে নেই। আপনি বলুন না, লোকে বলছে আমরা ফ্ল্যাট বানিয়ে, খুন চুষে খাচ্ছি। পার স্কোয়ার ফুট চব্বিশশো টাকায় বিক্রি করছি। আমি বলি, ঠিক আছে, ওটা আমরা পনেরোশো করে দেব। আপনি এমন ব্যবস্থা করুন, যাতে লোকাল মস্তানকে টাকা দিতে হবে না। লোকাল পার্টিকে খুশি করতে হবে না। প্ল্যান সাংশনের জন্য কর্পোরেশনকে টাকা খাওয়াতে হবে না। ইলেকট্রিক আর জলের লাইন দিতে এসে কেউ হাত পাতবে না। এ সব বন্ধ হয়ে যাক। দেখুন, দাম কমিয়ে দিতে পারি কি না।"

কাজারিয়া যা বলছেন, সব সত্যি। এ সব দু' নম্বরি হয় বলেই ফ্ল্যাটের দাম এত বেড়ে যাচ্ছে। কাজ করতে গিয়ে আমাদেরও নানা চাহিদা মেটাতে হয়। এখন কোনও জমি কিনে প্রোজেক্ট করা অসম্ভব। জমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য এত টাকা দিতে হয়, প্রফিটের মুখ দেখা মুশকিল। তাই আমরা এখন জয়েন্ট ভেঞ্চারে নামছি। জমির মালিককেও সঙ্গে নিচ্ছি। এরিয়া বুঝে সিক্সটি-ফর্টি অথবা সেভেন্টি-থার্টি। এ সব ডিল করে সুমিতাভ। আমাকে নাক গলাতে দেয় না।

কাজারিয়ার কথার রেশ টেনে বললাম, "আমাদের অ্যাসোসিয়েশন যদি স্ট্রং হত, তা হলে অনেক কিছু বন্ধ করা যেত। আমাদের নিজেদের মধ্যে এত দলাদলি, অন্যরা সে সুযোগ নেবে না কেন ?"

—সে জন্যই অ্যাসোসিয়েশন ছেড়ে দিলাম মশাই। সবাই এখন পুলিশকে তেল মারছে। আগের সি পি ভদ্দরলোক ছিলেন। রিকোয়েস্ট করলে রাখতেন। কোনও দিন কোনও অ্যাডভান্টেজ নিতেন না। এখনকার সি পি তো ভুতুরিয়াদের পকেটে

ঢুকে গেছেন।

—কোন ভুতুরিয়া ?

—আরে, বিনোদ ভুতুরিয়া মশাই। যার জুট মিল আছে। এখন তো সবাই প্রোমোটিং বিজনেসে নেমে গেছে। শুনলাম, লি রোডে একটা অ্যাপার্টমেন্টস করেছে। সি পি-র জন্য একটা ফ্ল্যাট রেখে দিয়েছে। জানেন, লি রোডের ওই জায়গাটা পেল কী করে ? সে বিরাট হিস্ট্রি।

—ছেড়ে দিন মশাই। শুনে কী লাভ ? কলকাতার মাঝে জায়গা পাওয়া সহজ ?

—কী বলছেন আপনি ? কলকাতায় তো প্রচুর জায়গা। যদি এরিয়াল সার্ভে করেন, দেখবেন, বড় রাস্তার দু' পাশে শুধু বড় বাড়ি। একটু ভেতরে বস্তি। দশ-পনেরো টাকার ভাড়ায় রয়েছে। কলকাতায় এদের থাকার যোগ্যতা নেই। এরা কেন মেট্রোপলিটান সিটিতে থাকবে বলুন তো ? মুম্বইতে পারবে ? শিবসেনা ভাগিয়ে দেবে। আরে, দেখলেন না, দিল্লিতে স্লাম কীভাবে বুলডোজ করল ?

কী বলব ? কলকাতার জন্য এত ফিলিং, জেনে ভাল লাগল। কাজারিয়া অবশ্য একটাও ফালতু কথা বলছেন না। উত্তর কলকাতাটা তো এঁরা প্রায় কিনেই ফেলেছেন। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে এক চক্কর মারলেই সেটা বোঝা যায়। পারলে এরা পুরো কলকাতাটাকেই গিলে ফেলবেন। আর জয়পুর-উদয়পুর থেকে লোক এনে বসাবেন। গড়িয়াহাটের কাছে কর্নফিল্ড রোডে একটা জায়গার খবর এনেছিল সুমিতাভ। সাড়ে. ন' কাঠা। জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। পেলে খুব প্রফিটেবল প্রোজেক্ট করা যেত। কিন্তু পাকা কথা বলতে একটা দিন দেরি করলাম। এই কাজারিয়া প্যাঁচ মারল। পাড়ার এক মস্তানকে টাকা দিয়ে কিনল। সে ব্যাটা জমির মালিককে গিয়ে ভয় দেখাল। আমরা পিছিয়ে এলাম। বাধ্য হলাম, ইস্টার্ন বাইপাসে চলে যেতে।

কাজারিয়া এতক্ষণ পাশের সিটে বসে কথা বলছিলেন। এ বার উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে পান পরাগের কৌটো বের করে বললেন, "আপনাদের প্রোজেক্ট কেমন চলছে মিঃ বাসু ?"

—মোটামুটি।

—আপনার পার্টনার মশাই ভাল লোক না। কী নাম যেন ?

—সুমিতাভ। কিন্তু ওর সম্পর্কে এ কথা বলছেন কেন ?

—খোঁজ নিন। লোকটা শিগ্গির ঝামেলায় পড়বে।

কাজারিয়া বোধহয় রমলার সঙ্গে ওর ঝামেলার কথা বলছেন। লোকটা খোঁজ রাখে তো ? বললাম, "সেটা মিটে যাবে।"

শুনে কাজারিয়া একটু অবাক চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, "আপনি সব জানেন ?"

—জানি। পুলিশ আমায় বলেছে।

—ব্যাপারটা জেনেও আপনি ওর সঙ্গে আছেন ? স্ট্রেঞ্জ। দেখুন মশাই, আমরা মারোয়াড়িরা নানা ধান্ধা করি। কিন্তু কখনও এ সব গন্ধা ধান্ধা করি না।

—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ কাজারিয়া।

—বাঙালি বিজনেসম্যানদের একটা প্রবলেম কি জানেন মশাই, আপনারা খুব

বিশ্বাস করেন সবাইকে। যাক, আপনার পার্টনার। আপনি বুঝবেন। চলি। আমার স্ত্রী সঙ্গে আছেন। একা বসে বোধহয় বোর হচ্ছেন। আমি ফের প্রোমোটিংয়ে আসব। সোমনাথবাবু খুব শিগ্গির ডি জি হয়ে আসছেন। তখন ফের মার্কেটে নামব।

বলেই পিছনের দিকে চলে গেলেন কাজারিয়া। এই লোকগুলো পারে বটে! কত আগে থেকে ভাবনা-চিন্তা করে। সোমনাথবাবু ডি জি হলে আবার ছড়ি ঘোরাতে শুরু করবেন কাজারিয়া। প্রোমোটার মহলেই শুনেছি, বেলতলায় একটা মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিংস করেছেন উনি। তার পাঁচতলায় একটা ফ্ল্যাট দিয়েছেন সোমনাথবাবুকে। এখন কেউ থাকে না। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর ওখানে উঠবেন সোমনাথবাবু। তখন আর কেউ প্রশ্নও তুলবেন না, ওই ফ্ল্যাট উনি কীভাবে কিনলেন।

ট্রেন এসে থামল রানাঘাটে। উঠে টয়লেটে গেলাম। অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি। কামরার ভেতর নো স্মোকিং। টয়লেটের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালাম। আগের বার, বহরমপুর থেকে ফেরার পথে, মুনকে আমি বাঁচিয়ে ছিলাম। সেই দিনটার কথা মনে হলে এখনও শিউরে উঠি। মুনকে বাঁচানোর জন্যই বোধহয় সেই রাতে আমি টয়লেটের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম।

আজকাল আমার কী হয়েছে, জানি না। ঘুরে ফিরে সেবা আর পেশেন্টদের কথা মনে পড়ে। ডাক্তার ব্যানার্জি লোকটাকে ভাল লেগে গেছে বলে বোধহয়। এখন আমার মায়ের কথা ভাবা উচিত। মায়ের জ্বর বাড়ল কি না, জেনে এলাম না। ট্রেনে ওঠার আগে একটা ফোন করলেও তো পারতাম? মনেই পড়ল না। বহরমপুরে নেমে, যে কোনও এস টি ডি বুথ থেকে একটা ফোন করব। ইদানীং ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়ায় প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে। আজ মায়ের ব্লাড টেস্ট করে, কাল বহরমপুর এলে কী এমন ক্ষতি হত? মায়ের কথা মনে হতেই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

সিগারেটটা শেষ করেই নিজের সিটে এসে বসলাম। হঠাৎ খুব ক্লান্ত লাগল। সকাল থেকে নানা চিন্তায় মনটা খিঁচড়ে আছে। সুমিতাভ আরও চিন্তায় ফেলল। নন্দিনী আমাকে হয়তো আরও কিছু বলত। সুরেশ কাজারিয়াও আমাকে সাবধান করে দিল। চোখ বুজে সুমিতাভর কথাই চিন্তা করতে লাগলাম। এই ছেলেটাকে বোধহয় আমি একটু বেশিই বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। ট্রেন বেশ জোরে ছুটছে। দুলুনিতে ঘুম এসে গেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম। কোত্থেকে একটা কালো বেড়াল জোগাড় করে এনেছে সুজিত। মুনের হাতে তুলে দিয়েছে। বেড়ালের চোখটা সবুজ। মুনের সঙ্গে কথা বলছি। হঠাৎ গরগর করে উঠল বেড়ালটা। ওর লোম খাঁড়া হয়ে উঠল। মুন ওকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বেড়ালটা আমাকে সহ্য করতে পারছে না। মুনের শাড়ির রংটা ধীরে ধীরে কালো হয়ে গেল। খিলখিল করে ও হাসতে শুরু করল। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি। এমন সময় বেড়ালটাকে আমার দিকে ছুড়ে দিল মুন। আমি চমকে উঠে সরে গেলাম। কিন্তু হঠাৎই ডান হাতে প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণা টের পেলাম। দেখলাম, কনুইয়ের একটা অংশ কামড়ে ঝুলে রয়েছে সেই বেড়ালটা। ঠিক সেই জায়গাটায়, যেখানে মুন একবার

কামড়ে ধরেছিল।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ট্রেনটা বহরমপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে। ঘণ্টা বাজছে। এখুনি ছেড়ে দেবে কাশিমবাজারের দিকে। কিট ব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়লাম। স্টেশন থেকে একটা রিকশা নিয়ে চন্দনাদিদের বাড়িতে পৌঁছলাম প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ। সদর দরজায় কড়া নাড়তেই, খুলে দিল কাজের মেয়ে ময়না। আমাকে চেনে। জিজ্ঞেস করলাম, "তিতলি দিদিমণি কোথায় রে ?"

—ওপরে।

ব্যাগ হাতে ওপরে উঠতেই যা দেখলাম, তাতে মাথায় রক্ত চড়ে গেল।

॥ বারো ॥

সকাল বেলায় একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছিলাম ব্রিজের কাছাকাছি। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকায় গঙ্গার পাড়টা খুব সুন্দর করে ইট দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। চলে যাওয়া যায় একেবারে সৈদাবাদ পর্যন্ত। আকাশে মেঘ জমেছে। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। যে কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে। সে জন্য আর বেশিদূর গেলাম না।

তিতলিদের বাড়িতে ফিরে আসতেই দেখি, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রলয়। প্রসাদকাকার ছেলে। সেরিকালচার নিয়ে পড়াশুনা করছে। আমার থেকে চার পাঁচ বছরের ছোট। আমাকে দেখে বলল, "ময়নার মুখে শুনলাম, আপনি এসেছেন। এ বার কয়েকটা দিন থেকে যান।"।

বললাম, "আজ রাতে বা কাল দুপুরে চলে যাব। তোর পড়াশুনা কেমন চলছে ?"

—ভাল।

প্রলয়ের সঙ্গে দু' চারটে কথা বলে ওপরে উঠে এলাম। দেখি, তিতলি সবে ঘুম থেকে উঠেছে। মুখটা ফোলা ফোলা। পরনে কাল রাতের ম্যাক্সি। বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে। আমাকে দেখে মুখ নিচু করে বলল, "বুবুনদা, সরি।"

চেয়ার টেনে ওর মুখোমুখি বসলাম। এই প্রথম ও আমাকে 'সরি' বলল। উত্তর শোনার জন্য ও আমার দিকে তাকিয়ে। বললাম, "মাঝে মাঝে তুই এমন খ্যাপামি করিস কেন বল তো ?"

—জানি না।

—কার উপর রাগ এত তোর ?

—যদি বলি তোমার উপর ?

—আমার উপর ? কেন ?

—সেটা যদি বুঝতে, তা হলে আমিও পাগলামো করতাম না।

—মাঝে মাঝে তো তোকে দেখে আমার খুব ভাল মেয়ে মনে হয়।

—এখন দেখে কী মনে হচ্ছে গো ?

—গুড গার্ল।

—আসলে কী জানো, তোমার কাছে এলেই আমি ভাল হয়ে যাই।

—আজ দুপুরে লালবাগ যাবি ?

—না গো। তোমার জন্য রান্না করব। প্রলয়কে বাজারে পাঠিয়েছি।

—তুই রান্না করতে পারিস ?

—কেন পারব না ? ফর ইওর ইনফর্মেশন, তোমার চন্দনাদি কিন্তু পারে না।

—আবার দিদিভাইকে টানছিস কেন ?

—তুলনাটা তো সব সময় ওকে নিয়ে করো, তাই।

—তিতলি, তোর ভেতর পার্টস ছিল, তুই কাজে লাগা।

—থ্যাঙ্কস। তুমি অন্তত বুঝেছ। তোমার আই কিউ লেবেল অবশ্য বরাবরই ভাল। চা খাবে ?

—দে।

পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে তিতলি বলল, "তোমাকে আমি খুব ট্রাবল দিই, তাই না বুবুনদা।"

—সেটা বুঝতে পারিস ?

—সরি। আর কখনও দেব না। তুমি যা বলবে, শুনব।

—এ কথাটা আগেও কিন্তু একবার বলেছিস।

—তুমি তো আমাকে কখনও...মানে...মানুষ বলেই মনে করোনি।

—এ ধারণাটা কিন্তু তোর ঠিক না।

—তখন যদি শাসন করতে, আমি বিগড়ে যেতাম না।

বারান্দার একদিকে এসে দাঁড়াল ময়না বলে মেয়েটা। সেদিকে চোখ পড়তেই তিতলি বলল, "কিছু বলবি ?"

—বাজার এসে গেছে দিদিমণি।

—তুই যা। আমি আসছি।

আমি বললাম, "বেশি কিছু করতে যাস না তিতলি।"

—চুপ করে বসে থাকো তো। তুমি আমার অতিথি। আজ তোমাকে কুকিং স্কিল দেখাব।

—দেখিস, পরে যেন হোটেল থেকে খাবার আনাতে না হয়। খিলখিল করে হেসে উঠল তিতলি। খুব সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। অথচ কাল রাতে ওর এই নিষ্পাপ মুখটাই কেমন হিংস্র হয়ে উঠেছিল। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ও বলল, "আগে খেয়েই দেখো। বাবা একদিন আমার হাতের রান্না খেয়ে অবাক হয়ে গেছিল।"

ম্যাক্সির পকেট থেকে তিতলি প্যাকেট বের করল সিগারেটের। তারপর বলল, "এই, একটা খাব ?"

—যদি না বলি, তা হলে ?

—খাব না। তিতলি ঘোষাল মেন্টালি খুব স্ট্রং।

—আমাকে একটা দে।

তিতলি সিগারেট এগিয়ে দিল। কিন্তু নিজে ধরাল না। সেবায় গিয়ে আমিও কিছু সাইকোথেরাপি শিখেছি। সেইভাবেই ওর সঙ্গে ব্যবহার করে যাচ্ছি। ওর সঙ্গে ঝগড়া করব না। জোর খাটাব না। ওর মতো হয়েই ওকে কাছে টানব। ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, "তোর সেই ঝিমলি মেয়েটা কেমন রে ?"

—কেন, লাইন মারবে নাকি ?

—মন্দ কী।

—তোমার কপাল খারাপ, ও এনগেজড।

—ছেলেটা কী করে?

—মেরিন ইঞ্জিনিয়ার।

—ঝিমলি তোর খুব বন্ধু বুঝি?

—খুউব। লোরেটোর সময় থেকে। ও আমাকে সব কিছু বলে, আমিও।

—কী এত কথা হয় রে তোদের?

—তোমায় বলব কেন?

—এই যে বললি, যা বলব, শুনবি।

—তা বলে মেয়েদের গল্প তুমি শুনতে চাইবে কেন? সুদীপাদি একদিন বলছিল, তোমার নাকি কোনও গার্লফ্রেন্ডও ছিল না।

—সুদীপাকে তুই চিনলি কী করে?

—আমাদের ইউনিটে সায়ন্তন বলে একটা ছেলে ছিল। তার মাসতুতো দিদি। তোমার সম্পর্কে অনেক গল্প করেছে আমার কাছে।

—কী বলেছে?

—তোমায় নাকি...রত্নাবলি বলে একটা মেয়ে খুব চাইত।

—আমি তো জানতাম না।

—জানার চেষ্টাও করোনি। একবার নাকি ফলতায় পিকনিকে গেছিলে তোমরা। ওখানে মেয়েটাও যায়। ঠিক ছিল, ও তোমাকে প্রপোজ করবে। তুমি নাকি সারাদিন রান্নাবান্না নিয়ে এমন মেতেছিলে, মেয়েটা সময়ই পায়নি, কথা বলার।

তিতলি যা বলছে, সব ঠিক। আসলে আমিই সেদিন সুযোগ দিইনি রত্নাবলিকে। ঠিক ছিল, শুধু প্রেম নিবেদন নয়, ও সবার সামনে আমাকে হঠাৎ চুমু খাবে। সবার সঙ্গে ও বাজি ধরেছিল। বাজির কথা আমাকে জানিয়ে দেয় অতীন। ও আমাকে চুমু খাওয়ার পর, আমার মুখের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে, তা নিয়ে নাকি প্রচুর আলোচনা হয়েছিল। বললাম, "কই, আমার মনে পড়ছে না তো।"

—যা, তুমি গুল মারছ।

—না রে, সত্যিই মনে পড়ছে না।

—এই, এ বার সিগারেটটা দাও। তোমার অর্ধেকটা খাই।

—কেন, তুই একটা ধরা না।

—না। তোমারটা খাব, দাও।

জ্বলন্ত সিগারেটটা এগিয়ে দিলাম। টান মেরে ও বলল, "আঃ, দারুণ লাগছে। কাল রাতে তুমি আসার পর থেকে, জীবনের একটা মানে খুঁজে পাচ্ছি। তুমি আমাকে নিতে এসেছ, ভাবতেই পারছি না।"

—তোর রান্নার কী হল? বেলা ক'টা বাজে জানিস?

—ছিঃ ছিঃ, তোমার কি খিদে পেয়ে গেছে?

—এখনও পায়নি।

—তুমি চান-টান সেরে নাও। ফরটি ফাইভ মিনিটস লাগবে আমার রান্না করতে।

—তুই যা। আমি একটু বসি। এখানে বসে গঙ্গা দেখতে আমার খুব ভাল

লাগে।

তিতলি উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে হাসলাম। দু' একদিনের মধ্যে ওকে নিয়ে একবার সেবায় যাব। ডাক্তার ব্যানার্জির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। কাল রাতে আমি ঠিক করে ফেলেছি। তিতলিকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা দরকার। তেমন হলে ওর সঙ্গে অভিনয় করেও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ডাক্তার ব্যানার্জি ওকে সারিয়ে তুলতে পারবেন।

কাল রাতে ঘরে ঢুকে দেখি, তিতলি বিছানায় শুয়ে আছে। সামনেই চেয়ারে বসে একটা চোয়াড়ে মার্কা ছেলে। টেবলে রামের বোতল। ছেলেটা ড্রিঙ্ক করতে করতে কী যেন রসিকতা করছে। দেখেই মাথায় আগুন জ্বলে গেছিল। প্রসাদকাকা এতটুকু বাড়িয়ে বলেননি তাহলে। লাফ দিয়ে ছেলেটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বলেছিলাম, "এই, এখানে কী করছ তুমি ?"

ছেলেটা প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছিল। ও কী একটা বলতে যেতেই অন্য হাতে চুলের মুঠি ধরে ছিলাম। তার পর এক লাথি মেরে বলেছিলাম, "ভদ্রলোকের ছেলে হও তো এখুনি চলে যাবে। মেয়েদের সঙ্গে বসে মদ খাওয়া হচ্ছে, বাস্টার্ড।"

ছেলেটা মেঝেতে পড়ে গেছিল। বোধহয় আমার শক্তি টের পেয়েছিল। তিতলির দিকে তাকিয়ে অসহায় গলায় বলে উঠেছিল, "ফ্রেন্ড, এই শক্তি কপূর লোকটা কে ?" তিতলি বিছানা থেকে নেমে এসেছিল। তারপর চোখ মুখ লাল করে বলেছিল, "আমার ফ্রেন্ডের গায়ে তুমি হাত তুললে কেন ?"

ঠাস করে এক চড় মেরেছিলাম। 'মা গো' বলে তিতলি বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়েছিল। ছেলেটা এই সুযোগে উঠে দাঁড়িয়েছিল। আঙুল তুলে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। বোধহয় 'দেখে নেব' গোছের কিছু। ঘুরেই তাই তলপেটে লাথি মেরেছিলাম। এসব মস্তানকে ভয় পেলে চলে না। ছেলেটা ফের বসে পড়েছিল। চুলের মুঠি ধরে তুলেছিলাম। চিৎকার করে বলেছিলাম, "এখুনি যদি না যাও, মেরে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসব। আর কখনও এ বাড়িতে ঢুকবে না।" এরপর ছেলেটা টলতে টলতে বেরিয়ে গেছিল।

কাল রাতে সত্যি সত্যিই আমার মাথায় খুন চেপেছিল। সাধারণত আমি রাগি না। কিন্তু রাগলে জ্ঞান থাকে না। ছেলেটা চলে যাওয়ার পর, তিতলির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। দৃশ্যটা মনে পড়ছে আমার। কোমরে দু' হাত। তিতলি জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। বলল, "গুণ্ডামি করছ ?"

—তোমার গায়ে খুব জোর, তাই না। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।

টেবলের উপর থেকে একটা গ্লাস তুলে তিতলি ছুড়ে মেরেছিল। আমি একটু নিচু হতেই গ্লাসটা দেওয়ালে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে পড়েছিল। লাগলে ভাল চোট পেতাম। তিতলির হাতে ফের একটা গ্লাস দেখে বলেছিলাম, "তোর লজ্জা করে না। একটা লোচ্চা ছেলেকে বাড়িতে ডেকে এনে ড্রিঙ্ক করছিস।"

কথাটা বলতে বলতেই এগিয়ে, ওর হাত চেপে ধরেছিলাম। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তিতলি বলেছিল, "ছাড়ো আমায়, লাগছে।"

—লাগুক। তুই কী ভেবেছিস, যা ইচ্ছে তাই করবি ?

গলায় জেদ বজায় রেখে ও বলেছিল, "করব। বেশ করব। তোমার কী ?"

তোমার কী অধিকার আছে, আমাকে মারার ?"

—চুপ। একটা কথাও বলবি না। বললে ফের মারব।

হাতে বোধহয় খুব লাগছিল। তিতলি আশ্চর্যরকম মিইয়ে গেছিল। হঠাৎই মিনতির সুরে বলেছিল, "বুবুনদা তোমার পায়ে পড়ি। আমায় ছাড়ো।"

হাত ছেড়ে পাঁজকোলা করে ওকে তুলে নিয়েছিলাম। তার পর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলেছিলাম, "কতক্ষণ ধরে ড্রিঙ্ক করছিস ?"

—সন্ধে থেকে। তুমি আমায় মারলে কেন ? খুব লাগছে।

কথাটায় পাত্তা না দিয়ে বললাম, "তিতলি, মা খুব অসুস্থ। তাই তোকে নিতে এলাম। ছিঃ, ভাবতেও পারিনি, তুই এত নীচে নেমে গেছিস।"

তিতলি ডান হাতের কনুইতে হাত বোলাচ্ছিল। চোখের কোণে জল। মুখটা সত্যিসত্যিই লাল হয়ে গেছে। দেখে একবার মায়া হল। আমার নিজের বোন হলে কি এতটা কড়া হতে পারতাম ? মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, "তুই কবে ভাল হবি, তিতলি ? গ্লাসটা মাথায় লাগলে আজ কী হত, বল তো ?"

তিতলি অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। হঠাৎই ফের ওর চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে এসেছিল। দু' হাতে মুখ ঢেকে ও বলেছিল, "আমি খারাপ, খুব খারাপ। আমায় তুমি মারো, আরও মারো।"

দু' হাত দিয়ে ওর মুখটা তুলে ধরেছিলাম, "ওঠ, নীচে চল। মুখ-টুখ ধুয়ে আমার সঙ্গে খেতে বসবি। তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

কথাটা শুনে তিতলি একবার কেঁপে উঠেছিল। তারপর চোখ খুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখে, ফের চোখটা বন্ধ করেছিল। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। কিছু বলতে চেয়েছিল তখন ? বুঝতে পারিনি।

কাল রাতের কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ দেখলাম, গঙ্গার ওপারে বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টিটা পশ্চিম দিকে ছুটে আসছে। জোরে হাওয়া দিচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। বিডন স্ট্রিটে এ দৃশ্য দেখা যাবে না কোনওদিন। ওপার থেকে একটা নৌকো আসছে এ দিকে। বৃষ্টিতে প্রথমে ঝাপসা হয়ে, তার পর অদৃশ্য হয়ে গেল নৌকোটা। এপারের গাছগুলো দুলছে। পুরনো শহর, গাছগুলোও বিরাট বিরাট। কিছু লোক গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তখনই বড় বড় ফোঁটা এসে পড়ল টেবলের ওপর।

বারান্দার রেলিং ধরে বৃষ্টির মাতন দেখতে লাগলাম। জামা ভিজে গেল। খুলে ফেললাম। আহ্ দারুণ লাগছে ভিজতে। প্রতি বছর দু' এক বার, বিডন স্ট্রিটের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে এ রকম বৃষ্টিতে চান করি আমি। আকাশের দিকে মুখ করে থাকি। বৃষ্টির ফোঁটাটা মুখে নিই। অদ্ভুত ভাল লাগে। তখন হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে দিয়ে মেঘগুলোকে নেমে আসতে বলি। আজও তাই করলাম। বোধহয় মেঘগুলো সাড়া দিল। গঙ্গার ওপারে কড়াৎ করে বাজ পড়ল।

—বুবুনদা, এই বুবুনদা, কী পাগলামি করছ ?

চোখ খুলে ডান দিকে তাকিয়ে দেখি তিতলি। নীচ থেকে ফের উঠে এসেছে। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাওয়ায় ওর পাতলা ম্যাক্সি উড়ছে। সেটা

সামলাতে সামলাতে ও বলল, "এখানে শিলাবৃষ্টি হয়। শিগ্গির চলে এসো।"

চিৎকার করে বললাম, "না আসব না। আজ যতক্ষণ না বৃষ্টি থামবে, ততক্ষণ ভিজব।"

তিতলি আমার ছেলেমানুষি দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেছে। ও হাসছে। ওর চোখ মুখেও বৃষ্টির ছাঁট লেগেছে। কনুই দিয়ে মুছে, আমাকে কী যেন বলল। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে কিছু শুনতে পেলাম না। আকাশটা বৃষ্টির তোড়ে ধূসর কাচের মতো মনে হচ্ছে। বারান্দা, তার পাশের রাস্তা, গঙ্গার ধারে বিশাল গাছ আর গঙ্গা যেন একাকার। হঠাৎ মনে হল, গঙ্গাটা যেন উঠে এসেছে বারান্দার উচ্চতায়। চৌকাঠের কাছাকাছি এসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কী বলছিস, তিতলি ?"

—বলছি সিজনের প্রথম বৃষ্টি, ভিজো না। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

—লাগুক। তুইও আয়।

—যাহ্, আমাকে এখন রান্না করতে হবে।

—পরে করিস। আয়, না হলে জোর করে তোকে ভেজাব।

প্রকৃতি কি মানুষকে হঠাৎ বদলে দেয় ? হয়তো। বৃষ্টির মাতনে আমার মনে তখন খুশির জোয়ার। জানি না, কেন এমন হল। হাত বাড়িয়ে হ্যাঁচকা মেরে বারান্দায় টেনে আনলাম তিতলিকে। বৃষ্টির প্রথম স্পর্শে ও সামান্য কেঁপে উঠল। দু'হাতে গাল ঢেকে, খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে স্নান করতে করতে বলল, "তুমি এত রোমান্টিক, তা তো জানতাম না, বুবুনদা।"

আকাশ চিরে সর্পিল রেখা। ফের শব্দ করে কোথাও বাজ পড়বে। কিন্তু পড়ল না। গুর গুর শব্দ হল। আমি বললাম, "একটা জিনিস দেখবি তিতলি। এই দ্যাখ, একটা অদ্ভুত জিনিস তোকে দেখাব। দু'হাত তুলে আমি বরুণ দেবতাকে ডাকব। আর অমনি তিনি সাড়া দেবেন।"

—যাহ্, তাই হয় নাকি ?

—হয়। এই দ্যাখ। বলেই আমি ফের দু'হাত আকাশের দিকে তুললাম। তারপর মেঘের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললাম, "হে বরুণ দেবতা, আমার প্রার্থনা তুমি শোনো। হুঙ্কার দিয়ে তুমি আর একবার ঘোষণা করো, এই বিশ্ব চরাচর তোমারই বশ।"

কথাটা শেষ হতে না হতেই, ঠিক মাথার উপর রুপালি রেখা। খুব কাছে কোথাও বাজ পড়ল। দরজার কাচগুলো ঝনঝন করে উঠল। বাতাসে পোড়া গন্ধকের গন্ধ। তীব্র শব্দে কানে তালা লেগে গেল। হঠাৎই তিতলির দিকে তাকিয়ে দেখি, ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পাতলা ম্যাক্সিটা ওর গায়ে লেপ্টে রয়েছে। শরীরের খাঁজগুলো সব ফুটে উঠেছে। মনে হল, এই অলৌকিক ঘটনায় ও বিমূঢ়।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে ওকে ধরে ফেললাম। দুটো কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললাম, "এই, তোর কী হল হঠাৎ ?"

চোখ বন্ধ করে ফেলেছে তিতলি। ধরে আছি বলে বুঝতে পারছি, শরীরের উপর ওর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। আমার বুকে টলে পড়ে ও মৃদুস্বরে বলল, "আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম বুবুনদা।"

আমি হাসতে লাগলাম। বৃষ্টির প্রকোপ আরও বেড়ে গেছে। তিতলি আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমার বুকে ওর মুখ। ওর শরীরটা একতাল মাখনের মতো মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, "তুই এত ভীতু, জানতাম না তো ? তোকে দেখে তো মনে হয় না কখনও।"

তিতলি কোনও উত্তর দিল না। হঠাৎই মুখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। ওর মসৃণ গালে বৃষ্টির ফোঁটা। ভিজে চুলে ওর চেহারাটাই বদলে গেছে। পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপছে। ঠোঁটের ফাঁকে মুক্তোর মতো দাঁত। হঠাৎই শরীরে একটু তাপ অনুভব করলাম। সেই তাপটা কি ছড়িয়ে গেল ওরও মধ্যে ? আমার পিঠে ওর দু'টো হাত। আঁকড়ে ধরল আরও জোরে। কয়েক সেকেন্ড ওর নিষ্পাপ মুখটা দেখে মনে হল, এই মেয়েটা সে নয়, যাকে কাল রাতে একটা মস্তানের সঙ্গে বসে মদ্যপান করতে দেখেছি।

ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, "তিতলি, আর না। আর ভেজা ঠিক হবে না। চল, ভেতরে চল।"

ও বলল, "তুমি যাও, আমি আরও একটু ভিজি। আমার খুব ভাল লাগছে।" ভিজে গায়েই তাড়াতাড়ি আমি নেমে এলাম।

ঘণ্টাখানেক পর, আমাকে খাওয়াতে বসে তিতলি সত্যি সত্যিই অবাক করে দিল। অদ্ভুত সব রান্না। ডাইনিং হলে বসে খাচ্ছি। ও পাশে দাঁড়িয়ে। আমাকে খাবার চিনিয়ে দিচ্ছে। সফেদ কোর্মা, জিঞ্জার ফিশ, চিকেন হট পাঞ্চ। প্রথমটা পাঠার মাংস দিয়ে তৈরি। দ্বিতীয়টা ভেটকি মাছের। আর মুরগির মাংস চৌকো করে কেটে হট পাঞ্চ। তিতলির মুখে তৃপ্তির ছাপ। এ বাড়িতে এসে ওকে আমি নতুন ভাবে চিনছি।

খেতে খেতেই মনে পড়ল কিছু দিন আগের একটা কথা। আমার সামনেই মা একবার ওকে বলেছিল, "এ বার রান্নাবান্না একটু শিখে নে মা। শ্বশুরবাড়িতে গেলে, তখন কী করবি ?" তিতলি তখন হাসতে হাসতে বলেছিল, "ও আর এমনকী কঠিন কাজ মাসিমণি। এক গাদা বই পাওয়া যায়। শিখে নিলেই হয়।" মা বলেছিল, "বই পড়ে রান্না হয় ? রান্না করা একটা আর্ট।" তিতলি উত্তর দিয়েছিল, "আর্ট শিখে আমার কোনও দরকার নেই। পড়ালেখা শিখলাম, হেঁসেলে ঢোকার জন্য নাকি ?" কথাটা শুনে মায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেছিল। আজ মা এখানে থাকলে সত্যি অবাক হয়ে যেত।

খেতে খেতেই বললাম, "এত চমৎকার রান্না তুই শিখলি কোত্থেকে রে ?"

—তোমাকে বলব কেন ?

—আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। এখানকার সেই দোকান থেকে কিনে আনিসনি তো, কী যেন নাম....মহল, না ?

—হতেও পারে। তিতলি মুখ টিপে হাসছে।

—বল না, কে শেখাল ?

—ঝিমলির মা।

—উরে ব্বাস, ওদের বাড়িতে প্র্যাকটিস করেছিস বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই।

—আর কী কী শিখেছিস ?

—সুযোগ দিয়ো, পরে দেখাব।

—তুই এত হেঁয়ালি করে কথা বলিস কেন রে তিতলি ? মাঝেমধ্যে তোকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

—বোঝার চেষ্টা করোনি বলেই, পারো না।

—এই কথাটা তুই আগেও একদিন বলেছিস।

—বলেছি হয়তো।

—সত্যি কথা বল তো, এখানে পালিয়ে এলি কেন ?

—সত্যি বলব ?

—বল।

—তোমার জন্য।

—আমার জন্য ? কেন ?

—সেটাই যদি বুঝতে পারতে....

—অন্যের উপর দোষ চাপানো, তোর স্বভাব হয়ে গেছে।

—ভুল বললে।

তিতলি গম্ভীর হয়ে গেল। ওর চোখ ছলছল করছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা হঠাৎ টনটন করে উঠল। হয়তো ও-ই ঠিক। ওর সম্পর্কে আমাদের মনে একটা ধারণা হয়ে গেছে। সেই ধারণা থেকেই ওর সম্পর্কে আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। তর্ক করে কোনও লাভ নেই। আজ সকাল থেকে ওকে অন্যরকম লাগছে। ওর সঙ্গে একটা র‍্যাঁপো করার চেষ্টায় নেমেছি। ডাক্তার ব্যানার্জি যা করেন। কী দরকার, সেটা নষ্ট করে ফেলার ?

কথা ঘোরাবার জন্যই বললাম, "এত সুন্দর রান্না করলি, প্রলয়কে খেতে বললেও তো পারতি।"

প্রশংসা শুনে বোধহয় উজ্জ্বল হল তিতলির মুখ। বলল, "ইস, একেবারে ভুলে গেছি। ছোঁড়াটা বাজার করে এনে দিল। তখনই বলে দিলে পারতাম। ঠিক আছে। রাতে বলে দিচ্ছি।"

—আজ রাতের ট্রেনে কলকাতায় যাবি না ?

—ইচ্ছে করছে না। বুবুনদা, আর একটা দিন থাকবে ? প্লিজ, থাকো না।

—ইচ্ছে তো আমারও করছে। কিন্তু মায়ের জন্য....তুই তো শুনেছিস।

—তোমার কিন্তু বাড়িতে একবার ফোন করা উচিত ছিল। দাঁড়াও, আমিই করছি।

—কোত্থেকে করবি ?

—কেন, সংঘমিত্রাদের বাড়ি থেকে। পাশের বাড়িটাই তো ওদের।

—কখন করবি ?

—বলো তো, এখুনি। তোমার খাওয়া শেষ হলেই, যাব তা হলে। তুমি কি এখন কোথাও বেরোবে ?

—হ্যাঁ, কাশিমবাজারের দিকে। প্রলয়কে আসতে বলেছি।

—কখন ফিরবে ?

—বিকেলের মধ্যে। কেন রে ?

—তোমাকে নিয়ে একটা জায়গায় যাব।

—কোথায় ?

—ভৈরবতলায় একটা মন্দিরে।

—তুই ঠাকুর দেবতা মানিস ?

—কেন মানব না। মন্দিরে যাবে আমার সঙ্গে, চলো না ?

—কী আছে ওখানে ?

—ভর হয়।

—সেটা আবার কী ?

—চলো না গেলেই দেখতে পাবে।

—ঠিক আছে, যাব।

খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লাম। এ বাড়িতে ট্যাপ ওয়াটার নেই। টিউবওয়েলের জল। হাত মুখ ধুতে গেলেও টিউবওয়েলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, ময়না দাঁড়িয়ে রয়েছে কলতলায়। ওকে দেখেই ধমকে উঠল তিতলি, "ওখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? তোকে বলেছি না, ঘড়ায় জল ভরে রাখতে ?"

ময়না ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘড়া এনে দিল বারান্দয়। ওকে বকাঝকার কোনও দরকার ছিল না। কিন্তু তিতলি বুঝিয়ে দিচ্ছে, ও এই বাড়ির কর্ত্রী। কলকাতার বাড়িতে ও এই সুযোগটা পায় না। আমি অন্তত কোনও দিন কোনও দায়িত্ব পেতে দেখিনি। বাড়ির কেউ ওকে বিশ্বাস করে না। হঠাৎ হঠাৎ এমন সব কাজ করে, ওর ওপর সবার আস্থা চলে গেছে। কাকাবাবু শুনলেও বিশ্বাস করবেন কি না সন্দেহ, তিতলি আমাকে রান্না করে খাইয়েছে। শুধু তাই নয়, হাত-মুখ ধোয়ার পর, এখন আমার হাতের সামনে তোয়ালেটাও এগিয়ে দিচ্ছে।

—মোহন সিনেমার কাছে একটা দোকানে বেনারসি পান পাওয়া যায়। আনিয়ে রেখেছি। তুমি খাবে বুবুনদা ?

বললাম, "পান আমি খাই না। তবু যখন দিচ্ছিস, দে।"

—খেয়ে দেখো, মুখে দিলেই গলে যাবে।

তিতলি আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে। হঠাৎই লক্ষ করলাম, ওর মুখটা ভারভার লাগছে। চোখের কোণটা লালচে। বৃষ্টিতে অতক্ষণ ভেজার কুফল। আমি না টানলে, ও কখনওই আজ বারান্দায় নামত না। যদি জ্বর বাধিয়ে বসে, মুশকিলে পড়ে যাব। মা কী মনে করছে কে জানে ? আজই আমার চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমি নিশ্চিত, তিতলি যাবে না। মনে মনে ঠিক করলাম, বিকেলের মধ্যেই লক্ষ্মীর জন্য দীনেশ দাসের খোঁজ করে ফেলব। কাল সকালের ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে যাব।

তিতলি পেতলের একটা পান-সাজি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। নানা রকম কারুকাজ করা। খাগড়ার দিকে এ ধরনের জিনিস পাওয়া যায়। খাগড়ার পেতল আর কাঁসার কাজ খুব বিখ্যাত। কাকাবাবু শখ করে মাঝেমধ্যে গড়গড়ায় তামাক খান। পেতলের সেই গড়গড়াটার ওপর আমার খুব লোভ। এখান থেকে একটা কিনলে হয়। সেই

সঙ্গে একটা পান-সাজিও। কমলামাসি খুব পান খায়। নিয়ে গেলে খুব খুশি হবে। তিতলিকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই পান-সাজিগুলো কোথায় পাওয়া যায় রে ?"

—অনেক দোকান আছে। প্রসাদকাকাকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে। প্রসাদকাকা অবশ্য এখন নেই। দু'দিন ধরে দেখছি না। মনে হয় ভগীরথপুরে গেছে।

কথাটা শুনে মনে মনে হাসলাম। তিতলি জানে না, প্রসাদকাকা কলকাতায় গেছেন। বললাম, "সন্ধেবেলায় যদি উনি আসেন, একটা কিনে রাখতে বলিস।"

—কেন প্রলয়ই তো আছে। ও জানে। ও আসবে বলছিলে। কই, এল না তো ?

—আসার তো কথা।

—ততক্ষণ না হয় তুমি একটু রেস্ট নাও।

—তুই লাঞ্চ করলি না।

—খেতে ইচ্ছে করছে না।

—না, চল। আমার সামনে বসে খাবি।

—বাবা, আমার জন্য তোমার এত দরদ ! আমার সহ্য হলে হয়। বলেই তিতলি ডাইনিং টেবলে গিয়ে বসল। টেবলে খবরের কাগজটা পড়ে আছে। একটু আগে দিয়ে গেছে। এখানে বেলা একটার আগে কাগজ পাওয়া যায় না। কাগজ পড়ার জন্যই গিয়ে চেয়ারে বসলাম। একটা প্লেটে কয়েক চামচ ভাত আর সামান্য সফেদ কোর্মা নিয়ে তিতলি খেতে বসেছে। দরজার সামনে হুকুমের আশায় এসে দাঁড়িয়েছে ময়না। চোখ পড়তেই তিতলি এমন মুখভঙ্গি করল, ময়না পালাল। ও বোধহয় চাইছে না, এই সময়টায় কেউ সামনে থাকুক।

কাগজের প্রথম পাতাটা মেলে ধরলাম। বিরাট একটা ছবি। মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিংয়ের ধ্বংসাবশেস। ভবানীপুরে পাঁচ তলা একটা বাড়ি হঠাৎ ধসে পড়েছে। দশ জন মারা গেছেন। ঘটনাটা ঘটে কাল ভোরবেলায়। দশটা ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, কংক্রিটের তলায় আরও কিছু লোক চাপা পড়ে আছেন। তাঁদের উদ্ধার করার কাজ চলছে।

চাঞ্চল্যকর খবর। আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। প্রচুর অভিযোগ, প্রোমোটার সম্পর্কে। বাড়িটা তৈরি হয়, দু'বছর আগে। স্যাংশন ছিল চারতলার। প্রোমোটার আর একটা তলা বাড়িয়ে নিয়েছেন। পিলারগুলো দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্যই মারাত্মক এই দুর্ঘটনা। একটা অংশ হঠাৎ ভেঙে পড়েছে। বাড়ির যে অংশটা এখনও দাঁড়িয়ে, তার মালিকরা বলেছেন, গত দু'বছরে তাঁরা একবারও প্রোমোটারের মুখ দেখেননি। বৃষ্টি হলেই বাড়ির তলায় জল জমত। সেই জল বের করার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ফলে পিলারগুলোর ক্ষতি হয়েছে।

খবরটা পড়তে পড়তে খারাপ লাগছিল। এই সব দু'নম্বরি প্রোমোটারদের জন্যই আমাদের এত বদনাম। কী দরকার ছিল, স্যাংশনের বাইরে একটা ফ্লোর করার ? তখন হয়তো কর্পোরেশনের লোকদের টাকা খাইয়েছে। ইন্সপেকশন না করেই কর্পোরেশন সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে। আজ তাই এতগুলো লোকের প্রাণ গেল। সরল বিশ্বাসে লোকগুলো ফ্ল্যাট কিনেছিল। ভাবতেও পারেনি, এই পরিণতি হবে।

মনে মনে ভাবলাম, এ ঘটনা যদি আমাদের তৈরি করা কোনও বাড়িতে হয়, শেষ হয়ে যাব। ফড়েপুকুরের প্রোজেক্টে একবার সুমিতাভ দু'নম্বরি করতে বলেছিল। আমি রাজি হইনি। বেশি লোভই মানুষের বিপদ ডেকে আনে।

নীচের দিকের একটা খবরে চোখ আটকে গেল। "প্রোমোটার নিখোঁজ।" বাড়িটা ভেঙে পড়ার পর পুলিশ প্রোমোটারের বাড়ি গিয়েছিল। তাঁকে পায়নি। প্রোমোটারের নামটা পড়ে আমি চমকে উঠলাম। সুরেশ কাজারিয়া। কাল রাতে ভাগীরথী এক্সপ্রেসে যিনি আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন। লোকটার গাটস আছে। সকালে বাড়ি ভেঙে পড়ার খবরটা নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। পুলিশকে এড়িয়ে, বিকেলের ট্রেন ধরে পলাশীতে এসেছেন। অথবা, বলা যায় না, পুলিশের লোকই হয়তো পলাশীতে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে বলেছে। কলকাতায় সবই সম্ভব। আমরা হলে ভেঙে পড়তাম। আশ্চর্য, কাজারিয়ার চোখ-মুখে উদ্বেগের কোনও চিহ্নই গতকাল দেখতে পাইনি।

॥ তেরো ॥

বাণীদির জন্য পিঙ্ক কালারের একটা চুড়িদার কিনতে বেহালা বাজারে নেমেছিলাম। কিনে দোকান থেকে বেরোনোর মুখেই দেখা মানসবাবুর সঙ্গে। কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। হাতে ফাইল। রাস্তায় দাড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে দেখে বললেন, "আমাদের ওখানে যাচ্ছেন?"

বললাম, "হ্যাঁ। আপনি এখন যাবেন?"

—চলুন তা হলে। আপনার সঙ্গে তো গাড়ি আছে, তাই না?

ঘাড় নাড়লাম। দোকানের বাইরেই বাবলু বসে আছে গাড়িতে। আগে হকারদের উৎপাতে ডায়মন্ডহারবার রোডে হাঁটা পর্যন্ত যেত না। এখন হকার নেই। ফুটপাথে কোনও স্টলও নেই। রাস্তাটা অনেক চওড়া হয়ে গেছে। গাড়ি পার্ক করার জন্য, জায়গা খুঁজতে হয় না। মানসবাবুকে সঙ্গে নিয়ে পিছনের সিটে বসতেই বাবলু স্টার্ট দিল।

বহরমপুর থেকে ফেরার পর, এই প্রথম সেবা-য় যাচ্ছি। তিন-চারদিন সময় পাইনি। ইস্টার্ন বাইপাসে আমাদের সেই প্রোজেক্টের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সুমিতাভ সাইটে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আমার সঙ্গে দেখাও করছে না। হঠাৎ ওর কী হল, বুঝতে পারছি না। বউয়ের সঙ্গে ওর ঝামেলা এখনও মেটেনি। অতীন মাঝে একবার ফোন করেছিল। রমলা আর সুমিতাভর সঙ্গে একটা মধ্যস্থতা করার জন্য ও আমায় ডেকেছিল। কিন্তু সুমিতাভ নিজে আমাকে না বললে, ওই ব্যাপারে আমার যাওয়া ঠিক না। আমি চাই না, ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে।

মানসবাবু জানলার দিকে মুখ করে বসে আছেন। গাড়িতে ওঠার পর থেকে কোনও কথা বলেননি। মুখে চিন্তার ছাপ। হয়তো কোনও সমস্যায় পড়েছেন। এত বড় একটা সংস্থা চালাচ্ছেন। কোনও না কোনও সমস্যা থাকা স্বাভাবিক। সব থেকে বড় সমস্যা, টাকার। সেটা প্রথম দিনই টের পেয়েছি। সেবা-য় যে ক'দিন গেছি, খুব কম দিন মানসবাবুর দেখা পেয়েছি। প্রতিমাদিদের কথা-বার্তায় অবশ্য বুঝতে পারি,

হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান এই ভদ্রলোক টাকা-পয়সা জোগাড়ের জন্য।

কিছু একটা বলতে হয়, তাই জিজ্ঞেস করলাম, "আজ স্কুলে যাননি?"

ম্লান হেসে মানসবাবু বললেন, "যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু বেরোবার পরই পিওন একটা চিঠি দিয়ে গেল। সেটা পড়ে স্কুলে আর যেতে ইচ্ছে করল না।"

—কী চিঠি, মানসবাবু?

—আমাদের প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে আয়ার্ল্যান্ডের একটা অর্গানাইজেশন—গোল। তারা চিঠি পাঠিয়েছে, আয়ার্ল্যান্ড গাভমেন্টের সঙ্গে কী একটা ঝামেলা হয়েছে। তারা আর টাকা পাঠাতে পারবে না।

—তা হলে আপনারা চালাবেন কী করে?

—জানি না। কোনও কিছু ভাবতেও পারছি না।

—ডাক্তার ব্যানার্জি জানেন?

—না, এখনও জানেন না। প্রতিষ্ঠানটা এত বড় করে ফেলেছি, এখন সামলানো যাবে না। মাসে খরচ গিয়ে দাঁড়িয়েছে লাখ দেড়েক টাকা। তিরিশ-বত্রিশটা পেশেন্ট রাখা কম খরচা, বলুন? আমাদের আর কোনও সোর্স নেই। কখনও ভাবিনি, অন্য কোনও সোর্সের কাছে যাওয়ার কথা। বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু-র মতো ব্যাপার।

মানসবাবুর কথা শুনে মনে হল, একেবারে ভেঙে পড়েছেন। সেবায় এতদিন ধরে যাওয়া-আসা করছি, প্রতিষ্ঠানটার সম্পর্কে কিছুই প্রায় জানি না। সেবা আর পাঁচটা নার্সিংহোমের মতো নয়। মূলত, একটা সমাজসেবী সংস্থা। ডাক্তার ব্যানার্জির কথাবার্তাতেই মাঝেমধ্যে সেটা বোঝা যায়। গাভমেন্টের সাহায্য নেওয়ার কথা উঠলে, উনি থামিয়ে দেন। এরা কেন গাভমেন্টের সাহায্য নেন না?

কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যেতেই মানসবাবু বললেন, "না, গাভমেন্টের কোনও হেল্প আমরা নেব না। ওরা দেবে এক আনা। খবরদারি করতে চাইবে বারো আনার। কে সহ্য করবে, বলুন? এমনকী, স্টেট গাভমেন্ট যে সব এন সি এল পাঠায়, তাদের জন্যও আমরা একটা পয়সা নিই না। এটা আমরা শুরু থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম।"

—সেবা শুরু করার আগে কখনও ভাবেননি, গোল টাকা দেওয়া বন্ধ করলে, কী করবেন?

—না, ভাবিনি। ওটাই মস্ত বড় ভুল হয়েছিল তখন। এখন বুঝতে পারছি। মাস তিনেক ওরা কিছু পাঠায়নি। দেনা হয়ে গেছে প্রায় লাখ চারেক। মুদির দোকান, ওষুধের দোকানে অনেক টাকা বাকি। পাওনাদারের জ্বালায় সেবায় বসতে পারছি না। পাওনাদাররা সব কাছাকাছি থাকে। ঢুকতে-বেরোতে দেখলেই এসে সব হাত পাতছে। যাক গে, আমাদের সমস্যার কথা শুনে আপনিই বা কী করবেন?

কথাটা শুনে চুপ করে রইলাম। সত্যিই তো, আমার কিছু করার নেই। আমার যা রোজগার, মাসে দশ-পনেরো হাজার টাকা দিতে পারি। তার বেশি না। ঘটনাচক্রে সেবা-র সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। মুন সুস্থ হয়ে ফিরে গেলে, আর আমার যাওয়ার দরকারও হবে না। তবে এ ক'দিন যাওয়া-আসা করে বুঝেছি, সেবা অন্য এন জি ও-গুলোর মতো নয়। এঁরা অনেক সৎভাবে প্রতিষ্ঠানটা চালান। যদি কোনও

কারণে, তুলে দিতে বাধ্য হন, তা হলে উমা, বাণীদি, আরতিরা অথৈ জলে পড়বে।

মানসবাবুর সঙ্গে টুকটাক কথা বলার ফাঁকে পৌঁছে গেলাম সেবায়। বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে। পেশেন্টদের ভিড় একটু কমের দিকে। লোহার দরজাটা হাট করে খোলা। বাইরে এক লোককে দেখে হঠাৎ মানসবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর বেশ রুক্ষস্বরে বললেন, "কী ব্যাপার ? ফের আপনি ? এখানে ?"

লোকটা বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।"

—এখন তো আমার থাকার কথা নয়।

—চান্স নিলাম। আমার ব্যাপারটা কিছু ভাবলেন ?

—ভাবাভাবির কিছু নেই। আপনাকে তো না বলে দিয়েছি একবার।

—দেখুন মানসবাবু, আপনাদের একটা প্রপোজাল দিয়েছিলাম। কোনও জালিয়াতি করতে বলিনি। কোনও কারচুপি করতে বলিনি। যা সত্যি, তাই লিখে দিতে বলেছি। তার বদলে মোটা একটা ডোনেশনও দিতে চাই। কী অসুবিধা আপনাদের, খুলে বলুন তো ?

মানসবাবুর সঙ্গে আমিও গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়েছি। দু'জনের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। লোকটা যে বেশ অবস্থাপন্ন, দেখেই তা বোঝা যায়। আঙুলে দামি পাথরসহ তিনটে আংটি। গলায় সোনার চেন। সাফারি পরে রয়েছেন। উনি কী প্রস্তাব দিয়েছেন, জানার কৌতূহল হল। মানসবাবু এমনিতে খুব ঠাণ্ডা মেজাজের। কোনও দিন রাগতে দেখিনি। কিন্তু মনে হল, শেষ কথাটি শুনে উনি বেশ চটে উঠলেন। বললেন, "একটাই অসুবিধে। আমার কোনও পেশেন্টকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারব না। প্লিজ, আমাকে আর বিরক্ত করবেন না। এরপর যদি আপনি আসেন, পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হব।"

—পুলিশ দেখাচ্ছেন ? আমিও কিন্তু পুলিশ আনতে পারি। মেয়েদের নিয়ে আপনাদের মতো অর্গানাইজেশনগুলো কী করে, আমরা জানি না, মনে করেছেন ?

মানসবাবু এতক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দিস ইজ টু মাচ ঋচীকবাবু। এর পরও মাথা ঠাণ্ডা রাখা যায়, বলুন ?"

কথাটা শুনে আমারও মেজাজ চড়ছিল। বললাম, "আপনি ভেতরে যান। আমি ট্যাকল করছি।"

কথাটা শোনামাত্রই মানসবাবু আর অপেক্ষা করলেন না। ভেতরে চলে গেলেন। আমি কড়া গড়ায় লোকটাকে বললাম, "আপনার প্রপোজালটা কী, আমাকে বলুন তো মশাই ?"

লোকটা আমাকে জরিপ করে তার পর বলল, "আমার এক বিধবা বউদি এখানে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছেন। সম্পত্তি নিয়ে বউদির সঙ্গে আমাদের একটা মামলা চলছে। তা, মানসবাবুকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, বউদি যে মেন্টাল পেশেন্ট, একটা সার্টিফিকেটে তা লিখে দিন। তার বদলে পঞ্চাশ হাজার টাকা ডোনেশন দেব আপনাদের এই অর্গানাইজেশনকে। এদিকে তো শুনি, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। অত রোয়াব কীসের ?"

—আপনার বউদির নামটা কী বলুন তো ?

—রীতা দাস। আমার বাবাটাও একটা গান্ডু। মারা যাওয়ার আগে একটু সেবা

পেয়েছিল। সম্পত্তির দু'ভাগ লিখে দিয়ে গেছে বউদির নামে। আরে বাঞ্চোত, বউদির তো মাথা খারাপ। সেটা ভাববি না।

নিজের বাবা সম্পর্কে যে লোক এই সব নোংরা কথা বলতে পারে, তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করার কোনও দরকার নেই। সেটা বুঝেই বললাম, "মামলাটা কে করেছেন, আপনার বউদি, না আপনারা ?"

—আসলে বউদিও করেনি। করেছে, ওর শুয়োরের বাচ্চা একটা দাদা। সেটাকে পেলেই পেটাব।

—মানসবাবুদের সার্টিফিকেটটা পেলে কী করবেন আপনারা ?

কোর্টে প্রোডিউস করব। একটা পাগলের হাতে তো আর পৈতৃক সম্পত্তি তুলে দেওয়া যায় না। যাক গে, সে সব কথা। আগে বলুন, আমি কি কোনও অন্যায় আব্দার করেছি ?

—অবশ্যই। ভদ্রমহিলাকে আমি চিনি। আপনারা তো ওকে মেরে ফেলারও চেষ্টা করেছিলেন একবার।

—এ সব বলেছে বুঝি ?

—শুধু বলেননি। লিখিত বয়ানও দিয়েছেন। বেশি ঝামেলা করবেন না। ভাল চান তো কেটে পড়ুন।

—ঠিক আছে। যাচ্ছি। কিন্তু মানসবাবু এটা ভাল করলেন না। বলেই লোকটা উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। যতক্ষণ না গলির বাঁকে অদৃশ্য হল, দাঁড়িয়ে রইলাম। এই ধরনের লোক, পারে না হেন কাজ নেই। টাকা দিয়ে এরা সব কিছু কিনতে পারে। মানসবাবু লোকটার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ভদ্রলোকের এখন এত অর্থাভাব। বলতে গেলে ভেঙে পড়েছেন। একটা লেটারহেডে দু'লাইন লিখে দিলে, হাতেনাতে হাজার পঞ্চাশ পেয়ে যেতেন। এই লোভ সংবরণ করা বেশ শক্ত। কিন্তু ভদ্রলোক এই বিপদেও মাথাটা ঠাণ্ডা রেখেছেন। সাচ্চা লোক। আচ্ছা, এদের জন্য দাদাকে কিছু করতে বললে কেমন হয় ?

ভেতরে আউটডোরে ঢুকে দেখি, ডাক্তার ব্যানার্জি কথা বলছেন একজন পেশেন্টের সঙ্গে। এই সময়টায় মুন আউটডোরে থাকে। সাহায্য করে ডাক্তার ব্যানার্জিকে। আজ নেই। ওর বদলে কাজ করছে পাপিয়া। হয়তো দেখা করতে এসেছিল রেশমিদিদের সঙ্গে। ডাক্তার ব্যানার্জি ওকে বসিয়ে দিয়েছেন। তা হলে কি মুন অসুস্থ ? কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। ডাক্তার ব্যানার্জি অবশ্য বহরমপুরে যাওয়ার দিন, একবার আমাকে বলেছিলেন, মুন ভাল নেই।

আমার দিকে চোখ পড়া মাত্র ডাক্তার ব্যানার্জি মৃদু হাসলেন। তার পর বললেন, "বোসো ঋচীকভাই। এই কেউ মিস বহরমপুরকে একবার ডেকে আন তো।"

ডাক্তার ব্যানার্জি প্রেসক্রিপশন লিখতে শুরু করলেন। সেবা-য় এসে মাঝেমধ্যে অনেক পেশেন্ট দেখি। অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে আমার। প্রথম প্রথম একেকজনের সমস্যা শুনে কৌতূহল হত। গল্প-উপন্যাসের থেকেও বেশি রোমাঞ্চকর। একেকজনকে নিয়ে আলাদা উপন্যাস লেখা যায়। আমাদের লেখকরা তো খাটেন না। বানিয়ে বানিয়ে সব লেখেন। এখানে বসে থাকলেই উপন্যাসের প্রচুর খোরাক তাঁরা পেতেন। ছেলেটাকে ডাক্তার ব্যানার্জি কী যেন বলছেন, এমন

সময় ভেতরের দরজার দিকে চোখ গেল। পর্দা সরিয়ে উঁকি মারল মুন।

অন্য দিন আমাকে দেখলেই ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আজ কোনও ভাবান্তর হল না। বরং আমাকে দেখেই ওর মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে গেল। ডাক্তার ব্যানার্জির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ও কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু ডাক্তার ব্যানার্জি তখন অন্য একজন পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন। এ দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই। মুন আর আমার দিকে তাকালও না। যেন আমাকে চেনে না, এমন ভাব করে ও ফের ভেতরে ঢুকে গেল।

হঠাৎ মুনের কী হল, বুঝতে পারলাম না। ওর সঙ্গে শেষবার একান্তে কথা বলি, ঠিক বারোদিন আগে। সেদিন এখানে স্টোরি টেলিংয়ের অনুষ্ঠান ছিল। চন্দনাদিকেও দেখাতে এনেছিলাম। মনে পড়ল, তারপর থেকে মুন একবারও আমাকে ফোন করেনি। আমিও আমার প্রোজেক্ট আর মাকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম, ফোন করে কথা বলতে পারিনি। মুন আমাকে একদিন বলেছিল, "পাতাল রেল দেখাবে?" নিয়ে যাওয়ার সময় পাইনি। সেজন্যই কি অসন্তুষ্ট হল? হয়তো ভাবছে, আমার কথার কোনও দাম নেই।

অথচ মুনকে আজ চমকে দেওয়ার কত তথ্য আমার হাতে ছিল। বহরমপুরে ওদের বাড়িতে গেছিলাম। যাওয়াটা নেহাত ভাগ্যচক্রে। গোরাবাজারের মুখে নেমে হঠাৎ ইন্দ্রর সঙ্গে দেখা। ও কোচিং ক্লাস সেরে বাড়িতে ফিরছিল। আমাকে দেখে কী করবে, প্রথমে ভেবে পাচ্ছিল না। জোর করে ধরে নিয়ে গেল। ঘণ্টা দেড়েক ছিলাম, মুনদের বাড়িতে। সেই সব গল্প শোনাব বলেই আজ আমার আসা। অথচ মুন এমন ভাব দেখাল যেন আমাকে চেনেই না।

সোফায় বসে মুনদের বাড়ির কথা ভাবছি। আজকাল আমার অদ্ভুত ভাল লাগছে ওদের বাড়িটা নিয়ে ভাবতে। ইন্দ্রর সঙ্গে আমাকে দেখে মাসিমার মুখটা প্রথমে ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল। বোধহয় ভেবে নিয়েছিলেন, কোনও ভয়ানক খবর শোনাতে গেছি। মুন ভাল আছে শুনে, তারপর মাসিমা যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছিলেন। আমাকে কী ভাবে আপ্যায়ন করবেন, তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সত্যি বলতে কী, একটু লজ্জায় পড়ে গেছিলাম।

তিতলিদের বাড়ির একশো গজের মধ্যেই মুনদের বাড়ি। ওর ঠাকুর্দা জমিদার ছিলেন ভগীরথপুর বলে একটা গ্রামের। বিশাল সম্পত্তি। মুর্শিদাবাদের নবাব ফ্যামিলির সঙ্গে ওনার ওঠা-বসা ছিল একটা সময়। মুনের ঠাকুর্দা নাকি নামকরা শিকারী ছিলেন। বাড়িতে তিনটে হাতি ছিল সেই সময়। হাওদায় বসে উনি শিকারে যেতেন। একবার কোথায় গিয়ে যেন বাঘ মেরেছিলেন। সাহেব কালেক্টর সেজন্য মুনের ঠাকুর্দাকে একটা বন্দুক উপহার দেন। বাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানোর সময় ইন্দ্র আমাকে সেই বন্দুক, বাঘের মুখ আর চামড়া দেখিয়েছিল। মাসিমা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "হাতির সেই রুপো হাওদা এখনও আমাদের ভগীরথপুরের বাড়িতে আছে বাবা। তিনশো কেজি ওজন। তার কাজ দেখলে তোমার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।"

মুনদের বাড়িতে লোক মাত্র তিনজন। অথচ কাজের লোক আট-দশজন। সারা বাড়িতে হইচই বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন মাসিমা। আমি একবার শুধু বলেছিলাম, "আপনি এত ব্যস্ত হবেন না।" কথাটা শুনেই উনি বলে উঠেছিলেন, "কী বলছ তুমি, ঋচীক?

আমাদের জন্য তুমি যা করেছ, আপনজনও এত করে না। মনে করো, আমি তোমার আরেকটা মা। ঘোষালদের বাড়িতে আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। না খাইয়ে আজ তোমাকে ছাড়তেই পারব না। আমার কপালটাই খারাপ। আমার মুন যদি আজ থাকত, তুমি না খেয়ে যেতে পারতে ?

শেষের ওই কথাটাই সেদিন আমাকে আটকে দিয়েছিল। মুনের অস্তিত্ব আমি যেন টের পাচ্ছিলাম। ওই বাড়ির সর্বত্র মুন। কথায় কথায় ওর উল্লেখ। এটা মুনের পছন্দ। এটা সাজিয়ে রেখে গেছে ও। এটা কিনে এনেছিল। ও সব থেকে ভালবাসে এটা। দিদির সবচেয়ে প্রিয় বাবার লাইব্রেরি। কাউকে ঢুকতে দেয় না। ইন্দ্র আমাকে ওই ঘরটায় নিয়ে গেছিল। দেওয়াল জুড়ে কাচের শো-কেস। তাতে প্রচুর বই। দেওয়ালে দুটো বড় অয়েল পেন্টিং। ইন্দ্রর ঠাকুর্দা আর বাবার। পেন্টিংটা দেখেই মনে হয়েছিল, খুব রূপবান ছিলেন ভদ্রলোক। তলায় লেখা ১৯৪৮—১৯৯৩। তা হলে খুব বেশিদিন ভদ্রলোক মারা যাননি।

মাসিমা পরে বলেছিলেন, "উনি খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন। পড়াশুনো নিয়ে থাকতেন। ডাবল এম-এ। একবার বললেন, কলকাতায় একটা বাড়ি কিনবেন। মুন আর ইন্দ্র একটু বড় হলেই, ওদের ওখানে পাঠিয়ে দেবেন। ওখানে থেকে ওরা পড়াশুনা করবে। তখন আমি বারণ করলাম। কে দেখাশোনা করবে, বলো ? তখন যদি রাজি হতাম, আজ আমাকে অন্যের বাড়ি গিয়ে উঠতে হত না। তখন কি জানতাম, মুনকে নিয়ে আমার এত প্রবলেমে পড়তে হবে ?"

সেবা-য় বসে মুনদের বাড়ির কথা ভাবছি। হঠাৎই মনে পড়ল, ওদের বাড়িতে দেখা একটা ছবির কথা। একদম মুনের মুখটা যেন বসানো। কে এই ভদ্রমহিলা ? জিজ্ঞেস করায় ইন্দ্র বলেছিল, "আমার পিসিমণি। বিয়ের সাতদিনের মাথায় বিধবা হন। তারপর মেন্টাল পেশেন্ট হয়ে যান। নাকি খুব শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন। কুড়ি-একুশ বয়সে সুইসাইড করেন কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে। আমি অবশ্য পিসিমণিকে দেখিনি।"

মুন সম্পর্কে এই তথ্যটাই ডাক্তার ব্যানার্জিকে দিতে হবে। ওদের পরিবারে আরও একজন মানসিক রোগী ছিলেন। এতদিন ধরে সেবা-য় আসছি। জানি, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ডাক্তার ব্যানার্জি একবার বলেছিলেন, "পরিবারে একজন যদি সাইকো পেশেন্ট থাকে, তা হলে অন্যরাও এফেক্টেড হতে পারে।" একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন উনি। হাওড়ার এক ফ্যামিলির। প্রথমে একজন অসুস্থ হয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনজন সাইকো পেশেন্ট হয়ে যান।

পিসিমণিকে ইন্দ্র দেখেনি, বলেছিল। মুন কি দেখেছে ? জিজ্ঞাসা করা হয়নি। জেনে আসা উচিত ছিল, ঠিক কত বছর আগে ওই ভদ্রমহিলা সুইসাইড করেন। তখন এতটা ভাবিনি। তাড়াহুড়ো করে উঠে এসেছিলাম। এখন ডাক্তার ব্যানার্জি জানতে চাইলে বলতে পারব না। পনেরো-কুড়ি বছর আগেও, মানসিক রোগে চিকিৎসা এত উন্নত ছিল না। তখন চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে মানুষ এত সচেতনও ছিল না। এই একটু আগে, ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় নার্ভাস হয়ে পড়ার জন্য, একটা ছেলে সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ নিয়ে গেল। অথচ একটা সময় লোকে ভাবতেও পারত না,

মনোবিজ্ঞানীদের কাছে আসা কত দরকার। তখন কবিরাজি চিকিৎসা চলত। লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে, হয়তো পেশেন্টরা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে এমনিতেই মারা যেত।

পেশেন্ট দেখা শেষ করে ডাক্তার ব্যানার্জি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাও, উপরে চলে যাও। মিস বহরমপুরের সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করো।"

কথাটা শুনেই পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বাঁ দিকের ঘরে কিছু মেয়ে বসে হাতের কাজ শিখছে শম্পার কাছে। ডানদিকে রান্নাঘরের সামনে বসে কাজে ব্যস্ত আরও কয়েকজন। বাণীদিও রয়েছে তাদের মধ্যে। আমাকে দেখে হাসল।

সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে গেলাম। বিছানায় শুয়ে আছেন মাসিমা। এই সময়ে শুয়ে থাকার কথা নয়। বোধহয় অসুস্থ।

হলঘর পেরিয়ে ডানদিকের ঘরে যেতেই দেখি, মুন। বারান্দায় গ্রিলের সামনে দাঁড়িয়ে। সদ্য স্নান করে উঠেছে। কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে চুল। এখানকার মেয়েদের মধ্যে এত বড় চুল আর কারও নেই। উকুন হয় বলে, এখানে আসার পরই মেয়েদের চুল কেটে দেওয়া হয়। তবে মুনের ব্যাপার আলাদা। ও আছে পেয়িং বেডে। অন্যদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক নেই।

পিছনে দাঁড়িয়ে বললাম, "মুন, রাগ করেছ?"

কোনও উত্তর নেই।

কাঁধে হাত দিয়ে এবার বললাম, "কথা বলবে না? কত কাজ ফেলে এসেছি, জানো? স্রেফ তোমাকে একটু দেখার জন্য।"

মুন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দু'হাত দিয়ে ওকে নিজের দিকে ঘোরালাম। মুখটা থমথমে। চোখের কোণে জলের বিন্দু। চিবুকটা তুলে ধরতেই গাল বেয়ে নেমে এল অশ্রু। কী সুন্দর লাগছে, ওকে দেখতে। ওর পাতলা ঠোঁট তিরতির করে কাঁপছে। দু'হাতে ওর মুখটা তুলে ধরলাম।

—কী হয়েছে মুন, আমায় বলো। এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না?

মাথা নাড়ল মুন। তারপর দু'চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। কী নিষ্পাপ দুটো চোখ। আমার সারাটা শরীর কেঁপে উঠল সেদিকে তাকিয়ে। ওই দুটো চোখের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়। জীবনে কোনওদিন কোনও মেয়ের দিকে এমন ভাবে তাকাইনি।

মুন চোখ নামিয়ে নিল। থমথমে ভাবটা কেটে গেছে। ওর মুখটা ফের স্বাভাবিক হয়ে আসছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সেই পরিবর্তনটা দেখতে লাগলাম। কিছু জিনিস আছে, যা ছোঁয়া যায় না। অনুভব করতে হয়। আঙুল দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দেওয়ার সময় আমি সেটা অনুভব করলাম। মনে হল, ওর সামনে অনন্তকাল ধরে, যদি আমি এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি, তা হলেও মুন পুরনো হয়ে যাবে না। আমার চোখে বিস্ময় হয়ে থাকবে।

ওই ভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ মুন বলল, "এই, তুমি অমন করে আমার দিকে তাকাবে না।"

—কেন?

—আমার শরীরের ভেতরটা কেমন যেন করছে।

—কেমন করছে ?

—জানি না, যাও।

—মুন।

—উঁ।

—বহরমপুরে গেছিলাম।

—জানি। ডাক্তারবাবু বলেছে। তুমি যাবে, আমাকে বলোনি কেন ?

—ও, এ জন্যই রাগ করেছ ? হঠাৎ যেতে হল, না হলে...

—আমাদের বাড়িতে গেছিলে ?

—হ্যাঁ।

—বুড়ি কেমন আছে গো ?

—কে বুড়ি ?

—দেখনি ? ইন্দ্র দেখায়নি ? আমাদের বারান্দায়। আমি পুষেছি। সবুজ রঙের বড় একটা টিয়া ?

—ও, ভাল আছে। আমাকে দেখে বলল, মুন মা কেমন আছে গো ?

—আমি কথা বলতে শিখিয়েছি। ইস, তুমি গেলে। আমি যদি থাকতাম, খুব ভাল লাগত। আমার মন সেদিন খুব খারাপ হয়ে গেছিল।

—এখান থেকে যেদিন তোমার ছুটি হবে, সেদিন তোমার সঙ্গে আমি যাব।

—ঠিক ? তখন কিন্তু বলো না, কাজ আছে।

—না, বলব না।

—মা ভাল আছে ?

—মোটামুটি। তোমার জন্য সবাই খুব ভাবে। তোমাকে সবাই খুব ভালবাসে মুন।

—তুমি ?

—খুউব।

—তোমাকে বাণীদি খুব ভালবাসে, জানো।

—তুমি কী করে জানলে ?

—আমাকে বলে যে। একদিন বলল, মুন তুই আমার কাছ থেকে, ঋচীককে ছিনিয়ে নিস না। তা হলে আমি সুইসাইড করব। কেন বলল গো ?

—ওর কথায় কান দিয়ো না।

—জানো, তুমি যখন এখানে আসো, তখন তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে বাণীদি। অন্য মেয়েদের বলে, বিয়ে করলে তোমাকেই করবে। একদিন মায়া কী বলেছিল। বাণীদি খুব রেগে গেল। ঠাস করে চড় মারল। সারাদিন খেল না। তখন প্রতিমাদি এসে বলল, বাণীদি তুমি খাওনি...ঋচীক এসে শুনলে রেগে যাবে। তখন খেল। আমায় বলে, তোর মতো দেখতে যদি সুন্দর হতাম...হ্যাঁ গো, এখন আমি সুন্দর ?

—আমার চোখে সব থেকে সুন্দর।

—আমার অসুখটা যদি না হত...

—অসুখ তো সেরে গেছে মুন।

—না গো। এখনও সারেনি। আমি জানি। আমার এখনও ভয় করে। তোমার খুব সাহস, না ?

—খুব।

—তুমি একটা ছেলেকে মারতে পারবে ?

—কে বলো।

—অন্য দিন বলব।

—কেন এখনই বলো।

—মনে পড়ছে না। হ্যাঁ গো, চন্দনাদি তোমার দিদি হয় ?

—হ্যাঁ, দিদির মতো।

—আরশোলা দেখে ভয় পায় ? কী বোকা, না ? প্রতিমাদি না, সে দিন একটা মাটির আরশোলা এনে ওর ভয় ভাঙিয়ে দিচ্ছিল। যতবার বলে, এই আরশোলাকে ধরুন, তোমার চন্দনাদি কিছুতেই ধরবে না। তার পর আমরা সবাই ধরলাম দেখে, চন্দনাদিও ধরল। তার পর ধরেই রইল। ভয় পেল না।

—দেখো তা হলে। মনে করলেই ভয়, নইলে কিছুই নয়।

মুন আরও কাছে সরে এল। তারপর আমার বুকে মুখ রেখে বলল, "জানো, চন্দনাদি না সেদিন আমাকে একটা বাজে কথা বলে গেছে।"

—যাঃ। বলতেই পারে না।

—না গো, বলেছে।

—ধ্যাত, বলতেই পারে না। কী বলেছে, আমায় বলো।

—চন্দনাদির নাকি একটা বোন আছে ?

—হ্যাঁ আছে। তিতলি। কেন গো ?

—তার সঙ্গে কি তোমার বিয়ে হবে ? শুনে এত মন খারাপ হল, ঠিকই করলাম, আমি আর ভাল হব না। কী হবে ভাল হয়ে ?

॥ চোদ্দো ॥

—অর্ণববাবু, আপনার সঙ্গে সিরিয়াস একটা কথা আছে।

আউটডোরে ঢুকে, কাউকে তোয়াক্কা না করেই কথাটা বললেন ভদ্রলোক। বয়স পঞ্চাশের ওপাশে। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। কাঁচা-পাকা চুল। বেশ ভারী শরীর। চোখ দুটো দেখে মনে হল, অসম্ভব ধূর্ত। ডাক্তার ব্যানার্জিকে এখানে কেউ নাম ধরে ডাকে না। এতদিন সেবা-য় আসছি, আমি অন্তত কাউকে নাম ধরে ডাকতে শুনিনি। ভদ্রলোককে আগে কখনও দেখিনি। বুঝতে পারলাম না, কে ইনি।

অল্পবয়সী একজন পেশেন্টকে দেখছিলেন ডাক্তার ব্যানার্জি। এম পি ডি কেস। বাধা পড়ায় মুখ তুলে ভদ্রলোককে একবার দেখে তারপর বললেন, "ওহ্ পতিতুণ্ডবাবু, আপনি পাশের ঘরে বসুন। আমি এখন পেশেন্ট দেখছি।" ভদ্রলোককে উপেক্ষা করেই ডাক্তার ব্যানার্জি ফের কথা বলতে শুরু করলেন পেশেন্টের সঙ্গে।

ডাক্তার ব্যানার্জিকে যত দেখছি, আজকাল ততই অবাক হচ্ছি। মনোরোগ

বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রচুর নাম ভদ্রলোকের। এখানে তা বোঝা যায় না। চিকিৎসা করেন নতুন পদ্ধতিতে—লোগোথেরাপি। একদিন কথায় কথায় আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। মনোবিজ্ঞানীরা একেকজন একেকজনের তত্ত্বে বিশ্বাসী। কেউ ফ্রয়েডিয়ান পদ্ধতি পছন্দ করেন। কেউ ইয়ুং, কেউ এডলারের। আবার কেউ ফ্রাঙ্কেলের। ডাক্তার ব্যানার্জি ফ্রাঙ্কেলের ভক্ত। ওঁর মুখেই শুনেছি, এই পদ্ধতিতে, উনি রোগীর মনের খুব কাছাকাছি চলে যান। তার বিশ্বাস অর্জন করেন। তারপর তাকে ধীরে ধীরে সারিয়ে তোলেন। মনোরোগীদের আস্থা অর্জন করা যে কত শক্ত, তা আমিও টের পাচ্ছি। মুনের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক। তা সত্ত্বেও, এখনও বের করতে পারলাম না, ওর ভয়ের আসল কারণটা কী ? কালো কোট পরা লোক দেখলে ও ভয় পায় কেন ? সেদিন বলতে গিয়েও, ও বলল না। ধৈর্য ধরে আছি। এ সব ক্ষেত্রে প্রচুর ধৈর্যের দরকার। আউটডোরে বসে আমি উসখুস করছি। সেবা-য় আজ দাদার আসার কথা। সিঙ্গাপুরে কনফারেন্স সেরে দাদা, দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় এসেছে। দু'দিন পরেই জুরিখ ফিরে যাবে। মায়ের নামে একটা চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি খোলার জন্য দাদা উদ্যোগ নিয়েছিল। খরচ জোগাবে জুরিখের একটা সমাজসেবী সংস্থা। এন আর আই-রা মিলে এই সংস্থাটা করেছে। দাদার মাথায় আমি ঢুকিয়েছি, সেবা-র কথা। এই প্রতিষ্ঠানটা আগে বাঁচুক। দাদা বলেছে, নিজের চোখে দেখবে। তারপর ডিসিশন নেবে।

সেবা-র কাউকে কিছু বলিনি। দাদার আসল পরিচয়ও দেব না। আমার জানাশোনা একজন আসবে, শুধু এই কথাটা ডাক্তার ব্যানার্জিকে বলে রেখেছি। বাবলুকে বলে দিয়েছি, বারোটা-সাড়ে বারোটা নাগাদ যেন নিয়ে আসে দাদাকে। আগে থেকে ঢাকঢোল পেটানোর কোনও দরকার নেই। তারপর যদি কিছু না হয়, তা হলে আমাকে লজ্জায় পড়তে হবে। এরা সত্যি সত্যি সংকটের মধ্যে রয়েছে। সেবা-র জন্য কিছু করা দরকার, এটা অনুভব করছি। আমার মুনকে এঁরা সারিয়ে তুলছে।

দু'বছর পর দাদা আসায় বাড়ির পরিবেশটাই এখন পাল্টে গিয়েছে। রোজ রোজ আত্মীয় স্বজনরা আসছে। বুটু কাল ঘুরে গেছে ওর বরের সঙ্গে। মাটিতে পা পড়ছে না ওর। বিয়ে করে এখন জ্ঞান দিতে শুরু করেছে আমায়। দাদার সামনেই কাল আমায় বলল, " বুবুনদা, তুই নাকি কাকে পছন্দ করে রেখেছিস। বিয়েটা সেরে ফেল তা'লে। কব্জি ডুবিয়ে ক'দিন খাই আমরা।"

বললাম, "তুই কোত্থেকে শুনলি ?"

— যেখান থেকেই শুনি, তোর কী। খবরটা সত্যি কি না বল।

— তোর খবর মিথ্যে হতে পারে ?

— একদিন দেখাবি না ? তুই কী রে ?

— চল তা হলে।

— কোথায় ?

— মেন্টাল হোমে।

— ইয়ার্কি করছিস ? ঠিক আছে, আমি ঠিক বের করে নেব।

— এখন সময় পাবি ?

কথাটা শুনে দাদা হেসে উঠেছিল। তারপর বলেছিল, "কে রে মেয়েটা ?"

— তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

ভেবেই রেখেছি, দাদা আজ সেবায় এলে মুনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। মুন এখন আমার সামনেই বসে। ডাক্তার ব্যানার্জিকে সাহায্য করছে আউট ডোরে। ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। চকরা বকরা একটা সিন্থেটিক শাড়ি পরে আছে। ও যা পরে, তাতেই মানিয়ে যায়। মা ওকে এখনও দেখেনি। তবে ওর গলার সঙ্গে পরিচিত। মাঝেমধ্যে মুন ফোন করে। কোনও দিন জিজ্ঞেস করেনি, তবে আমি জানি, মা ঠিক বুঝে গেছে, মুনের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক।

একটা মেয়ে প্রেসক্রিপশন নিয়ে উঠে গেল। মুন ডেকে নিয়ে এল পরেশ ভট্টাচার্য বলে একজন পেশেন্টকে। আমারই বয়সী। সঙ্গে বোধহয় স্ত্রী। দেখে মনে হল, খুব বেশি দিন বিয়ে হয়নি। এই বয়সী স্বামী-স্ত্রীরা বেশিরভাগই আসে সেক্সচুয়াল সমস্যা নিয়ে। কোনও কারণে বোধহয় ব্যাহত হচ্ছে। ডাক্তার ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে তোমার, পরেশ ? কী করো তুমি ?"

ছেলেটা বলল, "চাকরি। ব্যাঙ্কে।"

— বাহ্, সে তো খুব আরামের চাকরি। কাজ-টাজ খুব কম। কী অসুবিধে, তোমার ?

ছেলেটা একবার আমার আর মুনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ডাক্তার ব্যানার্জি, আমি একটু প্রাইভেটলি বলতে চাই।"

— দূর বোকা। হাসপাতালে প্রাইভেসি বলে কিছু আছে নাকি ? বলে ফেল।

— আমার একটা প্রবলেম আছে। সেই ছোটবেলা থেকে।

— কী রে ?

— রাতে ঘুমিয়ে থাকার সময় বিছানায় পেচ্ছাপ করে ফেলি।

কথাটা বলেই পরেশ ভট্টাচার্য মুখ নিচু করে ফেলল। মুন মিটিমিটি হাসছে। সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সী একটা ছেলে এখনও বিছানায় পেচ্ছাপ করে ফেলে.....এমন অদ্ভুত রোগ কখনও শুনিনি। জগতে কত লোকের কত সমস্যা ! সেবায় না এলে কোনওদিন জানতেও পারতাম না। বউটা বলল, "ডাক্তারবাবু, ওর ভীষণ লজ্জা। কিছুতেই এখানে আসতে চায় না। আমি বললাম, রোগ যখন, ডাক্তার দেখালে তখন সেরে যাবে। লজ্জা করে লাভ নেই। দেখুন না, ভয়ে কোথাও গিয়ে, রাতে থাকতে চায় না। লোকে ভুল বোঝে।

ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "আগে কখনও কোনও ডাক্তার দেখিয়েছ ?"

— না। যেতে চায় না।

— তুমি কতদূর পড়াশুনো করেছ ভাই ?

— এম এ। সাইকোলজি নিয়ে।

— ও, তাই আমার কাছে নিয়ে এসেছ ?

— হ্যাঁ।

— খুব ভাল করেছ। এটা একটা অসুখ। নাম নক্টারনাল ইনিউরেসিস। ট্রিটমেন্ট করালে ভাল হয়ে যাবে। চিন্তা কোরো না। মাঝেমধ্যে এখানে আসতে হবে। পারবে ?

— কেন পারব না ?

— ঠিক আছে, সামনের শনিবার এসো। আমাদের এখানে সাইকোলজিস্ট আছেন—প্রতিমা দাশগুপ্ত। ওর সঙ্গে কয়েকটা দিন বসতে হবে। তুমি থাকলে সুবিধা হয়।

কথাটা বলেই, ডাক্তার ব্যানার্জি প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। তার পর পরেশ ভট্টাচার্যকে বললেন, "এই রোগটা খুব রেয়ার। আর কিছু নয়, পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। বছর দশেক আগে, একবারই মাত্র আর একজনকে পেয়েছিলাম। তোমার ভাগ্য ভাল, এমন সিমপ্যাথেটিক একটা মেয়েকে বউ হিসাবে পেয়েছ। সেই লোকটার বউ.....এমন করল, শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স।"

প্রেসক্রিপশনটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে পরেশ ভট্টাচার্য উঠে দাঁড়াল। ডাক্তার ব্যানার্জি সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন। মনে হল, টায়ার্ড। ঘন্টা দু'ই-আড়াই টানা পেশেন্ট দেখছেন। ক্লান্ত হওয়ারই কথা। ভদ্রলোক প্রাইভেট প্র্যাকটিস করলে প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারতেন। ইচ্ছে করলে সরকারি হাসপাতালে চাকরি নিতে পারতেন। সমাজ সেবা করার জন্য নেননি। উনি কী ভাবে এই প্রতিষ্ঠানে এলেন, সেই গল্প শোনা হয়নি। তবে মনে হয়, এই অঞ্চলেরই লোক। মাঝেমধ্যে বলতে শুনেছি, "একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাব।" মানে, মা এই অঞ্চলেই থাকেন। এইসব কথা ভাবছি, এমন সময় পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলেন মনোময়বাবু। ডাক্তার ব্যানার্জি ওঁকে দেখেই বললেন, "কী ব্যাপার, মনোময়বাবু অ্যাদ্দিন পর?"

ভদ্রলোককে এর আগেও দেখেছি। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। ওষুধের স্যাম্পল দিয়ে যান মাঝেমধ্যে। বললেন, "ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠলাম কিছুদিন। তাই আসতে পারিনি।"

— হিপ্পোরিল এনেছেন? আমাদের খুব দরকার।

— জানি। সেজন্যই তো ছুটে এলাম। আজ কয়েকটা বেশি ফাইল দিয়ে যাব।

—গুড। কত ওষুধ আর কিনব, বলুন তো? মাসে পাঁচ-সাত হাজার টাকা তো ওষুধ কিনতেই চলে যায়। তবু ভাল, আপনাদের মতো কিছু লোক আছেন, যারা সাহায্য করে যান।

মনোময়বাবু চাপা গলায় বললেন, "বাইরের ঘরে পতিতুণ্ডকে বসে থাকতে দেখলাম, কী ব্যাপার?"

— পাওনা টাকা চাইতে এসেছে বোধহয়। ওর দোকানে ষাট-সত্তর হাজার বাকি পড়ে গেছে। কীভাবে শোধ হবে, জানি না।

—এ ভাবে কদ্দিন চালাবেন ডাক্তারবাবু?

—চলবে। এভাবেই চলবে। মেয়েগুলোকে তো আর বাইরে বের করে দিতে পারি না। যাবে কোথায়?

ব্যাগ খুলে মনোময়বাবু ওষুধ বের করে দিচ্ছেন। রেশমিদি গুনে গুনে নিচ্ছেন। মুন আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "চা খাবে? সকালে কিছু খেয়ে বেরিয়েছিলে?"

ওষুধের ফাইলে চোখ ডাক্তার ব্যানার্জির। কিন্তু কান এদিকে। হঠাৎ বলে উঠলেন, "বাঃ চমৎকার। সারিয়ে তুললাম আমি, আর চা সাধা হচ্ছে অন্যকে? সকাল থেকে যে একবার মাত্র চা খেয়েছি, কারও খেয়াল আছে?"

মুন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আপনাকে চা দেব কী করে ? লেবু-চা ছাড়া আপনি খাবেন ? লেবু না থাকলে আমি কী করব ?"

— ও, তোদের এখানে আসার সময় তা হলে লেবুও নিয়ে আসতে হবে ? লেবু থাক, বা না থাক, মুখে একবার জিজ্ঞেসও তো করতে পারতি ?

রেশমিদি হেসে বললেন, "না ডাক্তারবাবু, মুন গিয়ে দু'বার আমাকে জিজ্ঞেস করে এসেছে। ওর কোনও দোষ নেই।"

—তা হলে দোষটা আমারই। ছ্যা ছ্যা, আর কখনও লেবু-চা খাব না। মনোময়বাবু মুনের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। হঠাৎ বললেন, "ডাক্তার ব্যানার্জি যদি কিছু মনে না করেন তো, একটা কথা বলি।"

—বলুন, মনে করার কী আছে।

—আমাদের কোম্পানির যিনি মালিক, তার একটা ছেলে আছে। ব্যবসা সে-ই এখন দেখাশুনো করে। তার বিয়ের উদ্যোগ চলছে। মুন মা-কে দেখি, আর ভাবি, চার হাত এক করে দেওয়া গেলে ভাল হত। আমার স্ত্রীকে সেদিন বললাম। উনি বললেন, প্রস্তাবটা দিয়েই দেখো না ডাক্তারবাবুকে। ডাক্তার ব্যানার্জি মিটিমিটি হাসতে শুরু করলেন। তার পর বললেন, "ছেলের স্বাস্থ্যটাস্থ্য কেমন ?"

—মোটামুটি, তবে ছেলে হিসাবে খুব ভাল।

—তা হলে হবে না। মার খেয়ে মরে যাবে। মুনের পেছনে লম্বা লাইন। তার মধ্যে এমন একজন আছে, যার ফোর আর্ম উনিশ ইঞ্চি। হাত, না হাতুড়ি বোঝা যায় না। সে এখানেই আছে।

—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—এ জন্যই তো আপনার দ্বারা ঘটকালি হবে না। সেবা-র জন্য মাস ছয়েক, ফ্রি-তে সব ওষুধ দিতে পারবেন। তাহলে প্রস্তাবটা ভেবে দেখব।

রসিকতাটা বোধহয় মনোময়বাবু বুঝতে পারলেন না। অ্যাটাচি কেস বন্ধ করার ফাঁকে সরলভাবে বললেন, "কথাটা তা'লে বলে দেখি মালিককে।" ডাক্তার ব্যানার্জি সিরিয়াস, "তাড়াতাড়ি জানাবেন কিন্তু।" মনোময়বাবু বেরিয়ে যেতেই আমি জোরে হেসে উঠলাম। ডাক্তার ব্যানার্জি পারেন বটে। মুনও হাসছে। হাসতে হাসতে বলল, "এ নিয়ে ক'জনকে আপনি আশা দিলেন।"

—চার পাঁচ জন তো বটেই। আমি কী ঠিক করেছি, জানিস ? এখানে তোকে রেখে দেব। ব্যস, বিনে পয়সায় ওষুধ... বিনে পয়সায় চাল ডাল..." বলেই ফিকফিক করে হাসতে শুরু করলেন ডাক্তার ব্যানার্জি, আমার দিকে তাকিয়ে।

করিডোরে কয়েকজন রোগী তখনও বসে। তাঁদের একজনকে ডেকে দিয়ে মুন ভেতরে চলে গেল। পেশেন্টকে আমি চিনি। রেখা সামন্ত, একটা সময় মাস ছয়েক সেবায় ছিল। ভাল হয়ে চলে গেছে। রেখার বিয়ে হয়েছে মাস তিনেক আগে। সে দিন সেবা-র সবার নেমন্তন্ন ছিল। মেয়েটা মাঝেমধ্যে আসে চেক আপ করাতে। ওকে দেখলে ডাক্তার ব্যানার্জি খুব খুশি হন। সেরে উঠে একটা মেয়ে সংসার করছে—বোধহয় এই কারণেই।

সঙ্গে রেখার স্বামী। বলল, "ভাল আছেন ডাক্তারবাবু ?"

ডাক্তার ব্যানার্জি আজ খুব ভাল মেজাজে। বললেন, "কেন ? আমার অসুখ

করেছিল নাকি ?"

উত্তর শুনে ছেলেটা থতমত খেয়ে গেল। রেখা ডাক্তার ব্যানার্জিকে জানে। মজা পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "দিনকাল কী হল রে। ডাক্তারকেই এখন পেশেন্টরা জিজ্ঞাসা করছে, কেমন আছেন।"

রেখা বলল, "ও কি পেশেন্ট ? পেশেন্ট তো আমি।"

—ওই হল। তোমার মতো পাগলিকে জেনেশুনে যে বিয়ে করে, সে কি সুস্থ মানুষ রে ?

—ডাক্তারবাবু, ভাল হবে না বলছি। আমার বর খুব ভাল।

—ই-ই। মুখ ভেঙালেন ডাক্তার ব্যানার্জি। বললেন, "ওষুধ বন্ধ হলেই তো বরকে জ্বালাতে শুরু করবি। খাচ্ছিস ঠিক মতো ?"

রেখা ঘাড় নাড়ল। ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "খেয়ে যা। হ্যাঁ রে, শ্বশুর-শাশুড়িকে কোনও ট্রাবল দিচ্ছিস না তো ?"

—না। ওরা খুব ভালবাসে আমাকে।

—যা, ভাগ।

রেখা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ডাক্তারবাবু, আরতিদের সঙ্গে একবার দেখা করে যাব ?"

—কেন রে, বরের গল্প করবি বুঝি ?

—না, আরতির জন্য একটা জিনিস এনেছি। ওকে দেব।

—কী আমাকে দেখা।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা প্যাকেট বের করে আনল রেখা। খুলে দেখাল, সুন্দর একটা হেয়ার ব্যান্ড। দেখে ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "বাঃ, খুব ভাল। দিয়ে আয়।"

রেশমিদি একপাশে দাঁড়িয়ে। সব শুনছিলেন। বললেন, "রেখাটা কত বদলে গেছে, দেখে তাই ভাবছি। প্রথম যেদিন ওর বাবা দিয়ে গেল, সেদিন সামলাতেই পারি না। আমার হাত কামড়ে দিয়েছিল।"

কৌতূহল হল শুনে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কী হয়েছিল রেখার ?"

—বাই পোলার ডিস অর্ডার।

ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, "গেল আমার ডাক্তারি সব গেল। রেশমিদিও সব শিখে গেছে। বুঝলে ঋচীক ভাই, আমাকে আর দরকারই হবে না।"

লজ্জা পেয়ে রেশমিদি পালালেন। জন্মলগ্ন থেকে সেবায় আছেন ভদ্রমহিলা। মেয়েদের সব দায়িত্ব ওনার ওপর। চব্বিশ ঘণ্টা সেবায় থাকেন। অবিবাহিতা। বয়স চল্লিশের ওদিকে। ব্যবহার খুব সুন্দর। সব সময় হাসিখুশি। মাইনে পান কি না, জানি না। কিন্তু ভদ্রমহিলা যা পরিশ্রম করেন, কোনও মাইনে যথেষ্ট নয়। সেবার মনোভাব নিয়ে না এলে, কেউ এত খাটে না।

পতিতুণ্ড লোকটা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকক্ষণ বসে রয়েছেন। বোধহয় অধৈর্য। লোকটাকে দেখা মাত্রই ডাক্তার ব্যানার্জির চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেল। বললেন, "আপনি মানসবাবুর সঙ্গে দেখা করুন। টাকা-পয়সার ব্যাপার, উনি ডিল করেন।"

পতিতুণ্ড বলল, "ওষুধের বাকি টাকা আমি চাইতে আসিনি ডাক্তারবাবু। ও জানি, আপনি আছেন, ঠিক পেয়ে যাব। আমি এসেছি একটা অন্য কারণে।"

—বলুন।

—ডাক্তারবাবু, আপনাকে একটা কাজ করে দিতে হবে।

—কাজটা কী শুনি ?

—একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে হবে।

—কার জন্য ?

—আমার বাড়ির প্রোমোটার। খুব বিপদে পড়েছে। আমাকে এসে ধরল ওর লোকেরা। ইয়ে... কিছু টাকা-পয়সাও দেবে বলেছে।

—বাহ্, কত টাকা।

—লাখ খানেক।

—মাত্র। তা, বিপদটা কী শুনি।

—কাগজে দেখেছেন বোধহয়। খুব লেখালিখি হচ্ছে আজকাল। ভবানীপুরে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি ভেঙে পড়েছে। তার প্রোমোটার আবার আমার বাড়িরও প্রোমোটার। পুলিশ পেলেই তাকে ধরবে। তা, আপনি যদি একটা সার্টিফিকেট লিখে দেন, লোকটা মেন্টাল পেশেন্ট, তা হলে তাড়াতাড়ি জামিন পেয়ে যাবে।

—টাকার অঙ্কটা কত বাড়তে পারে পতিতুণ্ডবাবু ?

—বলে কয়ে লাখ দেড়েক করতে পারি। নামটা কী দেব ডাক্তারবাবু ?

—বলুন।

—সুরেশ কাজারিয়া। ওয়ান বাই এফ বালিগঞ্জ প্লেস।

আমি অবাক হয়ে ডাক্তার ব্যানার্জির মুখের দিকে তাকিয়ে। ভাবতেও পারছি না, ডাক্তার ব্যানার্জি এ রকম একটা সার্টিফিকেট লিখে দিতে পারেন। লিখে দিলে কয়েক মাসের জন্য হয়তো সেবা-র সুরাহা হবে, কিন্তু উনি আমার চোখে চিরদিনের মতো খারাপ হয়ে যাবেন। সুরেশ কাজারিয়ার মতো একটা শয়তানকে বাঁচানো উচিত নয়। এদের শাস্তি হওয়া উচিত।

ডাক্তার ব্যানার্জি হঠাৎ আমাকে বললেন, "ঋচীক ভাই, একটা কাজ করবে। এই লোকটাকে গেটের বাইরে দিয়ে আসবে। আমি এর মুখ দেখতে চাই না।"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। লোকটাকে বললাম, "আপনি এবার আসুন।"

পতিতুণ্ডর মুখটা করুণ হয়ে গেল। তবুও বলল, "সুযোগ সব সময় আসে না ডাক্তারবাবু। যেমন আপনার মর্জি। মাত্র তো একটা সই। দিলে কী ক্ষতিটা হত ?"

ডাক্তার ব্যানার্জি খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "ঠিক বলেছেন। মাত্র একটা সই। কিন্তু এটা দেওয়ার অধিকার আমাকে পেতে হয়েছে—পনেরোটা বছর কঠিন পরিশ্রম করে। আমি মিসইউজ করতে পারি না। বাজারে আরও ডাক্তার আছেন, তাঁদের কাছে যান। আরও কম খরচ করে, সইটা পেয়ে যাবেন।"

পতিতুণ্ড মুখ তেতো করে বেরিয়ে গেল। ডাক্তার ব্যানার্জি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, "ভাগ্যিস, মানসবাবু এখন নেই। থাকলে, আমার হয়ে হয়তো সার্টিফিকেটটা উনিই লিখে দিতেন। কী মনে হয়, ঋচীক ভাই ?"

হাসতে হাসতে বললাম, "মনে হয় না।"

—বেচারিকে দেখলে আমার কষ্ট হচ্ছে। টাকার জন্য হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু সব জায়গা থেকে খালি হাতে ফিরে আসছেন।"

বললাম, "ক'দিন আগে উনি যে সাংমার কাছে গেলেন, কী হল ?"

—সাংমা রাজিও হলেন, কিছু একটা করে দেবেন। কিন্তু হুট করে ভেঙে গেল গাভমেন্ট। তখন ছিলেন লোকসভার স্পিকার। এখন কী আর তা পারবেন। মনে হয় না। এখন ভোট। কেউ একটা পয়সাও গলাবে না।

মানসবাবু প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতেই, পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল দাদা। ডাক্তার ব্যানার্জি ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। অনুমতি ছাড়া, কেউ ঘরে ঢুকুক, উনি তা চান না। কিছু বলার আগেই, আমি বলে উঠলাম, "ডাক্তার ব্যানার্জি, ইনিই কিংশুক বাসু। এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম।"

—ওহ্ আপনি। বসুন। আমাদের ছোট্ট প্রতিষ্ঠান। কী আর দেখবেন ? এই নীতা মানসবাবুকে একবার ডাক তো। উনি সব গুছিয়ে বলতে পারবেন। ভেবেছিলাম, ডাক্তার ব্যানার্জি খুঁটিয়ে প্রশ্ন করবেন দাদাকে। কিছুই করলেন না। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার ওপর ওঁর এত বিশ্বাস, দাদাকে আর কিছুই জিজ্ঞেস না করে একটা প্রেসক্রিপশন তুলে নিলেন। দাদাকে ইশারায় বললাম, "এত দেরি হল।" দাদা বলল, "কাকাবাবু ডেকেছিল। তোর ব্যাপারে। জরুরি কথা আছে। বাড়ি গিয়ে বলব। এখান থেকে একবার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে যাব। বাড়ি যেতে যেতে বিকেল হয়ে যাবে।" শুনেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। কাকাবাবু ডেকেছিলেন। কেন, আমি তা আন্দাজ করতে পারছি। নিশ্চয়ই, তিতলির ব্যাপারে। মনে মনে ঠিক করে নিলাম, তিতলিকে বিয়ে করার কথা যদি আজ ওঠে, তা হলে মুনের কথা বলে দেব। মুন ছাড়া আর কাউকে আমি চিন্তাও করতে পারি না।

মানসবাবু মিনিট দশেক আগে সেবায় ঢোকার পর একবার উঁকি মেরে সেই যে উধাও হয়ে গেছেন, আর পাত্তা নেই। মুনও উঠে গেছে কিচেনে, লেবু-চা আনার জন্য। ফেরেনি। পেশেন্ট ডেকে আনার লোক নেই। ডাক্তার ব্যানার্জি বসে আছেন অন্যমনস্ক হয়ে। এমন সময় ঘরে এলেন মানসবাবু। আমি দু'চার কথায় দাদা সম্পর্কে বলার পর, উনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, "আসুন, আমার সঙ্গে। অফিসে বসে কথা বলি।"

ডাক্তার ব্যানার্জি সোফায় হেলান দিয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বোঝাই যাচ্ছে, উনি টায়ার্ড। বললাম, "দিনটা আপনার খুব হেকটিক যাচ্ছে, তাই না ?"

—আর বোলো না। এখান থেকে বেলা দেড়টায় যাব অজন্তা ক্লিনিকে। সেখান থেকে ডানকান। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই রওনা দেব হাওড়া। কাল সকালে ন'টার সময় বসতে হবে চেম্বারে। ওখানে দিনে পেশেন্ট। মেন্টাল ডিজিজ এত বেড়ে গেছে এখন... যেমন আর্বান এরিয়ায়, তেমনি রুরাল এরিয়ায়। সব থেকে বেশি ক্ষতি করছে আর্বানাইজেশন। লোকে খুব সেলফ সেন্টার্ড হয়ে যাচ্ছে। শহরের দোষগুলো গিয়ে ঢুকছে গ্রামে। খুব খারাপ দিন আসছে ঋচীক ভাই। এমন একটা দিন শিগ্গির আসছে, যখন হাসপাতালের ষাট পার্সেন্ট বেড রেখে দিতে হবে মেন্টাল পেশেন্টদের জন্য...।

ডাক্তার ব্যানার্জি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পর্দা সরিয়ে গীতানাথকাকাকে ঘরে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেলেন। তারপর অবাক হয়ে বললেন, "আরে, আপনি ? কী ব্যাপার, হঠাৎ ?"

গীতানাথকাকার গায়ে কালো কোট। বোধহয় কোর্ট থেকে আসছেন। বললেন, "এ দিকে সিনি আশা বলে অর্গানাইজেশনটায় গেছিলাম। ফেরার পথে ভাবলাম, আপনার এখানেও একবার ঘুরে যাই। অনেকদিন আসিনি।"

—খুব ভাল করেছেন। মানসবাবুও আছেন।

গীতানাথকাকার সঙ্গে আরও এক ভদ্রলোক এসেছেন। নাম বললেন, নির্মল চ্যাটার্জি। পরিচয়ের পালা শেষ হতেই গীতানাথকাকা জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন চলছে, আপনাদের ?"

—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তবে চলছে।

—সিনি আশায় ওরা বলল, গোল নাকি টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে ?

—শুধু আমাদের নয়, এখানকার পাঁচটা অর্গানাইজেশনকেই।

—সোসাল ওয়েলফেয়ারের টাকা তো আপনারা নেন না, তাই না ?

—ঠিকই শুনেছেন। কী হবে নিয়ে ? মাথা পিছু চারশো টাকা দেবে মাসে, আর খবরদারি করবে হাজার টাকার। তার চে ওদের টাকা না নেওয়াই ভাল।

—তা হলে তো আপনাদের অ্যাকিউট প্রবলেম মশাই। ধার দেনা করে আর কদ্দিন চালাবেন ?

—যদ্দিন চলে। মানসবাবু ইদানীং একটু দমে গেছেন। আমি অবশ্য অপ্টিমিস্টিক। একটা চালা ঘর থেকে যখন এই বাড়িতে আসতে পেরেছি, তখন থেমে থাকব না। আমার একটাই প্রবলেম। মেয়েদের রিহ্যাবিলিটেশন। কী করব, বুঝতে পারছি না।

—প্রবলেমটা একা আপনার নয়, গাভমেন্টেরও। লিগ্যাল এইডের তরফ থেকেও আমরা ভাবনা-চিন্তা করছি। দেখি, কোনও রাস্তা বেরোয় কি না। হিউম্যান রাইটসের ওদের সঙ্গেও কথা বলেছি। ওখানে এখন নানা ঝঞ্ঝাট।

—নানা পলিটিক্স, বলুন।

গীতানাথকাকা হাসলেন। তারপর বললেন, "কথাটা বলতে চাইছিলাম না। আপনি বলে ফেললেন। রঙ্গনাথ মিশ্র লোকটা যখন চেয়ারম্যান ছিলেন, তখন কিন্তু এত পলিটিক্স ছিল না। আচ্ছা, এদের এই সমস্যাটা নিয়ে একটা সেমিনার করলে কেমন হয় বলুন তো ?

—করা যায়। তবে লাভ হবে না। টি ভি-তে একদিন ছবি উঠবে। কাগজে আমাদের নাম বেরোবে। সাইকিক পেশেন্টরা কিন্তু একইরকম থাকবে। হিউম্যান রাইটস নিয়ে বড় বড় কথা হয়, কাজটা কী হয় বলুন তো মিঃ গাঙ্গুলি ?

—কারেক্ট।

দু'জনে কথা বলছেন, মানবাধিকার নিয়ে। হঠাৎই দরজার দিকে আমার চোখ গেল। মুন দাঁড়িয়ে। ওর হাতে বড় একটা ট্রে। তাতে চায়ের কাপ, ডিশে সাজানো খাবার। এতক্ষণ তা হলে খাবার তৈরি করছিল ? মুন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে গীতানাথকাকার দিকে। দেখেই মনে হল প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। হঠাৎই

ওর হাত থেকে ট্রে পড়ে গেল।

কাপ-ডিশ ভাঙার শব্দ হল। দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে মুন। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ও কি ফের অসুস্থ হয়ে পড়ল ? এক লাফে আমি দরজার কাছে পৌঁছে গেলাম। মুন পড়ে যাওয়ার আগেই, ওকে আমি ধরে ফেললাম। থরথর করে ওর শরীরটা কাঁপছে। চোখ ঘোলাটে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে মুন অস্ফুট স্বরে বলল, "ঋচীক, আমাকে বাঁচাও। কালো কোট পরা লোকটা আমার মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেবে।"

॥ পনেরো ॥

"কাল রাত থেকে তিতলিটা ফের পাগলামি শুরু করেছে রে ভাই।"

শেভ করছিলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি চন্দনাদি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখ-মুখ বেশ ফোলা। কোনও রকমে চিরুনি বুলিয়েছে চুলে। পরনে একটা সাধারণ শাড়ি। দেখেই বুঝলাম, অশান্তির মধ্যে রয়েছে। তিতলির কথা কানে না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "দিদিভাই, তুমি কবে এলে ?"

—কাল বিকেলে।

—রঞ্জনদা নেই বুঝি ?

—না, কী একটা কনফারেন্সে দিল্লি গেছে। শোন, বাবা তোকে একবার যেতে বলেছে।

—এখুনি ?

—তা বলেনি। তোর সময় হলে যাস।

—তার পর, তুমি আছ কেমন ? আরশোলার ভয় কেটেছে ?

—হ্যাঁ রে। কী বোকা বল তো আমি। সামান্য একটা জিনিস দেখে অ্যাদ্দিন ভয় পেতাম।

—তা হলে এ বার আমার মামা হতে বাধা নেই, কী বলো ?

—ছি ছি। তুই এত খারাপ হয়ে গেছিস, বুবুন ?

—কেন খারাপের কী হল ? আগের বার এসে তুমিই তো বললে, আর ক'দিন খোকা সেজে থাকবি ? মুনের সঙ্গে তোর ব্যাপারটা কদ্দূর এগিয়েছে, বল। আমারটা তুমি শুনবে, আর তোমার কথা শুনতে চাইলেই, আমি খারাপ ?

—বকিস না তো ? এখন ও সব নয়।

—কোন সব গো ?

—ওই বাচ্চা-কাচ্চা। ম্যাগো, লোকে কী বলবে, চন্দনার আর তর সইছিল না।

—পরে ভুগবে।

—কেন রে ?

—রঞ্জনদা যখন রিটায়ার করবে, তখন আমার ছোট ভাগ্নের বয়স হবে দশ।

—ছোট ভাগ্নে মানে ? আমার কি অনেকগুলো হবে নাকি ?

—জানি না। হতেও পারে।

—অসম্ভব। অ্যাই, তুই গাল থেকে ফেনাগুলো মোছ তো। বিচ্ছিরি লাগছে।

জল দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেললাম। তার পর তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে বললাম, "যাই বলো, বিয়ের জল পড়লে মেয়েদের কিন্তু বেশ ভাল দেখায়। আচ্ছা, বিয়ের জলটা কী গো, দিদিভাই ?"

মুখ টিপে হেসে চন্দনাদি বলল, "সেটা মুনকেই তুই জিজ্ঞেস করিস বিয়ের পর। হ্যাঁ রে,ওকেই বিয়ে করবি তো ?"

—দেখি, মা তো শোভাবাজারে একটা মেয়ে দেখেছে। সে আরও সুন্দর। এখনও ঠিক করিনি।

—এ মা, মুনের কী হবে তা হলে ?

—কী হবে। সেবায় থাকবে।

—তুই খুব পাল্টে গেছিস ভাই। মাস চারেক আমি নেই। তোকে দেখারও কেউ নেই। যা ইচ্ছে বলছিস। যা ইচ্ছে করে যাচ্ছিস।

—এক কাজ করো। তুমি ফিরে এসো।

—না রে, এখন আর তা সম্ভব না। রঞ্জন তা হলে পাগল হয়ে যাবে।

—কোনও অসুবিধে নেই। সেবায় নিয়ে যাব। ডাক্তার ব্যানার্জি ভাল করে দেবেন।

—হ্যাঁ রে, মুন কি ভাল হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ। দু'চারদিনের মধ্যেই ওকে ছেড়ে দেবে।

—সেবায় যখন যেতাম, রোজ এসে মুন গল্প করত আমার সঙ্গে। খালি তোর কথা জানতে চাইত।

—আর তুমি ইনফর্মারের কাজ করতে। কী কী বলেছ, শুনি ?

—এই যেমন, তোকে আমি শাসন করি। সে দিনও কান ধরে ক্ষমা চাইয়েছি। শুনে মুন ভীষণ হাসত। হাসলে খুব সুন্দর দেখায় রে মেয়েটাকে।

—আমার সামনে তো কোনওদিন হাসেনি।

—হাসবে কেন ? তুই তো মাঝেমধ্যে প্যাঁচামুখো হয়ে যাস।

—আমি প্যাঁচামুখো... আর রঞ্জনদা শাহরুখ খান, কেমন ? তা, মুনকে না হয় আমার খবর দিতে, এখানে মুনের খবর কাকে কাকে দিয়েছ শুনি ?

—আগের বার তোর মাকে বলেছি। এ বার বলে দিলাম তিতলিকে। বেচারি তোর আশায় বসে থাকবে। তার চেয়ে বলে দেওয়া ভাল। কী বলিস ?

—শুনে তিতলি কী বলল ?

—প্রথমে বলল, আই ডোন্ট কেয়ার। তারপর গুম হয়ে গেল। ওকে তো চিনি, সহজে ছাড়বে না। তোর কাছে এসে হামলা করবে। পরে ভাবলাম, মুনের কথা ওকে না বললেই হত।

—না, ভাল করেছ। একদিন না একদিন তো কথাটা ওর কানে যেতই।

—তিতলিটা কিন্তু খারাপ মেয়ে না রে বুবুন। রঞ্জনের বাবা তো বলে, তিতলি হল মডার্ন মেয়ে। পাওয়া কঠিন। আমাদের বাড়ি মাঝেমধ্যে যায়, আর তাজ্জব করে দেয় আমাকে। সে দিন গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল, এত স্মুথলি, ভাবতেও পারবি না।

—কী ব্যাপার দিদিভাই ? বোনের এত গুণগান করছ ?

—গুণ আছে বলেই করছি।

—থাক ছাড়ো। তোমার রিসার্চের কত দূর বলো ?

—এ বার শুরু করব। পেপার লিখতে গিয়ে দেখি, এখনও খানিকটা কাজ বাকি। দু'চার দিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যেতে হবে। সময় পাচ্ছি না রে। তোর খবর কী বল।

—চলছে। বাইপাসের প্রোজেক্টটা এগোচ্ছে। শেষ হলেই অন্য একটা ধরব। গড়িয়াহাটে একটা জমি পেয়েছি। নেমে পড়ব।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল চন্দনাদি। তার পর বলল, "যাই রে ভাই। তুই একবার আসিস।"

আজ কাজ একটু কম। একটু পরেই আসার কথা নন্দিনীর। কিছু হিসাবপত্র কষার জন্য। এই মেয়েটাকে নিয়ে ভুল বোঝাবঝি মিটে গেছে সুমিতাভর সঙ্গে রমলার। প্রায় ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছিল। অতীন আর আমি মাঝে থেকে, রমলাকে সব বুঝিয়েছি। এর জন্য আমাকে সাইকোথেরাপি করতে হয়েছে। ডাক্তার ব্যানার্জির কাছে শেখা কিছু টোটকা প্রয়োগ করেছি। সুমিতাভকে দেখে বোঝা যায় না এখন, কোনও দিন অশান্তির মধ্যে ছিল। দ্বিগুণ সময় দিচ্ছে প্রোজেক্টে। কেন না, রমলাকেও ওই অফিসে বসিয়ে দিয়েছি চিঠিপত্তর টাইপ করার জন্য।

চন্দনাদি চলে যাওয়ার পর হঠাৎ মুনের কথা মনে পড়তেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সেবায় আজ যেতে পারব না। ডাক্তার ব্যানার্জি বলেছেন, ওকে দু'চারদিনের মধ্যে ছুটি দিয়ে দেবেন। ও বহরমপুরে চলে গেলে, আমি থাকব কী করে ? মুন আমার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে এখন। মাঝেমধ্যে অবাক হয়ে যাই। এই কয়েক মাস আগেও ওকে চিনতাম না। এখন একদিন দেখা না হলে মন ছটফট করে। কোনও মেয়ের জন্য এই টান অনুভব করিনি। টানটা আরও বেড়েছে সে দিনের সেই ঘটনার পর।

সেদিন সেবায় মুন জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পর... ওকে কোলে করে শুইয়ে দিয়েছিলাম একতলার একটা বেডে। কাপ-ডিশ ভাঙার শব্দে ওপর থেকে দ্রুত নেমে এসেছিলেন রেশমিদি। মুন আমাকে আঁকড়ে ধরে ছিল। ছাড়াতে পারছিলাম না। ওই অবস্থায় রেশমিদি ওর চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে ডাকাডাকি করতেই মুন কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে বলেছিল, ঋচীক... ওই কালো কোটপরা লোকটাকে তাড়াও... আমার মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেবে।"

মুনের মাথার দিকে ডাক্তার ব্যানার্জি। চোখাচুখি হতে ইশারা করলেন, কথা চালিয়ে যেতে। জিজ্ঞেস করলাম, "কে ওই লোকটা.. যাকে তুমি ভয় পাচ্ছ ? বলো, আমায় বলো।"

—সুবীর... ওর নাম সুবীর।

—কে সুবীর ? কোথায় থাকে, বলো।

—বাবুই বোনা রোডে। ঋচীক, তুমি আমায় বাঁচাও। বলেই আমার বুকে মুখ লুকিয়েছিল মুন।

হঠাৎ আমার মনে পড়েছিল। সুবীরের কথা। বহরমপুর থেকে তিতলিকে যেদিন আনতে যাই, সেদিন রাতে এই ছেলেটাই কি মদ খাচ্ছিল। তিতলির ঘরে বসে ? হতে পারে। বললাম, "ভয় পেয়ো না মুন। সুবীর তোমায় কিচ্ছু করতে পারবে না।

ওকে আমি একবার খুব মেরেছিলাম।"

—তুমি ওকে চেনো ?

—ভাল করে চিনি। খুব ফর্সা, মোটা গোঁফ, ব্যাকব্রাশ করা চুল। মোটর বাইকে চড়ে মস্তানি করে।

—কী করে চিনলে ?

—তিতলির পিছনেও লেগেছিল। ওকে তুমি এত ভয় পাও কেন মুন ?

ঘরের দু'দিকের দরজায় অনেকগুলো মুখ। ওপর থেকে নেমে এসেছে কয়েকটা মেয়ে। আরতি কেঁদে ফেলেছে মুনের ওই অবস্থা দেখে। ফের জিজ্ঞেস করলাম, "ওই ছেলেটা কি তোমার পিছনে লেগেছিল ?"

—হ্যাঁ।

—কী করেছিল আমায় বলো।

—আমি আর স্নিগ্ধা যখন কলেজ যেতাম, তখন রোজ ডিসটার্ব করত।

—কে স্নিগ্ধা ?

—আমার বন্ধু। গোরাবাজারেই থাকত। ও আমাদের বাড়িতে আসত। আমরা দু'জন রিকশা করে কলেজ যেতাম। পোস্টাপিসের মোড়ে সুবীর তখন দাঁড়িয়ে থাকত। কলেজ অবধি ফলো করত।

—তার পর ?

—একদিন বাইকে যেতে যেতে... সুবীর কাগজের একটা পুঁটলি ছুড়ে দিয়েছিল। রিকশার পাদানি থেকে সেটা তুলে, পড়েছিল স্নিগ্ধা। তাতে খুব নোংরা কথা লেখা ছিল। স্নিগ্ধা খুব রেগে গেছিল। বলেছিল, কাল ওর ব্যবস্থা করব। আমি বারণ করেছিলাম। শুনল না।

—তার পর কী হল ?

—জানি না। দু' দিন স্নিগ্ধা এল না। পরদিন ওর ভাই এসে আমার কাছে বলল, দিদি হাসপাতালে। কলেজ থেকে ফেরার পথে একটা ছেলে দিদির মুখে অ্যাসিড ছুড়ে দিয়েছে। শুনে আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম।

—বাড়িতে কিছু বলোনি ?

—না। ভাই ছোট। বললে সবাই ঘাবড়ে যেত। সুবীর খুব গুণ্ডা। সবাই ওকে ভয় পেত।

—তারপর কী হল ?

—পরদিন কলেজ যাওয়ার পথে হাসপাতালে গেলাম। গিয়ে দেখি, কলেজের আরও কয়েকটা মেয়ে ওখানে গেছে। কলেজে নাকি খুব হইচই হয়ে গেছে। প্রিন্সিপাল পুলিশকে খবর দিয়েছে। সবাই মিলে স্নিগ্ধাকে দেখতে গেলাম। সারা মুখে ব্যান্ডেজ। আমায় বলল, মুনমুন তুই সাবধানে থাকিস। আসল টার্গেট কিন্তু তুই। তখন ও খুব কাঁদছিল।

—পুলিশ কী করল ?

—জানি না। মাস দু'য়েক সুবীরকে আর দেখিনি। তার পর ফের ওকে দেখলাম পোস্টাপিসের মোড়ে। সেদিন কলেজ থেকে ফিরেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কলেজে যেতে ভয় পেতাম। বাড়িতে নতুন কেউ এলে মনে হত, সুবীরের লোক।

আমার খোঁজ নিতে পাঠিয়েছে।

—কেন এটা মনে হত ?

—সেদিন একা পেয়ে ও আমাকে বলেছিল, ওর কথা না শুনলে আমার অবস্থা স্নিগ্ধার মতো করে দেবে।

—এর পরও তুমি বাড়িতে কিছু বলোনি ?

—না। সংঘমিত্রা আমাকে বলেছিল, সুবীরকে তুই চিনিস না। ও তোকে তুলে নিয়ে যাবে। তোর মা কিছু করতে পারবে না। ভয়ে তাই আমি বাড়ি থেকেই বেরোতাম না।

মুন আমাকে শক্ত করে ধরেছিল। সুবীরের কথা বলতে বলতে মাঝেমধ্যে ও কেঁপে উঠছিল। ডাক্তার ব্যানার্জি আর প্রতিমাদি অনেকদিন চেষ্টা করেছেন, ওর মুখ থেকে এই সব কথা বের করার। পারেননি। সেদিন অকপটে বলতে বলতে, ও কাঁদছিল, "আমাদের ওখানে পুলিশ খুব বাজে। কিচ্ছু করে না। গুণ্ডাদের রাজত্ব। স্নিগ্ধার মুখটা বীভৎস হয়ে গেল। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ও সুইসাইড করল। সুবীরের কিছু হল না। ভয়ে তখন আমি ছাদে উঠতাম না। জানলার সামনে দাঁড়াতাম না। মা তখন ডাক্তার ডেকে আনল। ডাক্তার বলল, মনের অসুখ। আপনার মেয়ে পাগল হয়ে যাবে। বাবুল বোনা রোডে পাগলদের এক ডাক্তার আছেন, তার কাছে নিয়ে যান।"

—তুমি গেলে সেখানে ?

—মা নিয়ে গেল। রাতের দিকে। দু'দিনের দিন ডাক্তারবাবু আমার মাথায় কারেন্ট দিলেন। আমার সব কিছু গুলিয়ে গেল।

ওর কান্না দেখে সেদিন আমিও স্থান-কাল-পাত্র গুলিয়ে ফেলেছিলাম। বুক থেকে ওর মুখটা তুলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মুন, সুবীর তোমাকে কিচ্ছু করতে পারবে না। তুমি আমার কাছে থাকবে। তুমি কালো কোট পরা লোক দেখলে এত ভয় পাও কেন ?"

—সুবীর কালো কোট পরে থাকত।

—কিন্তু সব কালো কোট পরা লোক তো সুবীর না, মুন। আমি যদি কালো স্যুট পরে আসি, তুমি ভয় পাবে ?

আমার দু'হাতে ধরা ওর মুখ। ও ঘাড় নেড়েছিল।

সেটা দেখে বলেছিলাম, "জানো, আজ কালো কোট পরা কাকে তুমি দেখেছ ? গীতানাথকাকা। আমার কাকাবাবুর খুব বন্ধু। তুমি ওকে দেখে ভয় পেলে বলে জানো, উনি কী কষ্ট পেয়েছেন ? ডাকব ওকে ?"

—না, তুমি ডাকবে না। আমি দেখব না।

ধীরে ধীরে ওকে বিছানা থেকে নামিয়েছিলাম। দরজার সামনে থেকে মেয়েরা সরে গেছিল। হঠাৎ পিছন থেকে ডাক্তার ব্যানার্জি বলেছিলেন, "বাঃ চমৎকার। সব সেলফিশের দল। তখন থেকে লেবু-চা চাইছি। আর উনি নাটক করে এখন রেস্ট নিতে চললেন। দূর, দূর... কাল থেকে সেবায় আর আমি আসবই না। মানসবাবু, আপনারা অন্য ডাক্তার দেখুন।"

ঘরের ভেতরে দমবন্ধ করা একটা পরিবেশ। সেটা কেটে গেছিল ডাক্তার

ব্যানার্জির ওই কথায়। রেশমিদি এসে হাত ধরেছিলেন মুনের। ওকে ভেতরে নিয়ে গেছিলেন। আউটডোরে ঢোকার মুখেই উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গীতানাথকাকা। আমাদের বেরিয়ে আসতে দেখে বলেছিলেন, "হঠাৎ কী হল মেয়েটার ? আমাকে দেখে এত ভয় পেল কেন ?

ডাক্তার ব্যানার্জি বলেছিলেন, "ও কিচ্ছু না। আপনি আসায় আজ বড় একটা ব্রেক হল। ওর ফোবিক ডিসঅর্ডার ছিল। তার কারণটা আজ জানতে পারলাম। ওফ্, মেয়েটাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম।"

সেদিন সত্যিই চিন্তা কেটে গেছিল আমাদের। সাইকোথেরাপি করে করে মুন এখন অনেকটাই সুস্থ। ওর মন থেকে ভুল ধারণাটা ভেঙে দেওয়ার জন্য আমাকে একটা কালো স্যুট বানাতে হয়েছে। ডাক্তার ব্যানার্জির কথামতো, সেটা পরে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও হয়েছে। মুন আমার সঙ্গে একদিন তাজ বেঙ্গলে লাঞ্চও খেয়ে এসেছে। দাদার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিয়েছি। দাদা দশ বারোদিন আগে জুরিখ ফিরে গেছে। আমাকে বলে গেছে, সেবা-র জন্য যতটা সম্ভব করবে।

... মুনের কথাই ভাবছি। এমন সময় রুমকি এসে বলল, "দাদাবাবু, বাবলুদা না, যাত্রা পার্টিতে ঢুকেছে।"

এটা আমার কাছে খবর। ইদানীং মাঝেমধ্যেই বাবলু উধাও হয়ে যায়। দু'তিন ঘণ্টা ওকে পাওয়া যায় না। কোথায় গেছিলি জিজ্ঞেস করায় একদিন বলেছিল, সত্যম্বর অপেরায়। কে ওর মাথায় ঢুকিয়েছে, অকছয়কুমারের মতো দেখতে। অকছয়কুমার নাকি একটা হোটেলে বেয়ারার কাজ করত। সে যদি সিনেমার নায়ক হতে পারে, বাবলু কেন হতে পারবে না। এটাও এক ধরনের মানসিক রোগ। হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে এই রোগে ভোগে। কিন্তু বাবলুকে সেটা বোঝাবে কে ? রুমকিকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুই কি করে জানলি রে ?

—আমাকে ও-ই বলেছে। ড্রাইভারি ছেড়ে এবার যাত্রা পার্টিতে চাকরি নেবে।

—দিক ছেড়ে। তাতে তোর কী ?

রুমকি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। একটু আগে শায়নী বলে মেয়েটা ঠিক ওই জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল। রুমকির মুখটা গম্ভীর। হঠাৎ বলল, "যাত্রা পার্টির মেয়েগুলো নাকি খুব খারাপ হয়। বাবলুদা খারাপ হয়ে যাবে।"

রুমকির মুখটা দেখে ভীষণ হাসি পাচ্ছে। কে জানে, ও আবার নিজেকে শিল্পা শেঠি ভাবে কি না ? হাসি চেপে বললাম, "ওর মা জানে ?"

—না। বলেনি। গীতামাসি জানতে পারলে কুরুক্ষেত্তর করবে।

গীতামাসিও একটা সময় কাজ করত আমাদের বাড়িতে। এখন অথর্ব হয়ে গেছে। তবু চোটপাট কমেনি। বাবলু যা একটু ভয় পায়, ওই ওর মাকে। বললাম, "তুই গিয়ে বলে দে তা হলে।"

—না বাবা। তা'লে বাবলুদা এসে আমার চুলের মুঠি ধরবে। তুমি ডেকে পাঠাও। গীতামাসিকে তুমি কথাটা বলো।

—ঠিক আছে, আসতে বলিস। বাবলুটা গেল কোথায় রে ?

—রিহার্সালে গেছে।

—ফিরলে, আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস।

—আচ্ছা করে বকে দিয়ো। কোনও বুদ্ধি নেই। হুটহাট কাজ করে।

—ঠিক আছে। বকে দেব। তুই পালা।

সকাল থেকে আজ খবরের কাগজটা পড়া হয়নি। সোফায় বসে কাগজ পড়তে শুরু করলাম। প্রথমে আমার খেলার পাতা দেখার অভ্যেস। ভারতের ক্রিকেট টিম খেলছে শারজায় পাকিস্তানের সঙ্গে। তা নিয়ে বিরাট বিরাট সব খবর। দ্রুত চোখ বুলিয়ে চলে এলাম প্রথম পাতায়। চাঞ্চল্যকর একটা খবর। মাকে খুন করার জন্য পুলিশ ধরেছে এক তরুণকে। ঘটনাটা ঘটেছে সাদার্ন অ্যাভেনিউতে। ছেলেটার মানসিক রোগ আছে বলে পুলিশের সন্দেহ। ফ্ল্যাটে মা আর ছেলে ছাড়া কেউ থাকত না। রাতে মায়ের গলার নলি ছেলে কেটে দেয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে। উপরের ফ্ল্যাটের লোকেরা একবার আর্ত চিৎকার শুনেছিল। কেউ ভাবতেও পারেনি, এ রকম একটা বীভৎস ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

খবরটা পড়ে শিউরে উঠলাম। মাকে খুন করার সময় হাত কাঁপেনি ছেলেটার? ছেলেটা পুলিশকে বলেছে, ওর মনে কোনও অপরাধবোধ নেই। নাকি অনেক ভেবেচিন্তে ও এই কাজটা করেছে। বোঝাই যাচ্ছে, ছেলেটা সিজোফ্রেনিক। একদিনে তো আর হয়নি। নিশ্চয়ই মায়ের ওপর ক্রোধ হওয়ার কারণ আছে। ওকে যদি কেউ কোনও সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতেন, তা হলে এমন দুর্ঘটনা ঘটত না। ছেলেটার জীবন নষ্ট হয়ে গেল। এখন হয়তো জেলে পচতে হবে।

হাতে কয়েকটা কাজ ছিল। সে সব সেরে ঘণ্টাখানেক পর সদর দরজা বন্ধ করে উপরে উঠে এলাম। রান্নাঘরে রুমকি। বাইরে বারান্দায় বসে ওর সঙ্গে কথা বলছে মা। আমাকে দেখে বলল, "শুনেছিস তো ও বাড়ির কথা।"

—কী হয়েছে মা?

—চন্দনার বাবা এসেছিলেন কাল। তিতলির সঙ্গে তোর...

কথাটা শেষ করতে দিলাম না। বললাম, "সম্ভব না মা।"

—কেন রে?

—মা তুমি বাকি জীবনটা অশান্তিতে কাটাও, চাই না।

—কী করি বল তো? তোর কাকাবাবুকে কিছু বলিনি। কিন্তু উনি খুব আশা করে আছেন। এত উপকার করেছেন উনি আমাদের। চট করে না বলে দেওয়া..

—তুমি কী চাও বলো তো মা?

—কী বলছিস তুই। জেনে শুনে একটা অবাধ্য মেয়েকে তোর হাতে তুলে দিতে পারি!

—ব্যস, আমার বোঝা হয়ে গেছে।

—কাকাবাবুকে কী বলবি?

—আমার উপর ছেড়ে দাও না। তিতলিকে ট্রিটমেন্ট করানো দরকার। সেটাই কাকাবাবুকে বলব।

—হ্যাঁ রে, একটা সত্যি কথা বলবি?

—তোমাকে কোনওদিন মিথ্যে কথা বলেছি?

—তুই কি কাউকে পছন্দ করে রেখেছিস?

—হ্যাঁ মা।

—কে ? মুনমুন বলে মেয়েটা ?

—হ্যাঁ মা।

—চন্দনা বলছিল, ও নাকি মেন্টাল পেশেন্ট ?

—সেরে গেছে মা। তুমি ওকে দেখবে ?

—কেমন দেখতে রে ? খুব সুন্দর বুঝি ? চন্দনা বলছিল।

—তোমার মতো সুন্দর না মা।

—ফাজিল ছেলে। একদিন নিয়ে আসবি আমার কাছে ? তোর কমলামাসিকেও সেদিন ডেকে নেব।

—তুমি আমার সঙ্গে যাবে ? আজ চলো না।

—কখন যাবি ?

—বিকেলের দিকে।

—মুনের বাবা-মা রাজি হবেন ?

—বাবা নেই। মা ঠিক তোমার মতো। আর এক ছোটভাই আছে।

—মুনকে তুই খুব ভালবাসিস বুঝি ?

—হ্যাঁ মা। ওদের মাথার উপর কেউ নেই। আমার সঙ্গে পরিচয় না হলে মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে যেত।

—দেখিস বাবা, ভুল করিস না। দিদির মতো অশান্তি, আমি চাই না। বুটু বউ নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে উঠে গেছে। বউ নিয়ে দিদি ঘর করতে পারল না।

—তোমার সেই ভয় নেই মা। মুন সে রকম মেয়ে না।

—বুটুর বউটাও তো খারাপ ছিল না। দিদির মুখে তখন কত প্রশংসা। এখন এমন সম্পর্ক, নাম পর্যন্ত শুনতে চায় না। ভয় হয়, দিদিটার না মাথা খারাপ হয়ে যায়।

—মুনের সঙ্গে তুমি একবার কথা বলবে মা ?

—বাপ রে, তোর যেন তর সইছে না।

—দাঁড়াও ধরি ওকে।

খাবার টেবলে বসে কর্ডলেসে নম্বর টিপতে লাগলাম। এনগেজড। বার তিনেক চেষ্টা করার পর লাইন পেলাম। ও প্রান্তে মানসবাবু, "ঋচীকবাবু নাকি ? থ্যাঙ্কস। এক ভদ্রলোক এসে এই মাত্র এক লাখ টাকা দিয়ে গেলেন।"

দ্বিজদাসবাবুর কথা মনে ছিল না। বললাম, "হ্যাঁ, আমিই ওকে পাঠিয়েছিলাম।"

মানসবাবু বললেন, "মাস চারেক চলে যাবে। দম ফেলার সময় পেলাম মশাই। কী যে উপকার করলেন, বলে বোঝাতে পারব না।"

—ডাক্তার ব্যানার্জি আছেন ?

—না। আজ উনি আসেননি।

—মুনকে একটু দেওয়া যাবে ফোনটা ?

—ও তো নেই।

—কোথায় গেছে ?

—আজ সকালেই ওর মা আর ভাই এসে ওকে নিয়ে গেছে।

—সে কী ?

—কেন, আপনি জানেন না ? কাল সকালেই তো ওর ভাই ফোন করেছিল বহরমপুর থেকে। আর কাউকে দেব ?

মাথার ভেতরটা শূন্য হয়ে গেছে। কোনও রকমে বললাম, "না।" আমাকে না বলে মুন চলে গেল ? একবার ফোন পর্যন্ত করল না ! মা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মাকে কী বলব, ভেবে পেলাম না।

॥ ষোলো ॥

সকাল থেকে মাঝেমধ্যে আজ বৃষ্টি হচ্ছে। সারাদিন সূর্য ওঠেনি। এলোমেলো বাতাস বইছে। দরজাটা ভেজিয়ে সোফায় এসে বসলাম। মনটা ভাল নেই। আগে মেঘলা দিনগুলো খুব ভাল লাগত। তখন কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। ইদানীং চারপাশে যা ঘটছে, সবই খারাপ। সব থেকে বড় ধাক্কা লেগেছে, মুনের চলে যাওয়া। ও যে আমাকে না জানিয়ে চলে যেতে পারে, ভাবতেও পারিনি।

সুমিতাভর সঙ্গেও ইদানীং আমার খুব মন কষাকষি চলছে। সাইটে রমলাকে নাকি ও একদিন ব্যঙ্গ করে বলেছে, 'ঋচীক স্লিপিং পার্টনার হয়ে থাকবে, আর আমি রাতদিন খেটে যাব, এটা বেশিদিন চলতে পারে না।" কথাটা এসে আমাকে জানাল নন্দিনী। সুমিতাভকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারতাম, এমন কথা ও বলেছে কি না ? কিন্তু করিনি। তা হলে ও চটে যেত নন্দিনীর ওপর। মেয়েটার পিছনে লাগত। ওকে চাকরি থেকে তাড়াত। নন্দিনী অসুবিধায় পড়ুক, আমি চাই না। আমি জানি, চাকরিটা ওর খুব দরকার। বাবা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ায় ওকে এই কাজটা নিতে হয়েছে। ভাই না দাঁড়ানো পর্যন্ত ওকে সংসার টেনে যেতে হবে। নন্দিনী খুব সৎ প্রকৃতির মেয়ে।

সেদিন নন্দিনী আরও একটা কথা বলে ফেলেছিল। তখন মাথায় নিইনি। কেন না, তখন মুনের ব্যাপারে প্রচণ্ড আপসেট ছিলাম। ও বলেছিল, "বুবুনদা, একটু চোখ-কান খোলা রেখে চলুন। আপনি একটু বেশিই বিশ্বাস করে ফেলেছেন সুমিতাভদাকে।" ও একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল তখন, বুঝিনি। এখন বুঝতে পারছি, সুমিতাভ কতভাবে ঠকিয়ে গেছে আমাকে। জমি কেনা থেকে শুরু করে ফ্ল্যাটের বুকিং— সর্বত্র ও আমাকে ঠকিয়ে গেছে।

সন্দেহ জিনিসটা এমন, একবার মনের ভেতর ঢুকলে চট করে যেতে চায় না। আমারও তাই হয়ে গেছে। বরদাবাবু বলে একজন আছেন। দুটো ভাল জমি জোগাড় করে দিয়েছিলেন পাইকপাড়ার দিকে। বছর তিনেক আগে। ওখানে ষোলোটা ফ্ল্যাট তৈরি করে আমরা ভাল প্রফিট পেয়েছিলাম। মাঝে একদিন বরদাবাবু এলেন আমার কাছে। একটা জমির খোঁজ দিতে। ওনাকে সুমিতাভর সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলাম। তখন হঠাৎ উনি বললেন, "ওনার কথা বলবেন না মশাই। খুব বাজে লোক।"

—কেন, কী হয়েছে ?

—আগের বার জমির মালিকের সঙ্গে আন্ডারহ্যান্ড ডিলিং করলেন। লাখ টাকা নিজে মারলেন। কমিশন কমে গেল আমার।

—কী বলছেন আপনি ?

—ঠিকই বলছি। আমি বলেছিলাম সতেরো লাখ। পরে শুনলাম, ডিল হয়েছে অফিসিয়ালি আঠারো লাখ। সুমিতাভবাবু জমির মালিকের সঙ্গে কথা বলেই এটা করেছেন। মালিকের কী, সে তো সতেরো লাখই পেয়ে গেছে। এক লাখ টাকা পকেটে পুরেছেন সুমিতাভবাবু। সেটা গেছে আপনাদের ফার্ম থেকে।

পাইকপাড়ার ওই জমিটার হিসাব অবশ্য সুমিতাভ দিয়েছিল কুড়ি লাখ টাকার। তখন আমাকে বলেছিল, জমির একপাশে দুটো দোকানঘর ছিল। ওদের তোলার জন্য দু'লাখ খরচ হয়েছে। আমিও তখন অবিশ্বাস করিনি। তার মানে জমি কেনার সময় সুমিতাভ লাখ তিনেক সরিয়েছিল।

সত্যি বলতে কী, নন্দিনীই আমার চোখ খুলে দিয়েছে। গত কয়েকটা দিন আমি হিসাব নিয়ে পড়ে আছি। ছয় বছরে গোটা দশেক প্রোজেক্ট দু'জনে মিলে করেছি। আমার আন্দাজ, সুমিতাভ লাখ তিরিশ সরিয়েছে। ও বোধহয় বুঝতে পেরে গেছে, ওকে আমি সন্দেহ করছি। তাই বলতে শুরু করেছে, "ঋচীক স্লিপিং পার্টনার হয়ে থাকবে, আর আমি রাত-দিন খেটে যাব, তা হয় না।" লোকে ওর কথা বিশ্বাস করবে, কেন না, সাইটে রোজ আমি যাই না। পার্টনারশিপ ভেঙে যাওয়ার প্রথম ধাপে পা দিয়েছি আমরা। মনে মনে আমি ঠিক করে ফেলেছি, সুমিতাভর সঙ্গে আর না।

দরজায় টকটক শব্দ হল। কে এল আবার ? মা ঠাকুরঘরে। ঘণ্টাখানেকের আগে বেরোবে না। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি, রুমকি।

বলল, "দাদাবাবু, তোমার সেই পুলিশ বন্ধুটা এসেছে।"

অতীন ? অনেকদিন ওর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলাম। বাইরে জিপ দাঁড়িয়ে। অতীন পুলিশের পোশাকে। আমাকে দেখে বলল, "ঋচীক, তোর সুমিতাভ তো বেশ খলিফা ছেলে রে ?"

বললাম, "কেন, ও কী করল আবার ?"

—শুনলে অবাক হয়ে যাবি। ফড়েপুকুরে তোরা কোনও অ্যাপার্টমেন্ট করেছিলি ?

—হ্যাঁ। পাঁচতলা।

—তার একটা ফ্ল্যাট বেনামিতে কিনে রেখেছিল। এখন ওখানে মধুচক্র চালাচ্ছে।

—যাঃ, তাই হয় নাকি ? কোন ফ্ল্যাটটায় ?

—টু বি। ওর বউ যখন আমাদের কাছে কমপ্লেন করে, তখন একবার ওই বাড়িতে আমার লোক গেছিল। পরে খবর পেলাম, বেশ কিছু মেয়ে ওখানে যাতায়াত করে। অ্যাদ্দিনে জানলাম, আসলে ওটা মধুচক্র। তুই ওখানে যাস-টাস না তো ?

—তোর মাথা খারাপ ?

—তুই শালা সেই গুডবয় রয়ে গেলি।

—এখন তোরা কী করবি ?

—তক্কে তক্কে থাকব। ওকে সুদ্ধু মেয়েদের তুলব। এ বার কিন্তু ছাড়ব না। আগের বার তোর কথায় ওকে কিছু করিনি। মালটা তোর মতো ছেলের সঙ্গে জুটল কী করে রে ?

—ওর সম্পর্কে আগে ধারণা অন্য রকম ছিল। এখন দেখছি, ব্যবসা থেকেও অনেক টাকা ও সরিয়েছে।

—চমৎকার। আমাদের কাছে কমপ্লেন করছিস না কেন ?

—ইস্টার্ন বাইপাসে আমাদের প্রোজেক্টটা তা হলে মার খাবে।

—ছেলেটার তা হলে সব গুণই আছে। এমন থার্ড ডিগ্রি মার খাবে আমাদের কাছে, তখন বুঝতে পারবে। যাক, তোর কী খবর বল ? তোকে দেখে তো ভাল মনে হচ্ছে না।

—হ্যাঁ, শরীরটা খারাপ। কিছু ভাল লাগছে না।

—তোর গার্লফ্রেন্ডের কী খবর ?

—সে ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে রে।

—সে কী রে ? তুই আর যোগাযোগ করিসনি ? এ কাজটাও আমাকে করে দিতে হবে ? বল তো করে দিই।

—না রে। ওই চ্যাপ্টারটা এখন আমার কাছে ক্লোজড।

—দূর শালা। চ্যাপ্টার তো যখন তখন ওপেন হতে পারে। এই দ্যাখ না, আমি আর সুদীপা ফের কেমন নতুন চ্যাপ্টার শুরু করেছি।

—তোর বউ জানে ?

—মাথা খারাপ ? পুলিশের চাকরিতে আমাদের একটা কী সুবিধে আছে জানিস ? রাতে বাড়ি না ফিরলেও বউকে কৈফিয়ত দিতে হয় না। আমিও শালা চালিয়ে যাচ্ছি। বহুদিন পর চেখে দেখলাম, সুদীপাটা রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল।

সঙ্গে সঙ্গে সুদীপার চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওর সঙ্গে বহুদিন আমার দেখাসাক্ষাৎ নেই। ফোনে একদিন অবশ্য ও আমাকে কটাক্ষ করেছিল, "কী রে গুডবয়, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ দেখছি এখন বেশি।" কথাটা ও বলেছিল, মুনের জন্য আমার টান লক্ষ করেই। মুনদের সঙ্গে বোধহয় কোনও কারণে ওদের সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। ওরা কেউ সেবায় যেত না। মুনও কখনও সুদীপার কথা তুলত না। আজ অতীনের কথা শুনে আমার বেশ খারাপই লাগল। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, অতীনের সঙ্গে সুদীপার শারীরিক সম্পর্ক আজকের নয়। সম্পর্কটা সেই কলেজে পড়ার দিনগুলো থেকে। আমার এই ঘরেই ওরা প্রথম... সেদিন ওরা ঘর থেকে আমাকে বের করে দিয়েছিল। পুরো ব্যাপারটাই ছিল ওদের কাছে মজার।

অতীন আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। তা দেখে বললাম, "তুই পারিস বটে।"

—যতদিন পারি চালিয়ে যাই। আসলে কী জানিস, তখন এক্সপিরিয়েন্স ছিল না। সুদীপা যেভাবে চাইত, পারতাম না। আমার ইগোতে লেগেছিল। তাই ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল। নাউ আই অ্যাম অ্যান এক্সপিরিয়েন্স ম্যান অব ফাইভ ইয়ার্স অব কনজুগাল লাইফ। এখন বুঝতে পারছি, সুদীপা কত মূল্যবান। যাক গে, পারলে আজ সন্ধ্যায় একবার থানায় আসিস।

—কেন রে ?

—মনে হচ্ছে, সুমিতাভ বাঞ্চোতটাকে আজ তুলতে পারব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তোকে খবর দেব।

অতীন চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে রইলাম। অতীনের মনে পাপবোধ বলে

কিছু নেই। সুস্থ লোকের মতো দিব্যি ও চাকরি বাকরি করে যাচ্ছে। অথচ সুরজিৎ মৈত্র বলে সেই ছেলেটা, ছাত্রীর বুকে হাত দেওয়ার পাপবোধে সুইসাইড করতে গেছিল। পাপপুণ্য বলে সত্যি কি কিছু আছে ? ছেলেটার সঙ্গে পরে একবার সেবায় দেখা হয়েছিল। অনেকটা সুস্থ। স্বামী স্বরূপানন্দের বই পড়ে নাকি ওর মনের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। মানুষের মনটা বিচিত্র। কার কখন কোন কথা ভাল লাগে, বা খারাপ, কেউ বলতে পারে না।

অতীনের মতো ছেলেরা নানা দুষ্কর্ম করেও, বেমালুম ভুলে যেতে পারে। কই, আমি তো তা পারি না। সুমিতাভ আমাকে দিয়ে অনেক দু'নম্বরী কাজ করাতে চেয়েছে। আমি রাজি হইনি। আসলে দু'নম্বরী কাজ করার সাহসই আমার নেই। মা আমাকে শিখিয়েছে, সৎপথে থাকবি। তাতে যদি শুধু ডাল-ভাত জোটে, তাতেও আপত্তি নেই। মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল মা। আমি তা-ই করে এসেছি। কিন্তু সেই বিশ্বাস থেকে এখন কেন সরে যাচ্ছি, জানি না।

বিশ্বাসটা টলিয়ে দিয়ে গেছে মুন। ঘুরে ফিরে এখন এই কথাটাই মনে হচ্ছে। মুন চলে যাবে, ডাক্তার ব্যানার্জিও কি এই কথাটা আমাকে একবার জানাতে পারতেন না ? উনিও কথাটা কেন আমায় জানালেন না ? নাকি, উনিও আমাকে শুধু ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, একজন পেশেন্টকে সুস্থ করে তোলার জন্য। ডাক্তার হিসাবে কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য। সম্ভব, সবই সম্ভব। যখন এ সব কথা ভাবছি, মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মুন চলে যাওয়ার পর, সেবায় আর যাইনি। যাওয়ার দরকার হয়নি। তবে মানর্সবাবু আমার সঙ্গে ভদ্রতা করেছেন। একলাখ টাকা ডোনেশন পাইয়ে দেওয়ার জন্য, ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চিঠি দিয়ে। চিঠিটা পেয়ে সত্যি ভাল লেগেছিল।

ঘরে একা বসে বসে এ সব কথা ভাবছি। এমন সময় মা এসে বলল, "কী রে, রেডি হয়ে নে। ও বাড়িতে যাবি না ?"

কথাটা আমার মনেই ছিল না। আজ তিতলিদের বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন। কাকাবাবু বার লাইব্রেরির কর্মকর্তা হয়েছেন। কয়েকজন অ্যাডভোকেট বন্ধুকে আজ তাই খাওয়াবেন। কাকিমা নিজে এসে বলে গেছেন। রঞ্জনদাও নাকি আসছে। বার কাউন্সিলের ইলেকশনে কাকাবাবু এর আগে একবার দাঁড়িয়েছিলেন। সেবার হেরে যান। এ বার জেতায় খুব খুশি।

মায়ের পরনে সাদা রঙের জামদানি। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ও বাড়িতে যাওয়ার জন্যই মা নীচে নেমে এসেছে। দেয়ালঘড়িতে দেখলাম, সাড়ে সাতটা বাজে। অতীন এসেছিল ছ'টার সময়। তার মানে ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। আগে হলে, কাকাবাবু সন্ধে থেকেই বারবার লোক পাঠাতেন। তাগাদা দিতেন যাওয়ার জন্য। এখন বোধহয় আমি না গেলেও উনি কিছু মনে করছেন না। সত্যি বলতে কী, ও বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। গত এক মাসে একবারও যাইনি। বিভা একদিন এ বাড়িতে কী একটা দিতে এসেছিল। মায়ের সঙ্গে গল্প করছিল। দোতলা থেকে উপরে ওঠার সময় তখন হঠাৎ কানে এসেছিল বিভার একটা কথা, "তিতলি দিদিমণি খুব চুপচাপ হয়ে গেছে। নিজের ঘর থেকে এখন আর বেরোয় না। উল্টো-পাল্টা কথা বলে সারাদিন।"

তিতলি থাকে রাস্তার দিকে দোতলার একটা ঘরে। আগে ওই ঘরে থাকত

চন্দনাদি। মাঝে একদিন বাড়ি থেকে বেরোবার সময় হঠাৎ চোখ চলে গেছিল, ওর ঘরের জানলার দিকে। দেখলাম, দু'হাতে জানলার শিক ধরে তিতলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূর থেকে মনে হয়েছিল, ওর চোখ-মুখ বসে গেছে। চুল উস্কো-খুসকো। ওকে দেখে হঠাৎই বহরমপুর মেন্টাল হোমের সেই দৃশ্যটা মনে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি সরে গেছিলাম। তার পর থেকে জানলার দিকে আর তাকাই না। তবে বুঝতে পারি, এক জোড়া চোখ সব সময় নজর রাখে আমার ওপর। বাড়ি থেকে বেরোবার সময়, অথবা বাড়িতে ঢোকার সময়।

মায়ের কথা কানে এল, "কি রে, ও বাড়িতে যাবি না ?"

বললাম, "না গেলে কি খুব খারাপ দেখাবে মা ?"

—কেন, তোর যাওয়ার ইচ্ছে নেই ?

—না মা।

—দূর বোকা। পালিয়ে যাবি কেন ? তিতলিকে যদি তোর পছন্দ না হয়, সেটা সরাসরি বলে দে না ওদের।

—ওরা বুঝতে পেরে গেছে মা।

—বুঝুক। আমরা তো এখনও কিছু বলিনি। আমি যাচ্ছি। তুইও আয়। ওদের সঙ্গে সব ব্যাপারে একমত হতে হবে, তার কী মানে আছে ?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললাম, "ঠিক আছে। তুমি যাও, আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।"

রুমকিকে নিয়ে মা বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি তিনতলায় উঠে গেলাম। নীল জিনসের প্যান্ট আর একটা টি শার্ট পরে ফের নেমে গেলাম নীচে। সদর দরজা বন্ধ করে রাস্তায় নামতেই পকেটে রাখা মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। ও প্রান্তে রমলা, "ঋচীকদা, কেন আমার এই সর্বনাশটা আপনি করলেন ?"

রমলার গলা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ঘৃণা ফুটে বেরোচ্ছে। বললাম, "কী সর্বনাশ আমি করলাম রমলা ?"

—অতীন ব্যানার্জিকে দিয়ে সুমিতাভকে অ্যারেস্ট করালেন, ছিঃ।

—আমি তো কিছু করিনি রমলা। তুমি বোধহয় ভুল করছ।

—ন্যাকামো করবেন না। এটা আপনারই কাজ। সুমিতাভ কয়েকদিন ধরেই আমায় বলছিল। তখন বিশ্বাস করিনি। বলছিল, ঋচীক আমার ক্ষতি করে দেবে। কোনও ঝামেলায় ফাঁসিয়ে দেবে আমাকে। দিয়ে কী লাভ হল আপনার, ঋচীকদা ?

—শোনো... ও তোমায় ভুল বুঝিয়েছে। কী হয়েছে আগে আমায় বলো।

—আপনি সব জানেন। তুবও না জানার ভান করছেন ঋচীকদা। ফড়েপুকুরে আমাদের ওই ফ্ল্যাটটা পড়ে ছিল শুধু শুধু। ওর বন্ধু সোমনাথ এসে ধরাধরি করল, থিয়েটারের রিহার্সাল দেবে। মাঝেমধ্যে ফ্ল্যাটটা তাই ছেড়ে দিতে। সুমিতাভ আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল। আমিই বললাম, সোমনাথদা অত করে চাইছেন যখন, দাও। ছেলে মেয়েরা এসে রোজ নাটকের রিহার্সাল দিত। আজ পুলিশ গিয়ে ছেলে-মেয়েদের তুলেছে। সেই সঙ্গে সুমিতাভকেও। বলে কি না, ওখানে ব্রথেল চালানো হচ্ছিল। আমিও ছাড়ব না। সুমিতাভ স্যাঙ্গুইন, এটা আপনারই কাজ।

—রমলা, বলো তো কেন আমি এই কাজটা করতে যাব ? আমার কী লাভ ?

—লাভ অনেক। পার্টনারশিপ থেকে আমার হাজব্যান্ডকে আপনি সরাবেন। এত খেটে খুটে বিজনেসটা দাঁড় করাল। তার এই প্রতিদান দিলেন আপনি ? ছিঃ, আপনি মানুষ, না জানোয়ার ?

—তুমি যদি এই ভাষায় কথা বলো, তা হলে আমি কিন্তু লাইন কেটে দেব।

—ছাড়ুন তো। এখনও যে সম্মান দিয়ে কথা বলছি, এই ঢের। সুমিতাভ ধুলোবালি মেখে গেছে আর আপনি গায়ে সেন্ট লাগিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ছয় সাত বছর ধরে ঠকিয়ে গেছেন ওকে। এখন তো ও বলছে, রমলা তোমার সন্দেহটা মিথ্যে নয়। ঋচীক সত্যিই নন্দিনীকে আমার পেছনে ভিড়িয়ে দিয়েছিল। আমি প্রশ্রয় দিলে, মেয়েটাকে আর ঘাড় থেকে নামাতে পারতাম না। তুমি ঠিক সময় আমাকে টেনে ধরেছ।

যত শুনছি, মন আমার তত ভেঙে যাচ্ছে। সদর দরজার গায়ে একটা রোয়াক মতো আছে। তাতে বসে পড়লাম। কোনও রকমে বললাম, "রমলা, তোমার কি আর কিছু বলার বাকি আছে ? বলো শুনি। একদিন না একদিন নিজের ভুল তুমি বুঝতে পারবে।"

রমলার গলায় বিষ, "আপনাকে কিছু বলতে আমার ঘেন্না করছে। সুমিতাভকে আপনি যে অবস্থায় ফেলেছেন, আপনাকেও যদি আমি সেই অবস্থায় না ফেলি, আমার নামে কুকুর পুষবেন। অতীন ব্যানার্জি পাড়ার লোকদের দেখিয়ে মারতে মারতে ওকে ভ্যানে তুলেছে। যত টাকা লাগুক, এই অপমানের বদলা আমি নেবই।"

হিসহিস করে কথা বলে যাচ্ছে রমলা। কানের সামনে ফোন ধরে আছি। কিন্তু মাথায় কিছু ঢুকছে না। সারা শরীর কাঁপছে। একটা মানুষ যে এমন বদলে যেতে পারে, ভাবতেই পারি না। এই রমলাই থানায় বসে অতীনের সামনে বলেছিল, "ঋচীকদাকে আমি বিশ্বাস করি। তাই ফের এই বাস্টার্ডটার বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই যাওয়ার।" ক'মাস আগের কথা ? মাস পাঁচেক। এর মধ্যেই ওই গভীর বিশ্বাসের জায়গাটা সুমিতাভ টলিয়ে দিয়েছে। একদিনে নিশ্চয়ই নয়, ধীরে ধীরে। রমলাকে আমি যা-ই বলি, ও এখন বিশ্বাস করবে না। তার চেয়ে চুপ করে যাওয়া ভাল। ফোনে আরও কী ও বলে যাচ্ছে। শুনতে চাই না। সুইচটা অফ করে দিলাম।

কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে রইলাম। মনের যা অবস্থা, এখুনি তিতলিদের বাড়ি যাওয়া ঠিক না। রমলাকে দু'টো কথা বলতে আমিও পারতাম। কিন্তু কাউকে কড়া কথা বলার 'অভ্যেস' আমার নেই। শিখিনি। আর মা খুব নরম মনের মানুষ। আমায় বলত, তর্ক করে কখনও জেতা যায় না। তার চেয়ে চুপ করে থাকা ভাল। মাকে কোনওদিন আমি ঝগড়া করতে দেখিনি। দাদুর সম্পত্তি নিয়ে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে বাবার যখন মনোমালিন্য চলছে, তখনও মা বারণ করে গেছে, "কী দরকার ঝঞ্ঝাট করার, ছেড়ে দাও না। আমার দুটো ছেলে মানুষ হলেই, আমি খুশি। আর কিছু চাই না।"

কথাটা মনে হতেই চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। রমলা আমাকে বাস্টার্ড বলে গালাগালি দিল, কোনও প্রতিবাদ করলাম না। আমি কি মানুষ ? রোয়াক থেকে নেমে গেলাম রাস্তায়। ডানদিকের ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগলাম। কয়েক মিনিট হাঁটলেই

হেদুয়া। মোড়টা বেশ জমজমাট। ডানদিকে বেথুন স্কুলের ফুটপাত। বাঁ দিকটা সোজা হাতিবাগানের দিকে চলে গেছে। কী ভেবে ডানদিকের ফুটপাত ধরলাম। ফুটপাতের উপরই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে। লোহার খাঁচা দিয়ে ঘেরা। হাঁটতে হাঁটতে ওখানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

অনেক ... অনেক দিন আগে একবার ঠিক এই জায়গাটাতেই, ঠিক এই সময় একবার এসে দাঁড়িয়েছিলাম। মনে আছে... সব মনে আছে। সম্ভবত সেটা ছিল সপ্তমী পুজোর দিন। মিলি আর অনু ঠিক এই গাছের তলায় অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। দূর থেকে আমি ওদের দেখতে পেয়েছিলাম। খুব ভয় ভয় করছিল সেদিন। কমলামাসির মেয়ে অনু তার আধঘণ্টা আগে, ঘামে ভেজা একটা চিরকুট দিয়ে এসেছিল তেতলার ঘরে। খুলে দেখেছিলাম, তাতে লেখা "স্কুলের সামনে এসো। ঠাকুর দেখতে যাব। ইতি মিলি।"

কমলামাসির বাড়িতেই অনু আলাপ করিয়ে দিয়েছিল মিলির সঙ্গে। আমার থেকে এক বছরের ছোট। কিন্তু ওর স্মার্টনেসই আমাকে তখন অবাক করেছিল। মিলি লেখাপড়ায় তখন খুব ভাল, বেথুন স্কুলের ফার্স্ট গার্ল ক্লাস নাইনের। কমলারমাসির বাড়িতে সবাই ওকে খুব ভালবাসত। মিলি আমার মধ্যে কী দেখেছিল জানি না। ও বাড়িতে গেলেই ছুটে আসত। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করত। ওই সময়ই একবার বলেছিল, প্লাসমা ফিজিক্স নিয়ে পড়াশুনা করবে।

চিরকুট পেয়ে আমি ঠিক এই গাছতলাতে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মিলি নার্ভাস। ঘামছিল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে আমাকে মৃদু স্বরে বলেছিল, "কোন দিকে যাবে বুবুন ? বাসে করে সাউথে যাবে ?"

আমিও ঢোক গিলে বলেছিলাম, "এ ভাবে যাওয়া কি ঠিক হবে ? যদি কেউ দেখে ফেলে ?"

অনু বলেছিল, "চলো না বুবুনদা, সক্কাল থেকে আমরা সব ভেবে রেখেছি।"

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছিল, "ভাল ছেলেরা এই বয়সে মেয়ে নিয়ে ঘোরে না অনু।"

কথাটা শুনে মিলির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অনুর হাত ধরে ও টেনেছিল, "চল রে। বুঝিয়ে দিল, আমরা ভাল মেয়ে না।"

মিলি আর কোনওদিন আমার সঙ্গে কথা বলেনি। অনুও এড়িয়ে যেত। কমলামাসির বাড়িতে গেলে কখনও কখনও দরজা খুলে দেওয়ার সময়, দু'একবার ওকে বিদ্রূপ করতেও শুনেছি, "মা, তোমাদের ভাল ছেলে এসেছে।" অনুর বিয়ে হয়েছে গড়পাড়ে এক ডাক্তারের সঙ্গে। মিলি এখন আমেরিকায়। সত্যি সত্যি প্লাজমা ফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করছে। কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে মিলির কথা আজ আমার মনে পড়ল। কেন সেদিন ওকে নিয়ে সাউথে ঠাকুর দেখার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি, ভেবে অবাক হলাম। ভাল ছেলে হয়ে থাকার খুব দরকার ছিল আমার ?

বেথুন স্কুলের পাঁচিল ধরে এক চক্কর মেরে হাঁটতে হাঁটতে ফের এসে দাঁড়ালাম তিতলিদের বাড়ির সামনে। রাস্তার ধারে বেশ কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে। তার মানে কাকাবাবুর অ্যাডভোকেট বন্ধুরা এসে গেছেন। হল ঘরে বসে ওরা একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করবেন। হাইকোর্টের পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবেন। তার পর সামান্য

কিছু মুখে দিয়ে ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যে যে যার বাড়ি ফিরে যাবে। কাকাবাবুকেও দেখেছি, রোজ রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পরেন।

হলঘরের পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। হঠাৎ চোখাচোখি গীতানাথকাকার সঙ্গে। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। হাসিমুখে কী যেন বলছিলেন অন্যদের। আমাকে দেখেই বললেন, "ঋচীক, অনেকদিন বাঁচবে ভাই। তোমার গল্পই এতক্ষণ করছিলাম এদের সঙ্গে।"

কাকাবাবু গম্ভীর মুখে বসে। আগে হলে, সস্নেহে ডাকতেন। কেন এত দেরি, জিজ্ঞেস করতেন। আজ কিন্তু কিছু বললেন না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, "কী বলছিলেন, আমার সম্পর্কে ?"

—আরে ওই মেয়েটার কথা। সেবায় তুমি যাকে সারিয়ে তুললে। এরা আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন, মেন্টাল পেশেন্টরা সেরে ওঠার পর, সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেড হয় কি না। আমি বললাম, কেন হবে না ? অনেকেই বিয়ে থা করে সুস্থ জীবনে ফেরে। এই তো সেবা-র একটা মেয়েকে বিয়ে করছে, তোমাদের চেনাশুনা একটা ছেলে। তখনই তোমার নামটা করলাম। গুড। ডাক্তার ব্যানার্জি যখন আমাকে তোমার সম্পর্কে এই কথাটা সেদিন বললেন, তখন শুনে খুব ভাল লেগেছিল।

ঘরের মধ্যে বোমা ফাটলেও বোধহয় আমার কানে এত শব্দ হত না। কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। চন্দনাদির মুখে উনি সব কিছুই শুনেছেন। শোনার পর থেকে আমার সম্পর্কে উনি উদাসীন। সামনাসামনি কিছু বলেননি। কিন্তু আমি আর মা বুঝতে পারছি, কাকাবাবু অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

গীতানাথকাকা অন্য কথায় চলে গেছেন। সবাই মন দিয়ে শুনছেন। নিঃশব্দে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের চুকে গেল। আর হয়তো আসার দরকার হবে না। তিতলিকে একবার দেখে যাওয়ার ইচ্ছে হল। নীচে কথা বলার কেউ নেই। ক্যাটারারের লোক টেবল সাজিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। একটু পরেই শুরু হবে খাওয়া দাওয়া। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল বিভা। চন্দনাদির কথা জিজ্ঞেস করতেই বলল, "জামাইবাবুর সঙ্গে গল্প করছে ছাদে বসে। তুমি যাও না।"

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। ডানদিকের ঘরটা তিতলির। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম, ও সুটকেস গোছাচ্ছে। বিছানার উপর ডাঁই করা পোশাক। ব্যস্ত হয়ে কী যেন খুঁজছে। হঠাৎই আমায় দেখতে পেয়ে বলল, "বুবুনদা, কখন এলে ?"

—এক্ষুনি। তুই কেমন আছিস তিতলি ?

প্রশ্নটা যেন শুনেতই পায়নি, এমন ভাব দেখিয়ে ও বলল, "একটা সুখবর আছে বুবুনদা। আমি স্টেটসে চলে যাচ্ছি।" তিতলি আগেও একবার আমেরিকা যাওয়ার কথা বলেছিল। তখন বিশ্বাস হয়নি। শুনে তাই বললাম, "বাঃ, সত্যিই ভাল খবর। কবে যাচ্ছিস ?"

—আজ রাতেই, দেখো না, জিনিসপত্তর কিছু গোছানো হয়নি। এখনও ভিসা পাইনি। কী করে যে যাব বুঝতে পারছি না।

এই একটা কথাতেই বুঝে গেলাম, তিতলি ভাল নেই। সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ। সেবায় এরকম পেশেন্ট আমি অনেক দেখেছি। বললাম, "কী খুঁজছিস তুই ?"

—অ্যাঁ, কিছু বললে ? ঋষিটা একটা আঁতেল। বুঝলে বুবুনদা। সিরিয়ালের স্ক্রিপ্টটা কাল দেখতে দিয়ে গেল। অথচ খুঁজে পাচ্ছি না।"

তিতলি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। খুব রোগা হয়ে গেছে। চোখের কোণে কালি। চুল আঁচড়ায়নি। পরনে সালোয়ার-কামিজ। কামিজের বোতাম লাগানো নেই। গলার হাড় দেখা যাচ্ছে। ওকে দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বললাম,"ছাদে যাবি ? চল, গিয়ে রঞ্জনদার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করি।"

—গল্প করার সময় আমার নেই বুবুনদা। জীবনে একটা কিছু তো করে খেতে হবে। ভাবছি, মুনমুনটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

—মুনমুনকে তুই চিনিস ?

—প্রায়ই ও আসে। ফোনে গল্প করি। তোমাদের বাড়িতেই তো থাকে। সেদিন বলল, তোমার মা নাকি ওকে পছন্দ করে না। আমি বললাম, বাবলুটাকে তুই বিয়ে করলি কেন ? এই দ্যাখ, বুবুনদার জন্য এখনও আমি বসে আছি। একদিন না একদিন, ওর ভুল ভাঙবেই।

হঠাৎই ও জানলার কাছে চলে গেল। দু'হাতে শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইল। দু' তিন মিনিট পর ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আজও প্লেনটা চলে গেল। আমার যাওয়া হল না। এই মুনমুন শয়তানীটার জন্য আমি নিশ্চিন্তে যেতেও পারছি না। দিদিভাই বলছিল, ও নাকি খুব সুন্দরী। আরে, কত দিন সুন্দর থাকবি ? একটা সময়, বুবুনদা তোকে তাড়িয়ে দেবে। তার চে আয়, দু'জনে মিলে মরি।"

হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল তিতলি। তার পর বলল, "আমার কী নেই, বলো তো বুবুনদা ? লোকে কেন আমায় খারাপ মেয়ে বলে ? বাড়ির কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। হঠাৎ হঠাৎ খুব তাই রাগ হয়ে যায়। আচ্ছা, রাগ কমানোর কোনও ওষুধ তোমার কাছে আছে ? থাকলে, দিয়ে যেয়ো তো। রাতে আমার ঘুম হয় না। তখন খুব কষ্ট হয়।"

ওর অসংলগ্ন কথা শুনছি। আর ডাক্তার ব্যানার্জির কথা মনে হচ্ছে। এই ধরনের অনেক পেশেন্ট উনি সুস্থ করে দিয়েছেন। বললাম, "তুই একটা জায়গায় আমার সঙ্গে যাবি তিতলি ? গেলে দেখবি, তোর রাগ কমে গেছে। রাতে তুই ঘুমোতে পারছিস। অন্য রকম হয়ে গেছিস।"

—আমার সময় কই বলো। তোমাদের পিছনেই তো কত সময় আমার চলে যাচ্ছে। তোমার মা কেমন আছেন, এখন ?

—ভাল।

—উফ্ আমার তো ভয় হয়ে গেছিল। যাক বাবা, নিশ্চিন্তে, এখন আমি স্টেটস যেতে পারব। বুবুনদা, যাওয়ার আগে আমাকে একটু আদর করে যাবে ? সেই সেদিনের মতো। তোমার মায়ের যখন খুব জ্বর, তখন তুমি ছুতো করে আমায় তেতলায় নিয়ে গেলে। তোমার বিছানায় আমাকে শুইয়ে দিয়ে কত আদর করলে। আমি বললাম, বিয়ের আগে এ সব না। তখন তুমি বললে, মনে করো বিয়ে টিয়ে হয়ে গেছে।

—কী বাজে বকছিস তিতলি ?

—সেদিন বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে সব কথা আমি বলে দিয়েছি।

—ছিঃ তিতলি।

—ছি ছি-র কী আছে। সেদিনই তো তুমি আমায় নেকলেসটা দিলে।

—কীসের নেকলেস ?

—বাঃ ভুলে গেলে ? জড়োয়ার সেই নেকলেস ? তোমার বাবা যেটা কিনে রেখেছিল, তোমার বউয়ের জন্য। তুমি আমায় পরিয়ে দিলে। তার পর বললে, এটা তোকে দিলাম। মা যেন জানতে না পারে।

—কোথায় সেই নেকলেস ?

—এই তো আমার কাছে। আমি রেখে দিয়েছি। কথাটা বলেই তিতলি আলমারির কাছে গেল। ড্রয়ার খুলে নেকলেসটা বের করে বলল, "এদিকে এসো না বুবুনদা, আজ আবার পরিয়ে দেবে।"

প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে আমার। তিতলি সব মিথ্যে কথা বলছে। নেকলেসটার কথা মা একবার বলেছিল বটে আমায়। কিন্তু কখনও দেখায়নি। ওটা পেল কোথায় তিতলি ? মা যখন অসুস্থ হয়েছিল, তখন দু'তিন দিন মায়ের পাশ থেকে ও নড়েনি। নিশ্চয়ই সেই সময় সরিয়েছে। ও সব পারে। একবার নিউ মার্কেটের একটা দোকান থেকে ও লিপস্টিক চুরি করেছিল। খুব বেশিদিনের কথা নয়। কাকাবাবু সে বার বাঁচান ওকে পুলিশের হাত থেকে।

সব থেকে বিশ্রী ব্যাপার, নেকলেস পরিয়ে দেওয়ার গল্পটা যদি মায়ের কানে যায়, তা হলে মা আমার সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা করবে। তিতলি নেকলেসটা নিয়ে এগিয়ে আসছে। ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলাম। তার পর বললাম, "কেন এটা চুরি করলি, বল ? তুই এত নীচে নেমে গেছিস ?"

তিতলি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নেকলেসটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, "রাস্কেল, দাও, ওটা দাও। ওটা আমার জিনিস, দাও। ভেবেছিলে, মুনমুনকে পরাবে, না ? বাস্টার্ড কোথাকার।"

এই নিয়ে দু'বার শুনলাম কথাটা। বাস্টার্ড। রমলাকে হাতের সামনে পাইনি। তাই কিছু করতে পারিনি। তিতলিকে ছাড়া যায় না। ডান হাত তুলে ঠাস করে একটা চড় মারলাম। 'মাগো' বলে ও ছিটকে পড়ল। মেঝেতে নির্জীব হয়ে পড়েই রইল। আর এ বাড়িতে থাকা উচিত নয়। ঘুরে দরজার দিকে এগোতেই দেখি, মা আর কাকিমা।

বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে ওরা তাকিয়ে রয়েছেন।

॥ সতেরো ॥

জামিন পেয়ে সুমিতাভ বাড়ি ফিরে এসেছে। ফোন করে আমাকে বলল, "ঋচীক, ইস্টার্ন বাইপাসের প্রোজেক্টটা থেকে আমি নিজেকে উইথড্র করছি। তোর সঙ্গে কাজ করা আর সম্ভব না।"

জানতাম, ও এই কথাটা বলবে। চুপ করে রইলাম। নিজে অন্যায় করে ও দোষ চাপাল আমার ঘাড়ে। আমার কিছু করার নেই। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফের সুমিতাভ বলল,"রমলা চাইছে না, তোর সঙ্গে আমি কোনও সম্পর্ক রাখি।"

বললাম, "আমি কিন্তু তোকে ছাড়িনি। তুই-ই আমাকে ছাড়ছিস। এ সব কথা ফোনে হয় না। তুই আয়, কথা বলব সামনাসামনি।"

—না। আমি চাই না। আমার উকিল তোর সঙ্গে কথা বলবে।

—ঠিক আছে। যেমন তোর ইচ্ছে।

কথাটা শেষ হতে না হতেই সুমিতাভ লাইন কেটে দিল। প্রোজেক্টটা নিয়ে খুব মুশকিলে পড়ে গেছি। অনেক কাজ বাকি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হলে, চার-পাঁচটা মাস আমাকে দিন-রাত পড়ে থাকতে হবে সাইটে। সর্দার ছেলেটা বলেছে, "আপনি কিছু ভাববেন না ঋষিবাবু। কাজ আমরা তুলে দেব। সুমিতবাবু থাকুক বা না থাকুক।" কিন্তু মন তা মানতে চাইছে না।

নন্দিনী বলেছে, "সুমিতাভদা অনেক ফালতু খরচ দেখাত। সেটা বাঁচবে। ভগবান যা করেন, তা মঙ্গলের জন্য।"

—আমাকে তো বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেল।

—কিচ্ছু ভাববেন না। রোজ আপনি আসুন। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। যাঁরা বুকিং করেছেন, তাদের ডেকে একদিন পরিস্থিতিটা জানান। ওরা নিশ্চয়ই বুঝবেন। সবার ফোন নম্বর আর ঠিকানা আপনাকে দিচ্ছি। আপনি কথা বলুন, পার্সোনালি।

নন্দিনীর কথা অনুযায়ী, গত তিন চারটে দিন স্রেফ এই কাজটা করে গেছি। সকালবেলায় গিয়ে অফিসে বসছি। ফিরছি রাত দশটা-এগারোটায়। কারও জন্য কিছু আটকায় না। সেটাই আমি বুঝিয়ে দিতে চাই সুমিতাভকে। চব্বিশজন এসে কথা বলে গিয়েছেন। একমাত্র অরুণাংশু ভট্টাচার্য বলে একজন আসেননি। একটা ফোন নম্বর দেওয়া ছিল নাম-ঠিকানার পাশে। যতবার করছি, ততবারই টেপ বাজছে, দিস টেলিফোন ডাজ নট একজিস্ট। আমার ধারণা, এই ফ্ল্যাটটা সুমিতাভ নিজে বুক করেছে। অন্যের নামে। বুকিং হয়েছে একেবারে গোড়ার দিকে। দাম অস্বাভাবিক কম। হয়তো পরে ডবল দামে বিক্রি করত কাউকে।

সাইটে যেতে আমার বেশ ভাল লাগছে আজকাল। ওখানে বসার পর থেকে আরও চারটে ফ্ল্যাট বুক হয়ে গেছে। বাকি রয়েছে তিনটে। মনে হয়, প্রোজেক্ট শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই ওগুলো বিক্রি হয়ে যাবে। খবরের কাগজে একবার বিজ্ঞাপন দেব কি না ভাবছিলাম। নন্দিনী অবশ্য বারণ করছে, "বিজ্ঞাপন দিলে ভিড় সামলাতে পারবেন না বুবুনদা। আর কয়েকটা দিন, দেখুন।"

হাতঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম, সাড়ে সাতটা। আধঘণ্টার মধ্যে চান, খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে যেতে হবে। বাথরুমে ঢুকতে যাব, হঠাৎ দেখি মা। চোখ-মুখে উদ্বেগ। বলল, "ও বাড়িতে বোধহয় একটা কিছু হয়েছে। একটু দেখবি?"

—তুমি কী করে জানলে মা?

—একটা অ্যাম্বুলেন্স দেখলাম ঢুকতে। তোর কাকাবাবুর কিছু হয়নি তো?

—দাঁড়াও, আমি খোঁজ নিচ্ছি।

তিতলিদের বাড়িতে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। ছাদ থেকে বিলুকে ডাকলাম, "এই, চন্দনাদিদের বাড়িতে কী হয়েছে রে, জেনে আয় তো।"

—সে কী তোমরা কিছু জানো না?

—না।

—তিতলি তো ভোরের দিকে সুইসাইড করতে গেছিল।

শুনেই শরীরটা শক্ত হয়ে গেল। সিজোফ্রেনিকরা মাঝেমধ্যেই জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। তখনই আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বিলু তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। জিজ্ঞেস করলাম, "কী ভাবে চেষ্টা করছিল রে।"

—হাতের ভেন কেটে দিয়েছে। কী রক্ত, চিন্তা করতে পারবে না। নার্সিংহোম নিয়ে গেল মানুদা।

মা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিলুর কথাটা শুনে কার্নিশ ধরে নিজেকে সামলাল। তারপর ফ্যাকাশে মুখে বলল, "তুই একবার যাবি ?"

—না মা। যাওয়া ঠিক হবে না। কাকাবাবু খবর দেয়নি। লক্ষ করেছ, মানুদাদের বাড়িতে খবর দিয়েছে, তবুও আমাকে ডাকেনি।

আগে ও বাড়িতে সামান্য কিছু হলেও, আমার ডাক পড়ত। আর এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটল, তা সত্ত্বেও কাকাবাবু খবর দিলেন না। মা আক্ষেপ করল, "কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল, তাই না ?"

শ্বাস চেপে বললাম, "কী আর করা যাবে।"

ঘরে ঢুকে মা বলল, "বুবুন, এ বাড়িতে থাকতে আর ভাল লাগছে না রে। চল, বাড়ি বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে যাই।"

—কী বলছ তুমি মা ! আমরা কেন যাব ? না, তুমি এই চিন্তা মাথায় আনবেই না।

—মেয়েটা সারাজীবন শুধু জ্বালিয়েই গেল।

কথাটা পাত্তা না দিয়ে বললাম, "তোমার পুজো হয়নি মা ?

—এই বসব। আজকাল মনটা এমন চঞ্চল হয়ে গেছে, ঠাকুরকেও এক মনে ডাকতে পারি না।

—তোমার কী এত চিন্তা মা।

—তোকে নিয়ে। হ্যাঁরে, মুনের কোনও খবর নিয়েছিস ?

—ও সব কথা থাক না।

—আমি বলি কী, তুই একবার বহরমপুর যা। আমাকেও নিয়ে চল না হয়। তুই সব সময় মুখ কালো করে থাকিস, আমার ভাল লাগে না বাবা।

—কই আমি মুখ কালো করে থাকি। আসলে সুমিতাভ সরে গিয়ে খুব অসুবিধায় ফেলে দিয়েছে আমাকে। কাজের চাপ বেড়ে গেছে। কমলামাসিকে খবর দিচ্ছি। কয়েকটা দিন এখানে এসে থাক। তোমার তা'লে একা থাকতে হবে না।

—না না। ওরও তো ঘর সংসার আছে। শুধু শুধু ওকে ব্যস্ত করার দরকার নেই।

মনটা আরও উতলা হয়ে রয়েছে দিদির জন্য। সেদিন ফোন করেছিল। বুটুর বিয়েটা নাকি ভাল হয়নি।

—কী হল আবার ?

—বুটুর বর নাকি ছিটিয়াল ধরনের।

—কেন কী করেছে ? বিয়ের দিন দেখে তো মনে হল না মা।

—তোর মেসো দু'একদিন অন্তর ওদের বাড়ি যেত। একদিন নাকি বলে দিয়েছে,

রোজ রোজ আসবেন না।

শুনে মনে মনে হাসলাম। মেসোমশাই কোনও দিন মানুষকে মানুষ বলে মনে করেননি। এ বার কাঠে কাঠে পড়েছেন, "মেসোমশাই কিছু বলেনি ?"

—কী আর বলবে। মানুষটাকে তো তুই চিনিস। এখন নাকি বলছে, ডিভোর্স করিয়ে দেবে।

—বুটুর বর কিন্তু খারাপ কিছু বলেনি মা। নতুন বিয়ে হয়েছে, এখন একটু ওদের একা একা থাকতে দেওয়া উচিত। যাক গে, রুমকিকে তুমি রেডি থাকতে বলো। আমি চান করেই খেতে বসব।

কথাটা বলে আমি বাথরুমে ঢুকে গেলাম। এই ক'দিন সব কিছুই আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। মাও হয়তো চলে যেত। কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছে কমলামাসি। সেদিন তিতলি যখন নেকলেস নিয়ে মিথ্যে কথা বলছিল, তখন মা সব কথাই শোনে। আমি আর দাঁড়াইনি। সোজা বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। মিনিট দু'য়েক পর মাও ফিরে এল। ছাদের অন্ধকারে আমি দাড়িয়েছিলাম। মাকে দেখে বলেছিলাম, "তুমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না মা।"

আমার কান্না পেয়ে গেছিল। মা আমাকে তখন বলেছিল, "তোকে আমি বলিনি। নেকলেসটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কমলার কাছে একদিন কথাটা পাড়তেই বলল, মনে হয় তিতলির কাজ। আমি বিশ্বাস করিনি। ও বলল, নমি, তোমার জ্বরের সময় একদিন ওকে আলমারি হাতড়াতে দেখেছিলাম।"

—কিন্তু মা, ওটা কী জন্য তুমি রেখে দিয়েছ, সেটা তিতলি জানল কী করে ?

—একদিন আমিই কথায় কথায় কমলাকে বলেছিলাম। সেই সময় তিতলি ছিল।

—উফ্ মা, তিতলির কথায় তুমি যদি আমায় সন্দেহ করতে, আমায় তা হলে বাড়ি ছাড়তে হত।

—দূর বোকা। তুই খারাপ কাজ করতেই পারিস না। তোকে তো আমি চিনি। তবে আজ যা হল, এর পর আমি অন্তত ও বাড়িতে যাচ্ছি না।

—কী হয়েছে মা ?

—তোর কাকাবাবু আমাকে শুনিয়ে বললেন, দুধ কলা দিয়ে অ্যাদ্দিন কালসাপ পুষেছেন।

—কাকাবাবু খুব স্বার্থপর মা।

—যাক বাবা, একটু সমঝে চলিস আজ থেকে।

... স্নান করতে করতে মায়ের কথাগুলো মনে পড়ছে, জীবনে এমন সমস্যায় কখনও পড়িনি। এই ক'দিন আগেও, আমার কোনও শত্রু ছিল না। এখন সবাই কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। আমাকে মিথ্যে দোষারোপ করছে। যারা করছে, একটা সময় তারা খুব কাছের লোক ছিল। সুমিতাভ, রমলা, তিতলি, কাকাবাবু, মুন... হঠাৎই দিন কয়েকের মধ্যে বদলে গেল।

আশপাশের মানুষগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস চলে যাচ্ছে। এও এক অভিজ্ঞতা। ডাক্তার ব্যানার্জির একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। "আসল কথা কী জানো ঋচীকভাই, বিশ্বাস। বেঁচে থাকার আনন্দ যা কিছু, তা ওই বিশ্বাসের মধ্যে। নিজের উপর কখনও বিশ্বাস হারিয়ো না। অপরের প্রতিও না। জীবনে যত ঝড় ঝাপটা

আসুক।" কথাটা মনে পড়তেই, মনে একটু জোর পেলাম। ডিপ্রেশন জিনিসটা খুব খারাপ। মনের রোগের শুরু। সেবায় গিয়ে, এক মারাত্মক পরিণতি দিনের পর দিন নিজের চোখে দেখেছি। তার চেয়ে বরং ভাল, শুভর কথা আর মাথার মধ্যে না রাখা। ঠিক করে নিলাম, শুভর কথা আমি আর ভাববই না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ফের যখন নীচে নেমে এলাম, তখন প্রায় ন'টা। দেরি হয়ে গেছে। ইস্টার্ন বাইপাসে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে। বাবলুটা চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। খুব অসুবিধায় আছি। নিজে কয়েকদিন ড্রাইভ করেছি। একদিন একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। গড়িয়াহাটের মোড়ে একটা প্রাইভেট বাস ধাক্কা মেরে চলে গেল। ডানদিকে টাল খেয়ে গেছে গাড়িটার। এখন আর নিয়ে বেরোচ্ছি না। ট্যাক্সি করে সাইটে যাচ্ছি। আর আসার সময়, রাসবিহারী পর্যন্ত অটো করে এসে, তার পর পাতাল রেলে নামছি গিরিশ পার্কে। ফেরার সময়টা মন্দ লাগে না।

বিডন স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে রয়েছি ট্যাক্সির জন্য। হঠাৎ দেখি মানুদা। বিলুর দাদা। রেলের গার্ড। এই মানুদাই আজ তিতলিকে নার্সিংহোমে নিয়ে গেছিল। ও বাড়িতে কী হল, খবর পাওয়া যাবে মানুদার কাছ থেকে। চোখাচোখি হতে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন দিকে যাবে, মানুদা?"

—শেয়ালদায়। তুই কোথায় যাবি?

—বাইপাস। চলো, তোমায় নামিয়ে দিচ্ছি।

কী ভেবে দাড়িয়ে গেল মানুদা। উল্টো দিক থেকে একটা ট্যাক্সি আসছিল।

মানুদা নিজেই সেটা থামিয়ে বলল, "বুবুন, আয়, উঠে আয়।"

তিতলির কথা সরাসরি জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। পাড়ার লোক এখনও জানে না, আমাদের দু'বাড়ির সেই সম্পর্কটা আর এখন নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি তো আরও আগে অফিস বেরোও মানুদা। আজ এত দেরি হল?"

—আর বলিস না। তিতলির জন্য। শুনেছিসই তো সব। হ্যাঁ রে, ওরা বলছিল, তোকে ডাকা সত্ত্বেও, তুই নাকি ও বাড়িতে যাসনি?

—একটা কাজে আটকে গেছিলাম মানুদা।

—না গিয়ে ভালই করেছিস। যা খেপে আছে তোর ওপর, পারলে তোকে চিবিয়ে খাবে।

—কী বলছে?

—তোর সম্পর্কে খারাপ সব কথা। তিতলির সঙ্গে অ্যাদ্দিন প্রেম করে, এখন নাকি বলছিস বিয়ে করবি না।

—কথাটা কিন্তু সত্যি না মানুদা।

—কী জানি। পুলিশ এসে জিজ্ঞেস করেছিল। ওরা তো দেখলাম, দোষ চাপাল তোর ওপর। তোকে ঝামেলায় ফেলে দিতে পারে।

পুলিশ শুনেই বুকটা গুরগুর করে উঠল। পরক্ষণেই অতীনের কথা মনে হল। অতীন আছে, নিশ্চয়ই বাঁচাবে। জিজ্ঞেস করলাম, "তিতলি কেমন আছে মানুদা?"

—ভাল না। নার্সিংহোম থেকে আসার সময়ও শুনলাম আনকনশাস। জানি না, এখন জ্ঞান ফিরেছে কি না। প্রচুর ব্লাড বেরিয়ে গেছে রে। মেয়েটা বাঁচলে হয়।"

কথাটা ধক করে এসে বুকে বিঁধল। মেয়েটা বাঁচলে হয়। তিতলির মতো একটা

মেয়ে মরে যাবে ? মুখ ছিটকে বেরিয়ে গেল, "কী বলছ কী মানুদা ?"

—এত অবাক হচ্ছিস কেন ? এই মেয়েটাকে ছোটবেলা থেকেই তো দেখছি। একেবারে ছিটিয়াল গোছের। বিয়ে করলে তুই সারাটা জীবন ভুগতি। আমি যেমন ভুগছি, তোর বউদিকে নিয়ে। বউদির কথা মানুদা তুলতেই, চট করে মনে পড়ে গেল, ছাদ থেকে দেখা নগ্ন দেহটার কথা। এই সময়ই আমার মাথায় কে যেন একটা পিন ফোটাল। চোখ বুজে সেই ব্যথাটা আমি সহ্য করলাম।

মানুদা বলেই যাচ্ছে, "বিয়ের আগে খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি। বাড়ি এনে দেখি, আস্ত পাগল। আমার লাইফটাই নষ্ট হয়ে গেল রে।"

—ডাক্তার দেখাওনি ?

—প্রথম দিকে দু'একবার দেখিয়েছি। ওষুধ খায় না। সারবে কী করে ? আমার যা চাকরি, এই দ্যাখ না...হয়তো লালগোলায় ডিউটি দেবে। দিলে সেই ট্রেন নিয়ে ফিরে আসব কাল ভোরে। আমার পক্ষে নজর রাখা সম্ভব, তোর বউদি ওষুধ খাচ্ছে কি না তা দেখা ?

—কেন তোমার মা, বাবা ?

—ওদেরও পাগল হওয়ার অবস্থা। একবার তোর বউদিকে বাপের বাড়িতে রেখে এলাম। তিনদিন পরেই ওর ভাই ফেরত দিয়ে গেল। আমি ফের দিয়ে আসতে পারতাম। কোথায় যেন বাধল।

জানলার হাওয়াটা ভাল লাগছে না। কাচটা তাই তুলে দিলাম। মাথায় পিন ফোটার যন্ত্রণা হচ্ছে। আড় চোখে মানুদার দিকে তাকালাম। মুখটা খুব বিষণ্ণ। এই মাত্র লোকটা একটা মারাত্মক কথা বলল। "কোথায় যেন বাধল।" ক'টা লোকের এই বোধটা আছে ? অ্যা। অথচ পাড়ার লোকরাই এই মানুদা সম্পর্কে বলে, মাথামোটা। মানুষটার বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। সারা পৃথিবীর লোক যদি মানুদার মতো হত, তা হলে তো কোনও অশান্তিই থাকত না। মনের রোগ থাকত না। ডাক্তার ব্যানার্জির মতো লোকেরা কাজ না পেয়ে বসে থাকতেন। তা হলে মানসবাবু কী করতেন ? চট করে কিছু মনে এল না। আর তখনই মাথায় সেই পিন ফোটার যন্ত্রণাটা ফের টের পেলাম।

—বুবুন, পাড়ায় ওরা তোর খুব বদনাম করে দেবে রে। ওদের অ্যাটিচুড আমার ভাল লাগল না। সাবধানে থাকিস। তুই ভাল ছেলে বলেই, কথাটা বললাম।

মাথায় এই একটা ধাক্কা দিয়ে মানুদা একটু পরে নেমে গেল। সিটের পিছনে হেলান দিয়ে বসলাম। চোখের মণি দুটো কটকট করছে। শরীরটা একটু ভার ভার লাগছে। চোখটা বন্ধ করে রইলাম। পাড়ায় আমার খুব বদনাম হয়ে যাবে ? হোক, কী করা যাবে। আমি তো জানি, আমি কোনও অন্যায় করিনি।

ইস্টার্ন বাইপাসে সাইটে যখন পৌঁছলাম, তখন সাড়ে দশটা। গেটের সামনে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সি ছেড়ে অফিস ঘরে ঢুকতেই দেখি দু'জন অপরিচিত লোক বসে রয়েছেন। বোধহয় নতুন বুকিং করাতে এসেছেন। আমাকে দেখে নন্দিনী লোক দুটোকে বলল, " ইনি ঋচীক বসু। এর সঙ্গে কথা বলুন।"

লোক দুটো হাত তুলে নমস্কার করল। একজন বলল, "আপনাকে আমরা সমন ধরাতে এসেছি।"

—সমন ? কী ব্যাপারে বলুন তো ?

—পড়লেই বুঝতে পারবেন। কনস্ট্রাকশনের উপর ইনজাংশন দিয়েছে কোর্ট। কাজ বন্ধ রাখতে হবে।

—কেন ?

—এই জমিটা নিয়ে ডিসপিউট আছে। জমিটা আপনারা যাঁর কাছ থেকে কিনেছেন, তাঁর এক ভাই বাংলাদেশে থাকেন। তাকে না জানিয়ে অন্য ভাইরা আপনাদের কাছে জমিটা বিক্রি করেছে।

—কিন্তু আমরা তো সার্চ করিয়েছিলাম।

—তা হলে কোর্টে অ্যাপিয়ার করলেন না কেন ? কালই তো এক্সপার্টি ডিসিশন হয়ে গেল। একটার পর একটা ডেট চলে গেল। আপনারা কনটেস্ট করলেন না।

—সে কী ? কেউ তো আমাকে বলেনি।

—তা বললে হয় ? আপনার পার্টনার সব জানেন। আমি নিজে এসে সমন ধরিয়ে গেছি তাঁকে।

নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে দেখি, ও মাথা নিচু করে আছে। ও জানলে নিশ্চয়ই আমাকে বলত। জমিটা কেনার সময় সুমিতাভই পুরো ডিল করেছিল। মালিককে অবশ্য দু'একবার আমার কাছে আনতে চেয়েছিল। তখন আমিই সময় দিতে পারিনি। মুনের সঙ্গে তখনই আমার আলাপ। তলায় তলায় সুমিতাভ যে বেআইনি কাজটা করে রেখেছে, তার মাসুল এবার আমায় দিতে হবে। নিজে সরে গেছে, এখন মজা দেখছে। হয়তো ও-ই চিঠি দিয়ে বা ফোন করে বাংলাদেশের অংশীদারকে সব জানিয়ে দিয়েছে। সুমিতাভ সব পারে। চিনচিনে রাগ হতে শুরু করল।

কিছু টাকা পয়সা দিলেই কোর্টের লোকটাকে ভাগিয়ে দিতে পারি। আমি তা করব না। কাগজপত্রে সই দিয়ে বললাম, "আপনারা আসুন।" লোক দুটো অবাক হয়ে চলে গেল। নন্দিনীকে বললাম, "তোর জানাশুনো কোনও অ্যাডভোকেট আছে, সিভিল সাইডের ? একটু খোঁজ কর তো ?"

ও বলল, "কেন, তোমার কাকাবাবুই তো দাঁড়াতে পারেন আমাদের হয়ে।"

—না, পারবেন না। উনি ক্রিমিন্যাল সাইডের।

—এটা কিন্তু সুমিতাভদার খচড়ামি বুবুনদা।

—বুঝতেই তো পারছিস। আমারই দোষ। ওর ওপর সব ছেড়ে দিয়েছিলাম। সর্দারকে বলে দে, দু'চারদিন কাজ বন্ধ রাখতে হবে।

মাথাটা যন্ত্রণা করছে খুব। কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। গলার স্বর শুনে নন্দিনী বলল, "বুবুনদা, আপনার শরীরটা কি খারাপ ?"

—না। ঠিক আছি রে।

—ভীম বলে একটা ছেলে এসেছিল, আপনার সঙ্গে কথা বলতে।

—কে সে ?

—এখানকার মস্তান। সুমিতাভদার সঙ্গে খুব খাতির ছিল।

—এসে কী বলল ?

—চাঁদা চাইল। এখানে কী একটা মেলা করবে। বলল, ঋচীক বসুকে বলবেন, আমাদের পার্টি অফিসে গিয়ে কথা বলতে। ছেলেটার হাবভাব ভাল লাগল না।

একটা বিল কেটে দিয়ে গেছে। পঞ্চাশ হাজার টাকার।

মাথায় বেশ কয়েকটা পিন কে যেন একসঙ্গে ফুটিয়ে দিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "মগের মুল্লুক নাকি।"

—আমার মনে হচ্ছে, এটাও সুমিতাভদার বদমাইশি। নানাভাবে ডিস্টার্ব করবে আমাদের।

—করুক।

—ফের যদি ভীম ছেলেটা আসে, কী বলব?

—বলবি, একটা পয়সাও আমরা দেব না।

কথাটা একটু জোরে বলা হয়ে গেল। নন্দিনী চমকে তাকাল আমার দিকে। তার পর বেরিয়ে গেল। মাথার মধ্যে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে। বাড়ি চলে গেলে হয়। কিন্তু গিয়ে কী হবে? মা অযথা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে। টেবলে মাথা রেখে বসে রইলাম। হঠাৎ এক সঙ্গে অনেক চিন্তা মাথায় জড়ো হল। সব চিন্তাগুলো ঘুরপাক খেতে লাগল। আমি এখন স্পষ্ট কাকাবাবুকে দেখতে পাচ্ছি। চেম্বারে বসে আছেন। উল্টো দিকের চেয়ারে বসে বহরমপুরের সেই মস্তান সুবীর। দু'জনে কথা বলছেন।

—বুবুনটা তো ফেঁসে গেছে। কোর্টে দৌড়োদৌড়ি করছে এখন।

—কেন কাকাবাবু?

—জমির মামলা। আর কী কাজকর্ম সব আটকে গেছে ইনজাংশনে। ওর ব্রিফ নিয়েছে চ্যাটার্জি। ওকে বলে দিয়েছি, ঝুলিয়ে দাও। আমিও বার লাইব্রেরির লোক। দেখি, কোন অ্যাডভোকেট ওর হয়ে লড়ে।

হি হি করে হাসছে সুবীর। তার পর বলল, "আসল দৌড় তো এখনও আমি করাইনি। দেখবেন, তার পর এ পাড়ায় আর ঢুকতে পারবে না।

—যা করার, তাড়াতাড়ি করো।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল তিতলি। পরনে তাঁতের শাড়ি। ওর কপালের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। সিঁদুর! তিতলির কি বিয়ে হয়ে গেছে? এত তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে হল কী করে? এই তো আজই মানুদার মুখে ওর কথা শুনলাম। তিতলির হাতে ট্রে। তার ওপর মদের বোতল আর গোটা তিনেক গ্লাস। ওর ডান হাতের কবজির কাছে ব্যান্ডেজ। খুব আবদেরে গলায় ও বলল, "সুবীর, আজ তোমাদের সঙ্গে আমিও একটু ড্রিঙ্ক করব।"

চমকে উঠে আমি টেবল থেকে মাথাটা তুললাম। কাকাবাবু, সুবীর, তিতলি—কোথায় কে? দরজা দিয়ে দেখি, দূরে নন্দিনী। কথা বলছে সর্দারের সঙ্গে। আশ্চর্য! এই মাত্র যে দৃশ্যটা দেখলাম, সেটা তা হলে কী? আমি কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি? দূর, তাই হয় নাকি?

টেলিফোনটা বাজছে। রিসিভার তুলতে গিয়ে দেখি, হাতটা খুব ভারী ভারী ঠেকছে। বলতে গেলাম, হ্যালো, হ্যালো। ঘরঘরে গলায় কী বেরোল, নিজেই বুঝতে পারলাম না। দূর....অনেক দূর থেকে মায়ের গলা শুনতে পেলাম, "কে বুবুন.... বুবুন আছে?"

—বলছি।

—বাবা, এ দিকে এক কাণ্ড হয়ে গেছে।

—কী মা ?

—কয়েকটা মেয়ে এসে তোর খোঁজ করে গেল।

—কেন মা ?

—ওরা মহিলা সমিতির, না কী যেন বলল। সিং দরজার ওপাশে মেয়েগুলো মিটিং করছে। তোর নামে বিচ্ছিরি পোস্টার মেরে দিয়ে গেছে।

হঠাৎই পেটের ভেতর থেকে একটা হাসি উঠে এল। আমার নামে পোস্টার....হা. হা....মেয়েগুলো পাগল নাকি ? হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, "পোস্টারে কী লিখেছে মা ?"

—তিতলির সঙ্গে তোর নাম জড়িয়ে বিচ্ছিরি সব কথা। পাড়ায় মান-ইজ্জত আর রইল না। মেয়েগুলো আমাকে খুব শাসিয়ে গেল। বলল, এ পাড়ায় কী করে থাকেন, দেখে নেব।

—তুমি ভয় পেয়ো না মা। আমি আসছি।

—না না। এখন আসিস না। সেই জন্যই ফোন করলাম। রুমকিকে পাঠিয়েছি থানায়। অতীনকে খবর দিতে গেছে। পরে তোকে ফের ফোন করব।

—ঠিক আছে মা।

—তোর শরীরটা খারাপ নাকি রে। গলাটা কেমন যেন শোনাচ্ছে।

—আমার কিচ্ছু হয়নি মা। ঠিক আছি।

বলেই ফোনটা রেখে দিলাম। মায়ের কান, ঠিক ধরেছে। শরীরটা সত্যিই আমার খুব খারাপ লাগছে। টানটান হয়ে শুতে পারলে ভাল হত। শীত শীত করছে। ঘাড়ের ওপর দিয়ে নেমে আসছে একটা জগদ্দল পাথর। হালকা বোধ করার জন্যই মাথাটা ফের টেবলের উপর রাখলাম।

আর তখনই ঠিক দেখতে পেলাম আগুনের সেই গোলাটাকে। লাল আর হলুদ মিলিয়ে আশ্চর্য উজ্জ্বল সেই রং। ছোট্ট থেকে সেই গোলাটা ক্রমশই বড় হতে লাগল। একটা অংশ ছিটকে বেরোল। বড় গোলাটাকে আর আমি দেখতে পেলাম না। ছোট্ট সেই আগুনের গোলাটাই আবার বড় হচ্ছে। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। কান, নাক, মুখ, কপাল, মাথা থেকে গরম ভাব বেরোতে লাগল। মনে হল, এই গোলাটাকে বের করে দেওয়া দরকার। না হলে এখুনি আমি অজ্ঞান হয়ে যাব।

কোনও রকমে টেবল থেকে মাথাটা তুলে, আমি নন্দিনীকে খুঁজলাম। ও খুব ভাল মেয়ে। মাথা থেকে আগুনের গোলাটা যদি ওকে বের করে দিতে বলি, নিশ্চয়ই ও দেবে। আমি ওকে চাকরি দিয়েছি। ও খুব কৃতজ্ঞ। ওকে আমি যা করতে বলব, তাই ও করবে। চোখটা কেমন ঘোলাটে হয়ে আসছে। নন্দিনীকে দেখতে পেলাম না। তাই মাথাটা ফের টেবলে রাখলাম। হঠাৎই মনে হল, এক বার সেবায় গিয়ে ঘুরে এলে ভাল হত। অনেকদিন, মুনের কোনও খবর নেওয়া হয়নি। ও কেমন আছে, সেটা জানা দরকার। পরক্ষণেই মনে হল, এ কী, আমি এত ভুলভাল চিন্তা করছি কেন ? মুন তো এখন সেবায় নেই।

—কেমন আছ ঋচীক ?

চেনা গলা শুনে মুখ তুলে তাকালাম। টেবলের উল্টোদিকেই দাঁড়িয়ে এক ভদ্রমহিলা। বয়কাট চুল, পরনে জিনসের পোশাক। মনে হল, সদ্য বিদেশ থেকে

এসেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। চিনতে পারলাম না। কে এই ভদ্রমহিলা ? গলা চিনি, অথচ মানুষটাকে চিনি না ! অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রমহিলা এ বার বললেন, "চিনতে পারছ না ? আমি মিলি।"

মিলি ? ও তো আমেরিকায়। প্লাজমা ফিজিক্স নিয়ে পড়াশুনা করতে গেছে। ও এল কবে ? মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে যেতেই মিলি বলল, "তোমায় দেখতে এলাম। তুমি আগের মতোই আছ কি না। আগের মতো ভাল ছেলে।" বলেই ও ফের হাসতে শুরু করল। মাথার ভেতর সেই আগুনের গোলাটা থেকে ফের একটা অংশ ছিটকে বেরোল। দাঁতে দাঁত চেপে সেই যন্ত্রণাটা আমি সহ্য করলাম। কতদিন পর দেখা মিলির সঙ্গে ? চোদ্দো-পনেরো বছর ? তা হবে। বেথুন স্কুলের ফুটপাতে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে অনুর হাতটা টেনে মিলি বলেছিল, "তার মানে, আমাদের খারাপ মেয়ে বলছে।" সেই ওর শেষ কথা। গলার স্বরটা এখনও একই রকম আছে। মিলির শরীরটাই শুধু বদলে গেছে।

মিলিকে হাসতে দেখে ক্লান্ত গলায় বললাম, "কেমন দেখছ আমাকে ?"

—নট অ্যাট অল এক্সপেক্টেড ঋচীক। এখানে আসার আগে তোমাদের পাড়ায় গেছিলাম। অনেক কথা শুনে এলাম তোমার সম্পর্কে। তুমি অত্যন্ত নোংরা চরিত্রের মানুষ। তোমার জন্য একটা মেয়ে সুইসাইড করেছে। আরও একটা মেয়ে সুইসাইড করতে চেয়েছিল। তার অসম্ভব মনের জোর বলে, করেনি।

আমি অবাক হয়ে মিলির কথা শুনছি। কে এই মেয়েটা, যে সুইসাইড করতে চেয়েও করেনি ? প্রশ্নটা মুখ থেকে বেরোবার আগেই মিলি যেন বুঝে যাচ্ছে। বলল, "কে আবার, এই আমি। ভাগ্যিস ওই বোকামিটা তখন আমি করিনি। এখন ভাবলে হাসি পায়। তোমার মতো একটা ফালতু ছেলের জন্য, আমি এত সুন্দর ভবিষ্যৎটাকে নষ্ট করতে যাচ্ছিলাম। ইউ হিয়ার মি ঋচীক। বাট আই অ্যাপ্রিসিয়েট, তুমি যদি ওই কিকটা আমায় তখন না দিতে, তা হলে হয়তো আজ তোমার বাচ্চার কাঁথা কেচেই জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলতাম।

মিলি হাসছে। হাসির শব্দটা আমার মাথায় এসে ধাক্কা মারছে। মিলি আমায় অপমান করে যাচ্ছে। করুক। এটাই বোধহয় আমার প্রাপ্য ছিল। একটা সময় আমি ছিলাম কৃষ্ণচূড়া গাছটার ও দিকে। ও দিকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার কথা তখন ভেবে দেখিনি। এখন বুঝতে পারছি, ও দিকে দাঁড়িয়ে থাকাটা কেমন কষ্টের। কোনও রকমে বললাম, "মিলি, আমাকে একটু একা থাকতে দেবে ? আমার শরীরটা ভাল নেই।" কথাটা বলেই মাথাটা ফের টেবলে রাখলাম।

মিলি খিলখিল করে হেসে উঠল। তার পর বলল, "ওকে, ওকে। বাই।"

কয়েক সেকেন্ড পর চোখ তুলে দেখি, মিলি নেই। যাক বাবা, বাঁচা গেল। চেয়ারে হেলান দিয়ে, পা দুটো টানটান করে দিলাম। নন্দিনীকে একবার ডাকলে হত। কিন্তু জিভটা এত শুকিয়ে গেছে, ডাকতে পারলাম না। এত লোক আমার সাইটে এখন কাজ করছে, অথচ অফিস ঘরে কেউ আসছে না কেন ? নন্দিনীটাই বা গেল কোথায় ? এই সময় তো ওর থাকার কথা অফিস ঘরে। মাথার যন্ত্রণাটা এখন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ একটা ট্যাক্সি ডেকে দিক। আমি না হয় বাড়ি ফিরে যাই। এখানে আর বসে থাকতে পারছি না।

অতি কষ্টে একবার চোখ খুলে তাকালাম। এ কী! বাণীদি! সেবা-র বাণীদি কখন এসে দাঁড়াল আমার সামনে? পরনে পিঙ্ক কালারের শাড়ি, ম্যাচিং ব্লাউজ। মুখে বেশ চড়া মেকাপ। দেখতে মন্দ লাগছে না। বাণীদি কি ছাড়া পেয়ে গেলেন সেবা থেকে? এখানে এলেনই বা কী করে? ঠিক বুঝতে পারলাম না। মুখে লজ্জার ভাব। আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

—আপনি এখানে?

—তোমার কাছে এলাম ঋচীক। তোমাকে নিয়ে যেতে এলাম।

—কোথায় বাণীদি?

—সেবায়। ডাক্তারবাবু পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি নিজে গিয়ে ওকে নিয়ে এসো। আজ থেকে তোমরা একই সঙ্গে থাকবে। হাজব্যান্ড-ওয়াইফের মতো।

আমার খুব কাছে এলেন বাণীদি। কোলের ওপর বসলেন। তারপর আঁচলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে পটাপট ছিঁড়ে ফেললেন ব্লাউজের ক'টা হুক। আমার চোখের সামনে পূর্ণ যুবতীর দুটো স্তন। দু'হাতে আমার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বাণীদি বলে উঠলেন, "আহ্।"

তার পর ঠোঁটে চুমু খেয়ে, ফিসফিস করে বললেন, "মুনটা তো পালিয়ে গেল। আমায় তুমি বিয়ে করবে বুবুনসোনা?"

॥ আঠারো ॥

মা এসে বলল, "বুবুন, বাড়িতে আজ গুরুদেব আসবেন। এ বার তুই সেরে উঠবি বাবা।"

চুপচাপ শুয়েছিলাম। বললাম, "কখন আসবে মা?"

—মুখার্জিবাবুরা ফোন করেছিলেন। ওদের বাড়িতে ভাগবত পাঠ হচ্ছে। শেষ হলেই ওরা নিয়ে আসবেন।

—গুরুদেব অনেক দিন পর আসছেন। তাই না মা?

—তিন বছর তো হবেই। ওঁকে আসতে দে। উনি আশীর্বাদ করলেই দেখবি, তুই ভাল হয়ে যাবি। তোর মনে নেই। তখন তুই খুব ছোট। একবার তোর টাইফয়েড হয়েছিল। সেবার উনি এসে তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। পরদিন থেকে তুই উঠে বসলি।

—যাঃ, তাই হয় নাকি মা?

—হয় রে। চন্দনাকে জিজ্ঞেস করিস। ও সেবার খুব সেবাযত্ন করেছিল তোর।

কথাটা এর আগেও দু'চারবার শুনেছি। সেবার নাকি বাঁচার আশা ছিল না। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছিল। মায়ের খুব ভক্তি গুরুদেবের উপর। অন্ধ বিশ্বাস। সে বার গুরুদেবকে খবর দিয়ে নিয়ে আসেন বাবা। এ বার নিশ্চয়ই মা খবর দিয়েছে। মায়ের বিশ্বাস ভাঙার তো কোনও দরকার নেই। তাই চুপ করে রইলাম।

মাসখানেক হল, আমি বিছানায়। ইচ্ছে মতো মনের রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সত্যি বলতে কী, আনন্দে আছি। এই ক'দিনে বেশ কয়েকটা সিদ্ধান্ত আমি নিয়ে ফেলেছি। ভবিষ্যতে কী করব, সে সম্পর্কে। নন্দিনী আজ একটা খবর আনবে। সেটা যদি

পজিটিভ খবর হয় নিশ্চিন্ত হয়ে যাব।

ইস্টার্ন বাইপাসের প্রোজেক্ট থেকে সে দিন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল নন্দিনীই। সেদিন বাড়িতে নাকি আমি আসতেই চাইছিলাম না। খুব বকবক করেছি। কী বলেছি, তা অবশ্য মনে নেই। জ্বর কমে যাওয়ার পর নন্দিনী হাসতে হাসতে আমাকে সব বলেছিল। তখন আমিও খুব হেসেছিলাম। সেদিন শরীরের যা অবস্থা হয়েছিল আমার, এখন ভাবলে শিউরে উঠি। কোনও দিন ভাবতে পারিনি, এ ভাবে আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।

এ ক'দিন বাড়িতে ডাক্তার আর ডাক্তার। বাড়ি ভর্তি লোক। সব থেকে অবাক আমি মেসোমশাইকে দেখে। দু'বেলা আসছেন আমাকে দেখতে। ডাক্তার মহলে ওনার খুব জানাশুনো। আমাকে ভাল করার জন্য মেসোমশাই যথাসম্ভব করছেন। মাসি দিন দশেক এ বাড়িতে। সেই সঙ্গে কমলামাসিও। জীবনে এই প্রথম দেখলাম, মাসি টানা এতদিন আমাদের বাড়িতে। মেসোমশাইও যে আমাকে এত ভালবাসেন, তা আগে কখনও বুঝিনি।

এর মধ্যে ডাক্তার ব্যানার্জিও এসে হাজির একদিন। কার মুখে যেন শুনেছেন, আমি অসুস্থ। সেই হাসি হাসি মুখ। তেতলার এই ঘরে ঢুকেই বললেন, "কী ঋচীকভাই, ছুতো করে রেস্ট নিচ্ছ বুঝি ? সত্যি কথাটা বলো না।"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসেছিলাম, "বলতে পারেন। সেবা-র সবাই কেমন আছেন ডাক্তার ব্যানার্জি ?"

—ভাল। তোমার জুরিখের সেই ভদ্রলোক, দু'তিন দিন আগে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। সেবা-র জন্য ওরা মাসে পাঠাবেন দশ হাজার সুইস ফ্রাঁ। টাকাটা আসবে জুন মাস থেকে। মানসবাবু তোমার কাছে একবার বোধহয় আসবেন।

—কেন ?

—একটা অনুষ্ঠান করে, তোমায় একটা খেতাব দেবেন। সেবাশ্রী। কথাটা শুনে হেসে ফেললাম। ডাক্তার ব্যানার্জি ঠাট্টার মেজাজে। জুরিখ থেকে দাদা আমাকে ফোন করেছিল। আগেই সব বলে দিয়েছে। ডাক্তার ব্যানার্জি জানেন না, কিংশুক বসু আমার নিজের দাদা। ফট করে সেদিন দাদার কথাটা মাথায় খেলে গেছিল। তাই একটা হিল্লে হল সেবা-র। টাকাটা ওরা এক বছরের জন্য দেবে। তার পর ওখান থেকে লোক আসবে। খুঁটিয়ে সব দেখে যাবে। পরে চিন্তা করবে, আর্থিক সাহায্য চালিয়ে যাবে কি না। বললাম, "মানসবাবু, আছেন কেমন ?"

—একদম পাল্টে গেছেন। দশ বছর যে লোকটাকে হাসতে দেখিনি, তিনি এখন ভানু ব্যানার্জি। এ ক'দিন অবশ্য বিয়ে নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। এখন একটু ফ্রি।

—কার বিয়ে ডাক্তার ব্যানার্জি ?

—বাণীর। তুমি শোনোনি ? ওর তো বিয়ে হল সুজিতের সঙ্গে। মেয়েটার তবু একটা গতি হল। মানসবাবুই উদ্যোগ নিয়ে বিয়ে দেওয়ালেন। তোমায় উনি নেমতন্ন করেননি ?

—না। করলে নিশ্চয়ই যেতাম।

—দেখেছ, লোকটা কেমন হাড়কেপ্পন। একশো লোককে ডেকে খাওয়ালেন, আর তোমায় বাদ ? আশ্চর্য ! বাণীর বিয়েতে মুনও তো এসেছিল। কানের দুল প্রেজেন্ট

করেছে। খুব সুন্দর।

—মুন কোন মেয়েটা, ডাক্তার ব্যানার্জি ?

—চিনতে পারছ না বোধহয়, না ? তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। আমার পেশেন্ট। ওই মেয়েটাও কিছু দিন ছিল সেবায়।

—দেখেছি হয়তো। মনে নেই। তবে আরতির কথা মনে পড়ে খুব।

—আরতি এখন সেই আরতি নেই। বেহালায় একটা ফ্যাক্টরি হয়েছে গারমেন্টসের। ঢুকিয়ে দিয়েছি। মাসে মাইনে পাচ্ছে হাজার টাকা। সে এখন কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ফ্যাক্টরিতে যায়। থাকে পাপিয়াদের বাড়ি। পাপিয়াকে নিশ্চয়ই তুমি ভোলোনি ঋচীকভাই।

—কী বলছেন, মনে থাকবে না ? সেবায় গেলেই রোজ চা করে, এনে দিত আমায়।

—একদিন এসো না সেবায়। একটা পিকিউলিয়ার কেস এসেছে আমার হাতে। সলভ করতে পারছি না। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে এক ভদ্রমহিলাকে পাঠিয়েছে। সম্ভবত কল্যাণীর ওদিককার। তার একটু খোঁজখবর করা দরকার। আমরা বলাবলি করছিলাম, ঋচীক থাকলে ঠিক খোঁজ নিয়ে আসত। এটা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব না।

—কেসটা কী ডাক্তার ব্যানার্জি ?

—লোকের সন্দেহ, ভদ্রমহিলা ডাইনি। বাচ্চা ছেলে দেখলেই ধরে নিয়ে যেতেন। একবার গাঁয়ের লোক প্রচণ্ড মারধর করে। হাইওয়েতে ফেলে দিয়ে যায়। গাড়ি চাপা পড়ে মারা যেতেন। পুলিশের চোখে পড়ে যান। পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। সেখান থেকে জেলে।

—ডাইনি বলে কিছু আছে নাকি ?

—কিচ্ছু নেই। এটা মাস হিস্টিরিয়া। যাক গে, তুমি চট করে সুস্থ হয়ে নাও। একদিন সেবায় এসে ভদ্রমহিলাকে দেখে যাও। তার পর ভাবা যাবে। চলি তা হলে ?

ডাক্তার ব্যানার্জি সেদিন চলে যাওয়ার পর দুটো শনিবার চলে গেছে। সেবায় যেতে পারিনি। উনিও আর আসেননি। মায়ের মুখে শুনেছি, দু'দিন নাকি ফোন করেছিলেন। আমার খবর নেওয়ার জন্য।

খবরের কাগজটা পড়ে রয়েছে পাশে। ইদানীং কাগজ পড়তেও আর ইচ্ছে করে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুলে নিলাম কাগজটা। প্রথম পাতায় বিরাট খবর, ভোট আসছে। মমতা ব্যানার্জি নতুন একটা দল তৈরি করেছেন। রাজনীতির অনেক খবর। এখন আর ভাল লাগে না। হেডিংয়ে চোখ বোলাতে বোলাতে হঠাৎই দু'য়ের পাতায় ছোট্ট একটা খবরে চোখ আটকে গেল। হেডিং "সেই শুভ্রবাহন এখন প্রেসিডেন্সি জেলে।" দক্ষিণ কলকাতার নামকরা নেত্রী নমিতা চ্যাটার্জিকে এই ছেলেটি বিয়ে করতে চেয়েছিল। পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। এখন পচছে নন ক্রিমিনাল লুনাটিক সেলে। তাঁকে ইন্টারভিউ করে একটা লেখা বেরিয়েছে।

বেচারা শুভ্রবাহন ! খুব খারাপ লাগল খবরটা পড়ে। ঘটনাটা যেদিন ঘটে, সেদিন হাজরায় আমি জ্যামজটে আটকে পড়েছিলাম। পর দিন কাগজে খুব হইচই ছেলেটাকে

নিয়ে। কোনও একটা কাগজে ছবিও বেরিয়েছিল। পুলিশ কলার ধরে তুলে দিচ্ছে ভ্যানে। অবাক লাগছে, শুভ্রবাহন কী করে গেল এন সি এল সেলে ? একজন মহিলাকে ও উত্ত্যক্ত করেছিল ঠিকই। কিন্তু সেই অপরাধের জন্য জামিন পেতে পারত। মামলা চলত। ফয়সালা হলে ওর জেলও হতে পারত। কিন্তু এন সি এল-দের সেলে কেন ? ওর কি মানসিক বিকৃতি ঘটেছিল ?

শুভ্রবাহনের কথা আর ভাবতে ইচ্ছে করল না। পাতা উল্টে খেলার পাতায় চলে গেলাম। কলকাতায় এয়ারলাইন্স কাপ ফুটবলে খেলতে আসছে এফ সি কোচিন। তাদের নতুন দলটা নিয়ে। এ বার দলবদলে দু'কোটি টাকা খরচ করেছে দলটা। কেমন খেলে, দেখার জন্য সবাই উদগ্রীব। পাশেই ছোট্ট একটা খবর। শুভকে নিয়ে। ওর ইস্টার স্টেট ট্রান্সফার বাতিল করা হয়েছে। ফর্ম ভর্তি করার সময় নাকি ভুল করেছিল। সেই সুযোগটা নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ওরা আপত্তি তোলায় শুভ এ বার এফ সি কোচিনে খেলতে পারবে না। ইস্টবেঙ্গল এখন মাত্র দেড় লাখ টাকা দেবে বলেছে ওকে। শুভর সঙ্গে কথা বলেছেন রিপোর্টার। ও বলেছে, পোর্ট ট্রাস্টের হয়েই খেলতে চায় এ বার। ইস্টবেঙ্গলে যাবে না।

কেন জানি না, খবরটা পড়ে খুব ভাল লাগল। শুভ আমাকে কথা দিয়ে কথা রাখেনি।

এই শাস্তিই ওর প্রাপ্য ছিল। কথাটা মনে হতেই বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। মনে একটু জোর আসছে। কোত্থেকে জানি না। শুভ আমাকে আঘাত দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, জীবনে ওর মুখ দেখব না। আমি জানি, ও ফের আমার কাছে আসবে। নিজে না এলেও, আগে পাঠাবে শায়নীকে। আমি দেখাই করব না। কথাটা মনে হতে, সারা শরীরে এক ধরনের আনন্দ অনুভব করলাম।

—কেমন আছিস বুবুন ?

তাকিয়ে দেখি মানুদা। দু'তিন দিন আগেও একবার আমাকে দেখতে এসেছিল। মানুদার পরনে হাফ হাতা শার্ট, ঢোলা পাজামা। ঘরে ঢুকে উল্টো দিকের চেয়ারে বসল। এই লোকটা নিঃস্বার্থ ভাবে অন্য লোকের জন্য করে। তাই ভাল লাগে।

বললাম, "ভাল। আজ অফিস যাওনি ?"

—গেছিলাম। সই করে পালিয়ে এসেছি। কলিগরা আমাকে খুব লাইক করে রে। আমার কাজ ওরাই করে দিচ্ছে। বলছে, তুই আগে তোর বউকে দ্যাখ। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসুক, তারপর তুই প্রেসার নিস।

—বউদি হাসপাতালে নাকি ?

—হ্যাঁ। সে এক কাণ্ড। তোদের এখানেই আলাপ হল ডাঃ অর্ণব ব্যানার্জির সঙ্গে তুই তখন জ্বরে বেহুঁশ। কথায় কথায় তোর বউদির প্রসঙ্গ উঠল। উনি বললেন, এক দিন আমার ওখানে নিয়ে আসুন। তা, নিয়ে গেলাম। ওই দিনই উনি ভর্তি করে নিলেন। হাসপাতালটা ঠাকুরপুকুরের ও দিকে, পোড়া অশ্বত্থতলা বলে একটা জায়গায়।

বললাম, "জানি, আমি অনেকদিন গেছি। বউদিকে কি তুমি পেয়িং বেডে রেখেছ ?

—ঠিক তা না। পেয়িং বেডে খরচা পার ডে একশো টাকা। ডাঃ ব্যানার্জি

একদিন জিজ্ঞেস করলেন, আপনার রোজগার কত মশাই ? বললাম। শুনে বললেন, আপনাকে একশো টাকা করে দিতে হবে না। আপনি পার ডে পঞ্চাশ করে দেবেন।

—মানুদা, তোমাকে কিছু দিতে হবে না। মানসবাবুকে বলে আমি ফ্রি করে দেব।

—তা হলে তো আমার খুব সুবিধে হয়। দশ দিন হল, তোর বউদি ওখানে রয়েছে। এখন একটু ভালর দিকে। রোজ একবার করে দেখতে যাই। লক্ষ করছি, শুচিবাই একটু কম। সেদিন রাস্তায় বেরিয়ে আমার সঙ্গে ফুচকা পর্যন্ত খেয়েছে। ভাবতে পারিস ? অথচ এখানে, বিয়ে হওয়া তক, এক বারও প্যারিস কেবিনে ওকে নিয়ে যেতে পারিনি।

প্যারিস কেবিন বিডন স্ট্রিটের মোড়ে একটা রেস্তোরাঁ। ওখানকার মোগলাই পরোটা বিখ্যাত। অনেকদিন খাওয়া হয় না। মানুদাকে বললে হয়। দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসবে। লোকটার মনে কোনও প্যাঁচ নেই। বললাম, "দেখো, বউদি ঠিক ভাল হয়ে যাবে। ওখানে কদ্দিন রাখবে বলেছে গো ?"

—এই ধর, আরও দিন পাঁচেক। যেদিন তোর বউদিকে ওখানে ভর্তি করি, সেদিন হাসপাতালে একটা বিয়ে হল। অদ্ভুত জায়গা রে। চার পাশে মেন্টাল পেশেন্ট.... মনেই হচ্ছিল না। হাসি হচ্ছে, গল্প হচ্ছে। আজকাল রোগগুলোও পাল্টে গেল নাকি রে ? পাগল বলতে আগে যা বুঝতাম, এখন দেখছি, তা না।

মানুদার কথা শুনে হাসতে লাগলাম। আমারও ঠিক একই কথা মনে হয়েছিল, প্রথম দিন সেবায় গিয়ে। কেউ চুল ছিঁড়ছে না, জিনিসপত্তর ভাঙছে না, চিৎকার করছে না। এ আবার কী রকম মেন্টাল হোম ? পরে সেবায় যাতায়াত করে বুঝেছি, মনের রোগের বহিঃপ্রকাশ সবার সমান না। তিতলির মতো পেশেন্ট যেমন আছে, তেমনই আছে তানিয়া চক্রবর্তীর মতো মহিলারা। এই সব রোগের শেকড় এত গভীরে, অনেক সময় বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তিতলির কথা মনে হতেই জিজ্ঞেস করলাম, "মানুদা, ও বাড়ির মেয়েটা এখন কেমন আছে গো ?"

—ওরা তো এখানে নেই। বহরমপুর চলে গেছে। তুই জানিস না ? জানবিই বা কী করে ? তখন তোর তো ধুম জ্বর। কাকাবাবু তিতলিকে নিয়ে চলে গেলেন। শুনছি, এখন থেকে নাকি ওখানেই থাকবেন।

—হঠাৎ এই ডিসিশন নিলেন কেন ?

—ডাক্তারের কথায়। নার্সিংহোম থেকে মেয়েটাকে আর ওরা এখানে আনেনি। ডাক্তার নাকি অ্যাডভাইস করেছে, চেঞ্জ দরকার। তাই ওরা বহরমপুর নিয়ে গেলেন। আমিও ওদের সঙ্গে গেছিলাম। লালগোলা প্যাসেঞ্জারে ডিউটি নিয়ে। মেয়েটা গুম মেরে গেছে। একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ডাক্তার নাকি সাবধান করে দিয়েছে, ফের সুইসাইডের অ্যাটেম্পট করতে পারে। ওকে চোখে চোখে রাখতে। তিতলির কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওর কথা একদিন বলেছিলাম ডাক্তার ব্যানার্জিকে। সব শুনে উনি বলেছিলেন, "মেয়েটা মেন্টাল পেশেন্ট। এক ধরনের পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। উইথ মাইক্রো সাইকোটিক এপিসোডস। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখুনি ওর ট্রিটমেন্ট শুরু করা দরকার।" ডাক্তার ব্যানার্জির কাছে তিতলিকে আমি তখন নিয়ে যেতে পারিনি। জোর করে নিয়ে গেলে হয়তো ওর এই পরিণতি হত না।

মানুদা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞেস করলাম, "ওরা পাকাপাকি বহরমপুরে চলে গেলে, এই বাড়ির কী হবে মানুদা ?"

—শুনলাম, বিক্রি করে দেবে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ রে। কে এক মারোয়াড়ি.... দর দিয়েছে ষাট লাখ টাকা। কাকাবাবুকে আমি অনেক করে বোঝালাম। আদি বাঙালি পাড়া। এখানে অবাঙালি ঢোকাবেন না। কাকাবাবু পাত্তাই দিলেন না।

মানুদার কথা শুনে চুপ করে গেলাম। মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে গেল, "আনফর্চুনেট।"

—হ্যাঁ রে, কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সব। কাকাবাবু কার বুদ্ধিতে সেদিন মহিলা সমিতিকে....ওরা তোর নামে স্ক্যান্ডাল ছড়িয়ে দিত। থানার ও সি-টা দেখলাম, মস্তান। এসে এমন হুমকি দিল, সব চো চা দৌড়। সব দর্জিপাড়া বস্তির মেয়ে। কেউ বোধহয় ধরে এনেছিল ?

—কে হতে পারে মানুদা ?

—বুঝতে পারছি না। তোর ওপর পাড়ার কারও তো রাগ নেই। তিতলির ঘটনাটা যে শুনেছে, সেই বলেছে, ভাল একটা ছেলেকে ইচ্ছে করে ঝামেলায় ফেলছে। আমি ক্লাবে গিয়েও চয়নদের বললাম, এগুলো কী হচ্ছে। চড়কের আগে এ সব স্ক্যান্ডাল পাড়ায় হলে, খুব রিপারকেশন হবে।

—চড়কের মেলা কবে মানুদা ?

—এই তো এসে গেল। এ বার আরও বড় করে হবে। মেলার কর্তারা তোর খোঁজ করছিল। তোকে এ বার বড় একটা দায়িত্ব নিতে হবে। আমার ঘাড়েও অনেক কাজ। ভাবছি, চড়কের আগে যেন ভালয় ভালয় তোর বউদিকে বাড়ি আনতে পারি।

টুকটাক কথা বলে মানুদা যাওয়ার জন্য উঠল। তার পর বলল, "সেদিন তোর জন্য কামদেবপুর বলে একটা জায়গায় গেছিলাম। ওখানে পীরের থানে ভর হয়। তোর কথা জিজ্ঞেস করে এলাম। পীরবাবা বলল, তুই ভাল হয়ে যাবি।"

—ভর ব্যাপারটা কী গো ?

—অদ্ভুত। শুনে তোর বিশ্বাস হবে না। মসজিদের ভেতর ঢুকলাম। অন্ধকার, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ একটা গলা শুনতে পেলাম, "যার জন্য এসেছিস, সে ভাল হয়ে যাবে।" মনে হল, গলাটা আসছে মাটির তলা থেকে। গায়ের লোম খাঁড়া হয়ে গেল, বুঝলি। কী জন্য ওখানে গেছি, কাউকে তো বলিনি।" তা হলে পীরবাবা কী করে জানল, আমি কারও অসুখের জন্য, জানতে গেছি ?"

মানুদা বেশ উত্তেজিত। শুনে আমারও কৌতূহল বাড়ছে। বললাম, "আর কী বলল ?"

—তার পর বলল, একটা মেয়ের জন্য ওর এই অসুখ। সেই মেয়েটাকে নিয়ে আয়। দেখবি, উঠে বসেছে। ছেলেটা তো খুব ভাল ছেলে রে।

এই কথাটা শুনেই আমি হেসে ফেললাম। বোগাস ব্যাপার। একটা মেয়ের জন্য আমার এই অসুখ ! কোন মেয়ে ? মানুদাটাও তেমন ভাল মানুষ। যা শোনে, বিশ্বাস

করে। ভাবলাম বলি, ভর-টরে আমার কোনও বিশ্বাস নেই। কিন্তু বললাম না। কী দরকার, লোকটা কষ্ট পাবে। বাগবাজারেও একটা শেতলা মন্দিরে ভর হয় শুনেছি। সপ্তাহে এক দিন। মা শেতলা নাকি ভর করেন এক মহিলার ওপর। তিনি তাবিজ-কবচ দেন। দেবদেবীর ভর সব বাজে কথা। আসলে এ সব তাবিজ-কবচে যদি কোনও কাজ-হয়, তা বিশ্বাস থেকে। ডাক্তার ব্যানার্জি একবার বলেছিলেন, "বিশ্বাসে সারায় রোগ, ওষুধে বহুদূর।"

মানুদা নীচে নেমে যাওয়ার কিছু পরেই উঠে এল নন্দিনী। আমাকে দেখে বলল, "আজ আপনাকে অনেক ফ্রেশ লাগছে বুবুনদা। একটা সুখবর আছে। আগে সেটা দিই।"

—কী রে ?

—জয় কন্সট্রাকশনের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। বাইপাসের টোটাল প্রোজেক্টটা ওরা নিয়ে নিতে রাজি।

—ওয়ান্ডারফুল। জমির প্রবলেমটা ওদের বলেছিস ?

—হ্যাঁ, ওরা বলল, ওটা কোনও প্রবলেমই না। ওরা প্রিলিমিনারি কাগজপত্তর তৈরি করছে উকিল দিয়ে। নেক্সট উইকে আসবে আপনার কাছে।

—প্রজেক্টটা মাঝপথেই কেন ছেড়ে দিচ্ছি, জিজ্ঞেস করল না ?

—হ্যাঁ, জানতে চাইল। সত্যি কথাই বলেছি। নেগোশিয়েশন যা হল, হ্যান্ড ওভার করেও, আপনার লস হবে না। ওদের কোম্পানিটা বড়। দেখলাম, লোকবল বেশি। তিন ভাই চালায়। বেশ পাওয়ারফুল। আপনার খোঁজ খবর রাখে। বলল, ঋচীকবাবুকে বলবেন, ওর মান রাখার দায়িত্ব আমরা নিলাম। যারা বুকিং করেছে, তারা পরে একটা কথা বলারও সুযোগ পাবে না।

—গুড, মাথা থেকে বড় একটা চিন্তা নেমে গেল।

—বুবুনদা, এখন আপনি কী করবেন ? ভেবেছেন কিছু ?

—এক্সপোর্টের বিজনেস। দাদার সঙ্গে কথা হয়েছিল। তখন রাজি হইনি। এখন ভাবছি, শুরু করব।

—কন্সট্রাকশন কোম্পানিটা তা হলে রাখবেন না ?

—আপাতত, না। পরে সুটেবল কোনও পার্টনার পেলে আবার শুরু করব। তুই কি আমার কোম্পানিতে থাকবি ?

—যদি রাখেন, নিশ্চয়ই থাকব। আর তো মাত্র ছ'টা মাস। ভাইটা পাশ করে বেরোলেই আমি নিশ্চিন্ত।

নন্দিনী এসে আমার মাথা থেকে আজ একটা বড় চিন্তা দূর করে দিল। ভাল হয়েই কয়েকটা দিন আমাকে অ্যাডভোকেটদের কাছে দৌড়োদৌড়ি করতে হবে। সুমিতাভর যা পাওনাগণ্ডা, মিটিয়ে দিতে হবে। ও অবশ্য এখনও জানে না, পুরো প্রোজেক্টটা আমি দিয়ে দিচ্ছি জয় কন্সট্রাকশনকে। জানলে, ফের পিছনে লাগবে। ভেবেছিল, ও বেরিয়ে গেলে আমি গভীর জলে পড়ব। কিন্তু আমিও দেখিয়ে দিতে চাই, ওকে ছাড়াই চলতে পারি।

নন্দিনী আমায় অনেক খবর দিয়ে গেল। একটু টায়ার্ড লাগছে। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। উফ্, মাটিতে এবার একটু পা রাখা গেল। এ ক'দিন যেন থই

পাচ্ছিলাম না। জয় কন্সট্রাকশনের কথাটা আমার মাথায় প্রথম ঢোকায় নন্দিনীই। সত্যি, মেয়েটার তুলনা নেই। এখন মনে হচ্ছে পাশে এসে না দাঁড়ালে, আমি বোধ হয় উঠে দাঁড়াতে পারতাম না।

শুয়ে শুয়ে বুটুর কথা মনে পড়ল। মাঝে একদিন বরের সঙ্গে ও আমাকে দেখতে এসেছিল। মনে হল, মায়ের কাছে সব শুনেছে। কথায় কথায় বলল, "তুই কিছু ভাবিস না ছোড়দা। একজন পাশ থেকে সরে গেলেও, জানবি অন্য একজন পাশে এসে দাঁড়াবে।" আমার চেয়েও দু'বছরের ছোট বুটু। জীবন সম্পর্কে এত অভিজ্ঞতা ওর হল কী করে ? মেয়েটা আর ক'দিন পরই আমেরিকা চলে যাবে। ওর বরের ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। ওকে খুব মিস করব, চলে গেলে।

চোখ বুজে বুটুর বরের কথা ভাবছি। ছেলেটা সেদিন অনেকক্ষণ গল্প করে গেল আমার সঙ্গে। চমৎকার কথা বলে। আমেরিকানদের নিয়ে মজার মজার গল্প বলছিল। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছিল। ছেলেটা এত রসিক, দেখে কিন্তু বোঝা যায় না। এ ছেলে বুটুকে মাথায় করে রাখবে। আমি নিশ্চিত। মেসোমশাই ওকে পাগল বলেছে। একেবারেই তা নয়। বিদেশে থাকে। এদের চালচলনই অন্য ধরনের। স্ট্রেট কাট ছেলে। রেখে ঢেকে কথা বলতে জানে না। পরে ফাঁকা পেয়ে বুটু আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, "এতক্ষণ ধরে কী এত গল্প করলি রে আমার বরের সঙ্গে। ও তো এত কথা বলার মানুষ না।" বুটুর চোখ-মুখ ঠিকরে বেরোচ্ছিল খুশির আভা। দেখে খুব ভাল লেগেছিল। বুটুর কথা ভাবছি, এমন সময় ঘরে হালকা পায়ের শব্দ। তাকিয়ে দেখি, মা। বোধহয় কিছু নিতে এসেছে। ঘুম পাচ্ছে দেখে পাশ ফিরে শুলাম। হঠাৎই মা বলল, "বুবুন, চোখ খুলে দ্যাখ, কে এসেছে।"

পাশ ফিরে বললাম, "কে মা ?"

—মুন।

চোখ খুলেই দেখি, দরজার সামনে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। পরনে নীল কাঞ্জিভরম শাড়ি। ম্যাচিং ব্লাউজ। খুব সুন্দর দেখতে। গায়ের রঙটা কাঁচা হলুদের মতো। চুলের ঢল নেমে এসেছে কোমরে। পলক পড়ার আগেই চোখে পড়ল গলায় একটা নেকলেস। মেয়েটাকে আমি চিনতে পারলাম না। তবে মনে হল, নেকলেসটা কোথায় যেন দেখেছি। ঠিক, এটাই তো সেই নেকলেস, যা তিতলি চুরি করেছিল। নেকলেসটা কে দিল মেয়েটাকে ? ঠিক বুঝতে পারলাম না, জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি।

চোখের পাতাটা খুব ভারী লাগছে। চোখ বন্ধ করতেই মা সামনে এসে বলল, "বুবুন, চোখ খোল বাবা। দ্যাখ, মুন এসেছে।"

—কথা বলার ইচ্ছে নেই। তবু বললাম, "মুন কে মা ?"

—তুই জানিস না ? মায়ের গলায় ভয় আর উদ্বেগ।

বললাম, "না তো। আমাকে একটু ঘুমোতে দেবে মা। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।"

মা বলল, "এই একটু আগেই তো কথা বলছিলি বাবা। তোর হঠাৎ কী হল ?

—কিছু না মা।

চোখ বোজা অবস্থাতেই টের পেলাম, মেয়েটা বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার হাত ধরে বলল, "ঋচীক, আমি মুন। চেয়ে দেখো, আমি তোমার মুন।"

শুনেও আমি কোনও উত্তর দিলাম না। এই নামটা কোথাও শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। অথচ মেয়েটা বলছে, আমি তোমার মুন ? তাও আমার মায়ের সামনে ! কথাটার মানে ? আচ্ছা নির্লজ্জ মেয়ে তো। জীবনে কোনও মেয়ের সঙ্গে আমি এমন কোনও ঘনিষ্ঠতা করিনি, যাতে কেউ বলতে পারে আমি তোমার মুন। একটু রাগ হচ্ছে। বিরক্তিও। রাগ হতেই মাথার ভেতর একটা পিন ফোটার যন্ত্রণা অনুভব করলাম।

যন্ত্রণাটা যাতে আর না বাড়ে সে জন্য আমি চোখ খুলে ফেললাম। মেয়েটা আমার বিছানার উপর ঝুঁকে পড়েছে। ওর সুন্দর মুখটা থমথম করছে। আমার চোখে চোখ রেখে মেয়েটা বলল, "আমাকে ভাল করে দেখো ঋচীক। আমি সেই মুন। আমি এখন ভাল হয়ে গেছি। তুমি আমাকে ভাল করে তুলেছ ঋচীক। মনে নেই ?"

কী পাগলের মতো বলছে মেয়েটা ? আমি ওকে সারিয়ে তুলেছি। মেয়েটার দিকে ভাল করে তাকালাম। নাহ্, কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। মেয়েটার চোখে টলটল করছে জল। পাতলা ঠোঁট তিরতির করে কাঁপছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, মিথ্যে কথা বলছে না। অথচ আমি কেন ওকে চিনতে পারছি না ? টপ করে জলের একটা বিন্দু এসে পড়ল আমার গালে। আর তখনই রুক্ষ স্বরে বললাম, "কে তুমি ? কেন আমাকে বিরক্ত করছ ?"

গলার স্বর শুনে সভয়ে সরে গেল মেয়েটা । মা তাড়াতাড়ি ওর পাশে এসে দাঁড়াল। মায়ের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, "ও আমাকে চিনতে পারছে না মা।"

মা বলল, "কিছু ভাবিস না মা। সব ঠিক হয়ে যাবে।" আমার ফের ঘুম পাচ্ছে। চোখ বুজে পাশ ফিরে শুলাম। শরীরটা হঠাৎ হালকা হয়ে যাচ্ছে। ছেঁড়া পালকের মতো ভাসতে লাগলাম। মৃদু বাতাস বইছে। তার স্পর্শে শরীরের ভয়, উদ্বেগ, ক্লান্তি—সব যেন উধাও হয়ে গেল। ভাসতে ভাসতেই যেন কোথাও গিয়ে নামলাম।

এটা কি পাহাড়ের গুহা, না বিশাল কোনও প্রাসাদের ভগ্ন ও পরিত্যক্ত অংশ ? বুঝতে পারলাম না। দূরে কোথাও ওঁম শব্দটা কেউ উচ্চারণ করছে এক সেকেন্ড অন্তর। কান দিতেই বুঝলাম, শব্দটা তানপুরার। শব্দটা লক্ষ করে এগিয়ে যেতেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। পাথরের একটা বেদীর ওপর বসে রয়েছেন আমাদের গুরুদেব। তাঁর ডান দিকে সার সার বসে অনেকে। কেউ কোনও কথা বলছেন না। চোখটা ধাতস্থ হতেই কয়েকজনকে চিনতে পারলাম। প্রথম সারিতেই মা, কমলামাসি আর সেবা-র মেয়েরা। পরের সারিতে সুমিতাভ, রমলা, নন্দিনীরা। এ কী ! এরা এখানে এল কী করে ?

গুরুদেব আমাকে দেখে মৃদু হাসলেন। তার পর জিজ্ঞেস করলেন, "ঋচীক, তুই আছিস কেমন ?"

—ভাল না, বাবা।

—কী হল তোর ? তুই তো বেশ ভাল ছিলি রে।

—মন ভাল নেই বাবা। মনটাকে আমি বশ করতে পারছি না।

—মন কাকে বলে তুই জানিস ?

—না।

—শোন তা হলে। আমাদের এই স্থূল শরীরটার ভেতর আরও একটা সূক্ষ্ম শরীর আছে। তার নামই মন। এই স্থূল শরীরটা হল মনের ওপরকার আবরণ। মন হচ্ছে শরীরেরই সূক্ষ্ম অংশ। তাই একের ওপর অন্যের এত প্রভাব। শরীর অসুস্থ হলে মন দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার উল্টোটাও হয়। মন খারাপ থাকলে বা উত্তেজিত হলে শরীরও নিস্তেজ হয়ে যায়। তোর কী হয়েছে, বল তো ?

—কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা।

—চেষ্টা কর। নিজেকে নিজে দ্যাখ। মন দিয়েই মনটাকে বিচার কর। দ্যাখ তো মনের মধ্যে কী ঘটছে।

—কী করে দেখব বাবা ?

—শোন তা হলে তোকে বুঝিয়ে বলি। মানুষ হল আত্মা। আর মন হল তার হাতের একটা যন্ত্র। এই যন্ত্রটা দিয়েই আত্মা জগতের সব কিছু সম্পর্কে অনুভব করেন। তাতে অংশ নেন। এই মন খুব চঞ্চল। কিন্তু এর অকল্পনীয় শক্তি। আজ পর্যন্ত মানুষ যা করেছে, তা এই মনের শক্তিতেই। প্রত্যেকটা মন বিশ্বমনের একেকটা অংশ। প্রত্যেক মন, অন্য মনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই সে যেখানেই থাকুক না কেন, বিশ্বের যে কোথাও মনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম। মনের মতো দ্রুতগামী আর কিছু নেই রে। সেজন্যই এই মনটাকে বশ করা খুব কঠিন। তবে অসম্ভব নয়। মনটাকে একবার জানতে পারলেই, বশ করা সম্ভব। তবে তার আগে নিজের উপর বিশ্বাস আনতে হবে। মনের কাছাকাছি যেতে হবে।

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। গুরুদেব তো সেই একই কথা বলছেন, যা সেবায় বলতেন ডাক্তার ব্যানার্জি! হিন্দু মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে এত মিল ফ্রাঙ্কেলের লোগো-থেরাপির ! জিজ্ঞেস করলাম, "সেটা কী করে সম্ভব বাবা ?"

—সম্ভব। সবই সম্ভব। তার আগে মন কী, তোকে তো জানতে হবে। মনের তিনটে উপাদান, তিনটে স্তর, চার রকম ক্রিয়া আর পাঁচ রকম অবস্থা। এ সব তোকে বুঝতে হবে। মন হল তিনটে আলাদা শক্তি বা গুণের মিশ্রণ। সেগুলো হল— সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ। সত্ত্ব হল ভারসাম্য বা স্থৈর্যের তত্ত্ব, যা মনকে পবিত্র করে, জ্ঞান দেয় আর আনন্দে ভরিয়ে তোলে। রজঃ হল গতির তত্ত্ব। যা থেকে এত কর্মতৎপরতা, কাম আর অস্থিরতা। তমঃ হল জড়তার তত্ত্ব। যা থেকে নিষ্ক্রিয়তা, অবসাদ আর ভ্রান্তি। তমোগুণ মানুষকে নিচু স্তরে নামিয়ে আনে। রজোগুণ মানুষকে নানা কাজে ব্যস্ত রাখে, চঞ্চল করে তোলে। আর সত্ত্বগুণ মহৎ উদ্দেশ্যর দিকে মনকে ঠেলে নিয়ে যায়।

—মনের তিনটে স্তর কী বাবা ?

—চেতন, অবচেতন আর অতিচেতন। এই তিনটে স্তরের মধ্যেই মন যাবতীয় কাজ করে। মনটা ওঠা নামা করে। চেতন স্তরে মন অহংবোধের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই স্তরেই মনটাকে বশ করার প্রশ্ন আসে রে। যারা এটা পারে, তারাই অতিচেতন স্তরে পৌঁছতে পারে। কী বুঝতে পারছিস কিছু ?"

প্রশ্নটা করেই গুরুদেব স্মিত হাসলেন। পাথরের বেদীর পিছনে হালকা নীল আভা। আগে লক্ষ করিনি। আশপাশের দৃশ্যগুলো কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। মা,

মাসি আর সেবা-র মেয়েরা এখন অনেকটা দূরে। সেই সার সার বসে। ওদের দিকে মন দেওয়ার সময় নেই। আগে আমায় জানতে হবে। শিখতে হবে। তাই বললাম, "আমার মনে অনেক চিন্তা বাবা। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ঠিক গুছিয়ে আনতে পারছি না।"

—পারবি। পারবি রে। আগে অবচেতন মনটাকে গুছিয়ে নে। তা হলেই পারবি। অবচেতন মনটা কী জানিস ? চিলেকুঠরি। অব্যবহৃত জিনিসপত্তর যেখানে আমরা ফেলে রাখি। তুই আগে কুঠুরিটা পরিষ্কার কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কী করে করব বাবা ?

—শোন, বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর, একটা কালির দোয়াত তুই পরিষ্কার করবি। কেমন করে করবি ? প্রথমে পরিষ্কার জল ঢেলে দিবি। তাই তো ? খানিকটা কালো জল বেরিয়ে যাবে তা হলে। তার পর আবার জল ঢালবি। আরও খানিকটা কালো জল বেরিয়ে আসবে। এই ভাবে জল ঢালতেই থাকবি, যতক্ষণ না কালির কোনও চিহ্ন থাকে। অবচেতন মনটাকেও এই ভাবে পরিষ্কার করতে হবে। সৎ চিন্তা ঢেলে দিয়ে। তখনই অসৎ চিন্তাগুলো সব বেরিয়ে যাবে। সঠিক কল্পনার মাধ্যমেই সৎ চিন্তা করা সম্ভব রে। মন থেকে অহং ভাব দূর করে দে।

গুরুদেবের কথাগুলো শুনে চুপ করে রইলাম। সেই ওঁম শব্দটা হয়েই যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, পাতাল থেকে এখুনি অতীন্দ্রিয় কোনও শক্তির বন্দনা শুরু হবে। পাশ ফিরে তাকালাম। মা, মাসি আর সেবা-র মেয়েরা আরও দূরে সরে গেছে। সবাই নিমীলিত চোখে, কারও অপেক্ষায় বসে। গুরুদেবের মুখে স্মিত হাসি। বেদীর পিছনে লালচে আভা। বোধহয় ওপরের পৃথিবীতে ফের সূর্যোদয় হচ্ছে। মনের ভেতরটা হঠাৎই শান্ত হয়ে গেল ওই পরিবেশে। জিজ্ঞেস করলাম, "সঠিক কল্পনা বলতে কী বোঝায় বাবা ?"

—শোন, তা হলে তোকে একটা গল্প বলি। এক মাতাল একদিন একটা বাক্স হাতে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। একজন জিজ্ঞেস করল, 'এই বাক্সে কী আছে যে এত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছ ?' মাতালটা বলল, 'এতে একটা বেজি আছে।' বেজি কেন ? মাতাল তখন বলল, 'মদ খেলেই আমি চারপাশে সাপ দেখতে পাই। তখন আমার খুব ভয় করে। তাই সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি বেজি নিয়ে যাচ্ছি।' হা কপাল, ওগুলো তো কাল্পনিক সাপ ! শুনে মাতাল বলল, 'সেজন্যই তো কল্পনায় একটা বেজি পুষেছি।' এই গল্পটা কেন বললাম, বল তো ? এই কারণে যে, একটা ভুল কল্পনাকে ভাঙতে আর একটা সঠিক কল্পনার দরকার। কল্পনা আমাদের পরম বন্ধুর কাজ করে। যদি তা ঠিকভাবে নিয়োজিত হয়। কী রে, বুঝতে পারলি ?

—হ্যাঁ বাবা।

—আজ আয় তা হলে। তোর সঙ্গে শিগ্গির ফের দেখা হবে। বলেই বেদি থেকে নামলেন গুরুদেব। তার পর পিছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে গেলেন লাল বর্ণচ্ছটার মধ্যে।

॥ উনিশ ॥

ঘুম ভাঙতেই মনটা অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে গেল। আজই প্রথম গুরুদেবকে স্বপ্নে দেখলাম। উনি বললেন, 'ফের তোর সঙ্গে শিগ্গির দেখা হবে।' মা আজই বলে গেল, গুরুদেব আসছেন। কী অদ্ভুত যোগাযোগ, তাই না ? আমাদের এই গুরুদেব থাকেন প্রয়াগে। দু'তিন বছর পরপর কলকাতায় এসে একেকবার একেক জনের বাড়িতে ওঠেন। নিশ্চয়ই আজ এসে থাকবেন আমাদের বাড়িতে। না হলে স্বপ্নে দেখা দিতেন না।

বিছানা ছেড়ে নেমে বাথরুমে ঢুকলাম। মুখ চোখে জল দিতেই মনে হল, গুরুদেবের কথাটা মাকে বলে আসা দরকার। নীচে এই সময় মা টি ভি-তে সিরিয়াল দেখে। আজ অবশ্য নীচে টিভি চলার আওয়াজ পাচ্ছি না। মা নিশ্চয়ই অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত রয়েছে। তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে নীচে নামতে গিয়ে দেখি, বাবলু। হাতে প্লিং, কপালে ব্যান্ডেজ। কোথাও কি অ্যাক্সিডেন্ট করে এল ? মাস খানেক ওর কোনও পাত্তা নেই। যাত্রা দলের সঙ্গে কোথায় যেন পালা করতে গেছিল। আমিও না করিনি। ও যদি যাত্রা পার্টির অকছয়কুমার হয়, আমার আপত্তির কী আছে ? জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে রে তোর ?"

—পিটুনি খেয়েছি। পাবলিকের।

—কেন ?

—জগদ্দলে পালা ছিল। হিরোইন যায়নি। পেমেন্ট নিয়ে ঝামেলা। ব্যস, পাবলিক এমন খচে গেল, আমাদের পেটাল।

—যাত্রার শখ তোর মিটেছে ?

—হ্যাঁ দাদাবাবু। আর না। তুমি আমায় কাজে রাখো। মা খুব জ্বালাচ্ছে। হাত ঠিক হয়ে গেলে..."

—ডাক্তার দেখিয়েছিস ?

—হ্যাঁ দিন সাতেক সময় নেবে।

—ফ্রাকচার হয়েছে ?

—জানি না। শুধু বলল, ওষুধ খা। ঠিক হয়ে যাবে।

—তবু এক কাজ কর। কাল সকালে বুটুদের বাড়ি যা। মেসোমশাইকে দেখাবি। ওর সঙ্গে অনেক ডাক্তারের চেনাশুনো। ভাল করে দেখে দেবে।

টেবলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। ছাদের দরজার ঠিক উল্টো দিকে। হঠাৎ ও গম্ভীর হয়ে গেল। দরজার দিকে চোখ যেতেই দেখি, রুমকি। ফিকফিক করে হাসছে। আসলে বাবলুর এই অবস্থা দেখে ও মজা পেয়ে গেছে। আমার দিকে চোখ পড়তেই থতমত খেয়ে ও বলল, "দাদাবাবু, মা জিজ্ঞেস করল, তুমি কি এখন কিছু খাবে ?"

—মা কী করছে রে ?

—মাসিদের সঙ্গে গল্প করছে।

—তুই হাসছিলি কেন রুমকি ?

—কই, আমি তো হাসিনি।

—যা, পালা। মাকে বল, আমি নীচে নামছি।

—তুমি কিছু খাবে না ? সেই দুকুর বেলায় একটুখানি খেয়েছ যে।

—আমি এখন মোগলাই পরোটা খাব। কষা মাংস দিয়ে। বাবলুকে দিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি। প্যারিস কেবিন থেকে।

—বাবলুদা পারবে ? বলেই ফিক করে হেসে রুমকি ফের বলল, "যাই, আমি বরং নিয়ে আসি।"

বাবলু কড়া চোখে তাকিয়ে আছে। হয়তো পরে শোধ নেবে। আমারও খুব হাসি পাচ্ছে। কিন্তু হাসা ঠিক হবে না। এরা লাই পেয়ে যাবে। আমি জানি, বাবলু ফিরে আসায় সব থেকে খুশি এখন রুমকি। ওর চোখ-মুখই তা বলে দিচ্ছে। বাবলু অকছয়কুমার হওয়ার চেষ্টা আর কোনও দিন করবে না। আমি তাও জানি। কড়া গলায় বললাম, "না। তোর যাওয়ার দরকার নেই। বাবলুই এনে দেবে।"

রুমকি শুকনো মুখে নেমে গেল। ড্রয়ার থেকে টাকা বের করে বাবলুকে বললাম, "মাকে একবার জিজ্ঞেস করে যা। নীচে যদি অন্য কেউ খায়, নিয়ে আসিস।"

ঘর থেকে বাবলু বেরিয়ে যাওয়ার পর, মনে হল, নীচে গিয়ে লাভ নেই। বরং মাকেই তুলে আনা যাক। আমি জানি, আঙুরবালার কোনও ক্যাসেট চালালেই মা আর কমলামাসি উঠে আসবে। কমলামাসি অন্ধ ভক্ত আঙুরবালার। গুলু ওস্তাগর লেনে কমলামাসিদের বাড়ির ছাদ থেকে আঙুরবালার বাড়ি দেখা যায়। ভদ্রমহিলা যেদিন মারা যান, কমলামাসি সেদিন খুব কান্নাকাটি করেছিল।

ড্রয়ার খুলে আঙুরবালার ক্যাসেট খুঁজতে লাগলাম। শ'খানেক ক্যাসেট। চট করে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আঙুরবালার ক্যাসেট খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখি, একটা হিন্দি ক্যাসেট। আমি হিন্দি গান পছন্দ করি না। ক্যাসেটটা এল কোত্থেকে ? ওপরে লেখা 'বাজিগর।' এই নামে একটা সিনেমা হয়ে গেছে শাহরুখ খানের। আমি দেখিনি। তবে টি ভি-তে এই সিনেমার গান অনেকবার শুনেছি। মরিশাসের সমুদ্রতীরে হাত-পা ছুড়ে গান গাইছে শাহরুখ খান। দেখে তখন হাসি পেত।

কৌতূহলী হয়ে ক্যাসেটের ঢাকনা খুলতেই দেখি, ভেতরে এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা, "উইথ লাভ, মুন।"

মুন ! নামটা মনে হতেই সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগল। লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই ক্যাসেটটা তো আমাকে দিয়েছিল মুনই। সেবায় বসে একদিন কথা হচ্ছি গান নিয়ে। আমি বলেছিলাম, হিন্দি গান মানেই জগঝম্প। মুন প্রতিবাদ করেছিল। আশা ভোঁসলে, লতা মঙ্গেশকর, মহম্মদ রফিদের উদাহরণ দিয়েছিল। ওকে উসকে দিয়েছিলেন ডাক্তার ব্যানার্জি। আমার পক্ষ নিয়ে। হিন্দি গান নিয়ে এমন সব ঠাট্টা করেছিলেন, মুন খুব চটে গেছিল। ডাক্তার ব্যানার্জি এও বলেছিলেন, "যারা হিন্দি গান শোনে, তাদের মাথায় ছিট আছে।"

এর কয়েকদিন পর, মুনকে নিয়ে একটু বেরিয়েছিলাম। বেহালা বাজারে হঠাৎ ও গাড়ি থামাতে বলেছিল। ক্যাসেটের দোকানে ঢুকে সেদিন ও এই ক্যাসেটটা কিনে আমাকে প্রেজেন্ট করে। উইথ লাভ, মুন...কখন লিখেছিল জানি না। ক্যাসেটটা কোনওদিন আমি বাজিয়ে শুনিনি। ড্রয়ারে ফেলে রেখে দিয়েছিলাম। আজই প্রথম চোখে পড়ল। আঙুরবালার ক্যাসেট খুঁজতে না বসলে, এটা কোনওদিন চোখেও

পড়ত না।

কী অদ্ভুত যোগাযোগ! আজ দুপুরেই মা মুনকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। আমি তখন চিনতেই পারিনি। এটা কেন হল? মুন তখন বললও, "ঋচীক, চেয়ে দ্যাখো, আমি তোমার মুন। আমি ভাল হয়ে গেছি।" তবুও ওর কথা আমার তখন মনে পড়ল না! অবাক লাগছে। প্রচণ্ড অবাক লাগছে। মুন আমাদের বাড়িতে এলই বা কী করে? কে ওকে নিয়ে এল? আমি অনেকবার ওকে এ বাড়িতে আনতে চেয়েছি। ও আসতে চায়নি। একবার তো ওকে নিয়ে বিডন স্ট্রিটেও এসেছিলাম। কিছুতেই ও গাড়ি থেকে নামতে চায়নি।

সেই মেয়ে এখন আমাদের বাড়িতে! নীচে নামলেই ওকে এখন প্রাণভরে দেখে নিতে পারি। স্মৃতির মিছিল এখন আমার মাথায়। একদিন ও বায়না ধরেছিল, "ঋচীক, আমাকে একবার পাতাল রেল চড়াবে?" কথাটা ডাক্তার ব্যানার্জিকে জানাতেই, উনি বললেন, "নিয়ে যাও। তবে বিকেল-বিকেল ফিরে এসো।" মনে আছে, ডায়মন্ডহারবার রোড থেকে আমরা একটা অটো রিকশায় উঠে রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনের কাছে নেমেছিলাম। রাস্তায় হাজারো প্রশ্ন। এটা কী, ওটা কী। একবার ট্রামে ওঠার জন্যও জেদ ধরেছিল মুন।

অটো রিকশা। নিউ আলিপুর দিয়ে যাওয়ার সময় দোকানের সাইন বোর্ড পড়ে মুন বলেছিল, "জানো, আমাদের কলেজের একটা মেয়ে প্রেম করে বিয়ে করেছিল। সেই ছেলেটার বাড়ি এই নিউ আলিপুরে।"

—ছেলেটার সঙ্গে তার আলাপ হল কী করে?

—কলেজ থেকে আমরা একবার পুরী গেছিলাম। ওখানেই ওর সঙ্গে চেনা হয় ছেলেটার। রেজেস্ট্রি করে মেয়েটা পালিয়ে এসেছিল বহরমপুর থেকে। তিন-চারদিন শ্বশুর বাড়িতেও কাটায়।

—তার পর?

—মেয়েটার বাবা এসে নিয়ে যায়। পরে আবার ওদের সামাজিক বিয়ে হয়। জানো, ওই মেয়েটা আমাকে কী বলেছিল?

—কী গো?

—কলকাতার ছেলেরা ভাল না। খুব চালিয়াত হয়। কলকাতার কোনও ছেলেকে বিয়ে করিস না মুন।

—কেন? সেই ছেলেটা কি ভাল না?

—কে জানে? বোধহয় পুরীতে আলাপ হওয়ার সময় এক রকম কথা বলেছিল। বিয়ে হওয়ার পর দেখে অন্য রকম। সেই ছেলেটার সঙ্গে নাকি আগে একটা মেয়ের ভালবাসা ছিল।

—তাতে কী হল? বিয়ের পর তো আর সম্পর্ক রাখেনি।

—কী বলছ তুমি ঋচীক। একটা জীবনে দু'জনকে কি কখনও ভালবাসা যায়?

খুব সরলভাবে কথাটা বলেছিল মুন। কিন্তু শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। অটো রিকশায় ও আমার হাত জড়িয়ে বসেছিল। বলেছিলাম, "কলকাতার সব ছেলে এক রকম না।"

সেদিন পাতাল রেলে চড়ে মুন খুব অবাক হয়ে গেছিল। দরজার সামনে

দাঁড়িয়েছিল জিন্স পরা একটা ছেলে আর মেয়ে। ওদের ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখে মুন হঠাৎ ফিস ফিস করে বলেছিল, "ঋচীক, এদের বিয়ে হবে?" আমি হেসে ফেলেছিলাম। পাতাল রেল এখন অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের মিটিং প্লেস হয়ে গেছে। সিঁড়িতে জোড়ায় জোড়ায় বসে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। মুনরা এমন জায়গায় থাকে, এত খোলামেলা মেশামেশি কল্পনাও করতে পারে না। সেদিন এস্কেলেটরে ওঠার সময় মুন এমন কাণ্ড করেছিল যে, লোক জড়ো হয়ে যায়।

সেদিনই চাঁদনি চক স্টেশনের কাছে একটা রেস্তোরাঁয় ওকে নিয়ে ঢুকেছিলাম। বার-কাম রেস্তোরাঁ। দুপুর তিনটেতেও লোকে এত ড্রিঙ্ক করে জানতাম না। এক কোণে গিয়ে বসতেই মুন বলেছিল, "এই লোকগুলো মদ খাচ্ছে ঋচীক?"

—হ্যাঁ।

—মদ খাওয়া ভাল না। আমার এক পিসতুতো দাদা মদ খেয়ে শেষ হয়ে গেছে। জানো, অত সম্পত্তি ছিল, একে একে সব নষ্ট করে ফেলল। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যে ছেলে ড্রিঙ্ক করে, তাকে আমি বিয়ে করব না।

—বিয়ে হওয়ার পর যদি সে খেতে শুরু করে?

—কেন, তুমি খাবে নাকি?

—বলা যায় না। এখানে তো অনেক মেয়েও ড্রিঙ্ক করে।

—ছিঃ।

মুন আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একজন বেয়ারা এসে আমাকে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিল। আবছা আলোয় পড়লাম, "ঋচীক, এই তোর সেই উন্মাদিনী নাকি? সেই মেন্টাল পেশেন্ট? তোর পছন্দের তারিফ করছি ভাই। —সুমিতাভ।" চিরকুট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে গেছিলাম। সুমিতাভ বোধহয় মাল খেতে ঢুকেছে। ও যদি সামনে আসে, মুন তাহলে আমার সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা করবে। তাই উল্টো পিঠে লিখে দিয়েছিলাম, "ধন্যবাদ। কাছে আসার দরকার নেই।" সুমিতাভ সেদিন অবশ্য কথা রেখেছিল।

সেবায় ফেরার সময় মুন ট্যাক্সিতে আমাকে বলেছিল, "ঋচীক, আমাকে তুমি কোনওদিন দুঃখ দিয়ো না। মাকে সব বলে দিয়েছি। মা জিজ্ঞেস করল, ঋচীকের মা কি রাজি হবেন? কী বলব, আমি তো জানি না।"

—আমার মা খুব ভাল মুন। গররাজি হবে না।

—উনি কি খুব গম্ভীর?

—না তো।

—মাঝে মধ্যে ফোন ধরেন। তখন আমার খুব রাশভারী মনে হয়।

—আলাপ হলে দেখো। ঠিক তোমার মায়ের মতো।

—আমার মাকে তোমার ভাল লাগে?

—তোমাকেও।

—যাঃ, তুমিও কলকাতার ছেলে। এখন মিষ্টি কথা বলছ। পরে আমাকে খুব কষ্ট দেবে।

—কখখনও না।

...মনে পড়ছে। সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে পড়ছে আমার। ছাদে বেরিয়ে পায়চারি

শুরু করলাম। একেকটা দিন এইভাবে পায়চারি করতে করতেই, মুনকে নিয়ে কত কল্পনা করেছি। সেই মুনকে আমি আজ চিনতে পারলাম না। অদ্ভুত লাগছে। কী করে সম্ভব হল এটা ! আমার মনের কি একটা পর্দা দেওয়া ছিল ? কিছুই মনে পড়ছিল না। হঠাৎ সেই পর্দাটা যেন কেউ সরিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় করে আসছে পুরনো সব কথা।

সেবায় গল্প করার ফাঁকে, মাঝেমধ্যে ও জিজ্ঞেস করত তিতলির কথা। হেসে আমি উড়িয়ে দিতাম। তিতলি সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা ওর মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল চন্দনাদি। সেটা ভেঙে দেওয়ার জন্য আমি নিজে কোনওদিন উদ্যোগ নিইনি। যা সত্যি, একদিন তা প্রকাশ পাবেই। আমাদের বাড়ির গল্প শুনতে ও খুব ভালবাসত। খুটিয়ে খুটিয়ে সব জিজ্ঞেস করত। সব থেকে অবাক হত লিন্ডা বউদির কথা শুনে। লিন্ডা বউদির ছবি দেখে, ও একবার প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা, ওঁর চুলগুলো কি সত্যিই সোনালি ? ওদের দেশে সব মেয়ের চুল কি সোনালি হয় ?"

ওর এই সব কৌতূহল দেখে আমি হাসতাম। বলতাম, "সবার হয় না। মজার কথা কি জানো মুন, বউদি যদি তোমার চুল দেখে, অবাক হয়ে যাবে।"

—কেন গো ?

—কালো চুলের ওপর ওদের খুব লোভ। বউদি খুব আফসোস করে, 'কেন আমার চুলের রঙ কালো হল না।'

—যাঃ, তাই হয় নাকি ? আচ্ছা, উনি কি বাংলা জানেন ?

—খুব অল্প।

—তা হলে তোমাদের সঙ্গে কথা বলেন কী করে ?

—ইংরেজিতে।

—এ মা, তা হলে আমি কথা বলব কী করে ? আমি তো পারব না। ইংরাজিতে আমি খুব কাঁচা।

—শিখে নেবে।

—আচ্ছা, উনি কি গরুর মাংস খান ?

—তুমি কী করে জানলে মুন ?

—জানি। সংঘমিত্রার এক খুড়তুতো দাদা থাকে লন্ডনে। তার কাছে শুনেছি। মা গো, ভাবলেই আমার বমি আসে।

এ সব কথা শুনে তখন আমি খুব মজা পেতাম। বলতাম, "আমি যদি কোনওদিন বিফ খাই, তা হলে তুমি কী করবে মুন ?"

—খেয়ে দেখো না। তোমাকে আমি ছোঁবই না। আর মা যদি শোনে, তোমাকে বাড়িতে ঢুকতেও দেবে না। জানো, আমাদের বাড়িতে এখনও মুরগির মাংস পর্যন্ত ঢোকে না। বাবা অবশ্য খেত। কিন্তু রান্নাটা হত বার দুয়ারিতে। ইন্দ্রটা এত পাজি, একবার মুরগির মাংস খেয়ে মাকে ছুঁয়ে দিয়েছিল। শেষপর্যন্ত মাকে চান করতে হল।

—মাই গড। তা হলে তো তোমাদের বাড়ি থাকা যাবে না।

—কেন ? গেলে তুমি গেস্ট রুমে থাকবে।

—আর তুমি ?

—আমি আমার ঘরে।

—গেস্ট রুম থেকে তোমার ঘরটা কতদূর মুন ?

—নীচে আর ওপরে।

—রাতে যাওয়া যাবে, না ?

—অত সোজা না। বহরমপুরের মেয়েরা অত সস্তা না।

ছাদে পায়চারি করছি। আর ভাবছি এ সব কথা। আমি মন ঠিক করে ফেলেছিলাম। যে দিন ডাক্তার ব্যানার্জি বলেছিলেন, "আর কোনও ভয় নেই ঋচীকভাই, মুন ইজ অলরাইট। ওকে এ বার ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।"

তবু আমি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলাম, "ভবিষ্যতে কোনওদিন রিল্যাপস হতে পারে ডাক্তার ব্যানার্জি ?"

—চান্স কম। ফোবিক ডিসঅর্ডার। রুটটাকে উপড়ে দেওয়া গেছে। মনে হয় না, আর কখনও হবে। তবে সেটা ডিপেন্ড করছে, কোন এনভায়রনমেন্টে ও থাকবে তার উপর।

—ডাক্তার ব্যানার্জি, মুনকে আমি বিয়ে করতে চাই।

—যদি করো, আমি খুব খুশি হব ভাই।

—কবে ওকে ছেড়ে দেবেন ?

—উইদিন এ উইক। ওর মা আর ভাইকে খবর দিতে হবে। মানসবাবুকে বলেছি। তোমার পক্ষে কি খবর দেওয়া সম্ভব, ঋচীকভাই ?

প্রলয়কে ফোন করে, ইন্দ্রদের খবর দেওয়ার কথা তখন ভেবেছিলাম। কিন্তু সেই সময়ই জড়িয়ে গেলাম সুমিতাভর ঝামেলায়। প্রোজেক্ট নিয়ে অশান্তি, সেই অ্যাক্সিডেন্ট। এমন ব্যস্ত আমি, দিন কয়েক সেবায় যাওয়ার সময়ই পেলাম না। তার পর টেলিফোনে মানসবাবু বলে দিলেন, মুন নেই। আমাকে কিছু না জানিয়ে ও চলে গেল, সেই ধাক্কাটা আমি সহ্য করতে পারলাম না।

—দাদাবাবু, তোমার খাবারটা কি নিয়ে আসব ?

প্রশ্নটা শুনে তাকিয়ে দেখি রুমকি। বাবলু তা হলে ফিরে এসেছে। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রুমকি। ওই জায়গায় এখন তো মুনও দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। এই প্রশ্নটাই হয়তো আমাকে করত। কী হল, বলে ফেললাম, "রুমকি, একটা কাজ করতে পারবি ?"

—কী দাদাবাবু ?

—যে মেয়েটা এসেছে, তাকে ডেকে আনতে পারবি ? মা যেন জানতে না পারে।

—কে, মুন দিদিমণি ?

—হ্যাঁ। এখন কী করছে রে ?

—বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বিকেলে খুব কান্নাকাটি করেছে।

—মেয়েটাকে কী বলবি ?

—বলব, দাদাবাবু তোমায় ডাকছে।

—নীচে আর কে আছে এখন ?

—অনেকে। মুন দিদিমণির মাও এসেছে।

—কেউ যেন জানতে না পারে, কেমন ?

—ঠিক আছে। বলেই রুমকি লাফিয়ে নীচে নেমে গেল। আমি নিশ্চিত, মুন

আসবে। আমি ওকে চিনতে পারব। তবে একটু নাটক করার পর।

মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই দেখি, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুন। দৌড়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করল। কিন্তু ইচ্ছেটাকে দমন করলাম। গত দেড়টি মাস ও আমাকে ভুগিয়েছে। এত সহজে ওকে ছাড়া যায় ? দরজার সামনে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে, কুণ্ঠিত পায়ে এগিয়ে এল মুন। কাছে আসতেই গম্ভীর হয়ে বললাম, "তোমার নাম মুন ?"

ও করুণভাবে তাকাল। তার পর বলল, "মুনমুন।"

—তোমার মতলবটা কী বলো তো মুনমুন ?

ও অস্ফুট স্বরে বলল, "মতলব ?"

—তা নয়তো কী। এ বাড়িতে কেন এসেছ, আগে বলো তো ?

—তোমার মা আমাকে আনতে লোক পাঠিয়েছিলেন।

—বিশ্বাস করি না। কাকে পাঠিয়েছিলেন, বলো ?

—মানুদা বলে এক ভদ্রলোককে।

—আর তুমিও চলে এলে, কেমন ?

—উনি বললেন, তোমার খুব অসুখ।

—বাজে কথা। আমাকে তুমি চেনো ?

—ঋচীক, সত্যিই তুমি আমাকে চিনতে পারছ না ?

—একদম না। তোমার সঙ্গে আমার কোথায় দেখা হয়েছিল, বলো ?

—বহরমপুর থেকে আসার সময়, ট্রেনে।

—আর কি কখনও দেখা হয়েছে ?

—অনেকবার। সেবা মেন্টাল হোমে।

—মিথ্যে কথা। আমি কোনওদিন ওই সব জায়গায় যাইনি।

—মনে করে দেখো ঋচীক। প্লিজ, আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না। তুমিই না বলেছিলে, জীবনে কখনও আমাকে দুঃখ দেবে না।

—এ সব গল্প আমার মাকে করেছ বুঝি ?

—গল্প ! যা সত্যি, বলেছি।

—যদি সত্যি হয়, বলো তো শেষ কবে আমাদের দেখা হয়েছিল ?

—তুমি কি আমার পরীক্ষা নিচ্ছ ? মেয়েরা কি কখনও এসব কথা ভোলে ? তোমরা ভুলে যেতে পারো।

—এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হল না।

—কী বলব, বলো। আমাদের মধ্যে শেষ দেখা হয়েছিল সেবার তিনতলায়। চলে আসার সময় তুমি আমাকে...।

বলতে বলতে মুন আটকে গেল। আমি জানি, কেন কথাটা ও শেষ করতে পারল না। চলে আসার সময় সেদিন ওকে চুমু খেয়েছিলাম। মুন মুখ নিচু করে রয়েছে। ওর মুখটা থমথম করছে। যে কোনও মুহূর্তে ও কেঁদে ফেলতে পারে। দেখে খুব হাসি পাচ্ছে। কিন্তু আমি আজ ওকে কাঁদাতেই চাই। তাই জিজ্ঞেস করলাম, "আর দেখা হয়নি কেন ?"

—সুমিতাভ বলে একজন, সেবায় গিয়ে তোমার নামে উল্টোপাল্টা কথা

বলেছিল।

ও, তা হলে এটা সুমিতাভর কাজ! জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে পুরো ব্যাপারটা। জিজ্ঞেস করলাম, "কী বলেছিল সুমিতাভ?"

—তিতলির সঙ্গে তোমার রেজেস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গেছে। সেটা একমাত্র উনিই জানেন। সাক্ষী হিসাবে উনিও সেই বিয়েতে সই করেছেন।

—কাকে বলেছিল এ সব কথা।

—ডাক্তারবাবুকে।

—তুমি জানলে কী করে?

—একদিন বাণীদি আমায় বলল। তখন আমি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম। তখনই মনে হল, কলকাতার ছেলেরা যে খারাপ, কথাটা ভুল না।

—ডাক্তারবাবু কী বললেন তোমায়?

—বললেন, তুই বাড়ি চলে যা। এখানে আর থাকিস না। আমি ইনভেস্টিগেট করেছি। তিতলির সঙ্গে কথা বলেছি। সব সত্যি। আমি খুব কান্নাকাটি করলাম। তখন ডাক্তারবাবু আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

—আমাকে একবার ফোন করলে না কেন?

—মেয়েরা সবাই বারণ করল। আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসে মা যখন সব শুনল, তখন আমাকে বলেছিল, মুন তুই এসব বিশ্বাস করিস না। ঋচীক এমন ছেলেই নয়। ওকে একবার ফোন কর। আমি তবুও করিনি। করার মতো মনের অবস্থা তখন ছিল না।

—ও, সুমিতাভর কথা তুমি তা হলে বিশ্বাস করেছিলে।

মুখ তুলে মুন বলল, "হ্যাঁ।"

দু' চোখ টলটল করছে জলে। যে কোনও মুহূর্তে বর্ষণ হতে পারে। অসাধারণ লাগছে কিন্তু ওকে দেখতে। একেকটা মেয়ে আছে, যে কোনও পরিস্থিতিতে, তাদের সুন্দর দেখায়। মুন তাদের মধ্যে একজন। আমি জানতাম, একবার ওকে দেখলে মা আপত্তি করবে না। এই যে ওর গলায় এখন বাবার কেনা নেকলেসটা ঝুলছে, সেটা মায়ের পছন্দেরই নমুনা। বললাম, " তা হলে এ বাড়িতে এলে কেন?"

—মানুবাবু গিয়ে যে উল্টো কথা বললেন।

—ও, তাই বিশ্বাস করলে, আমি খুব ভাল লোক। আবার যে তোমার কোনওদিন মনে হবে না, এখন যা ভাবছ, সেটা ভুল, তার গ্যারান্টি কে দেবে?

—আর আমি ভুল করব না ঋচীক।

—তার মানে আমার গলায় ঝুলে পড়বে। আশ্চর্য মেয়ে তো তুমি।

ব্যথিত চোখে মুন তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না বোধহয়। চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। সেটা দেখে, আমার খুব খারাপ লাগল। তবুও বললাম, "যাক গে, কবে তোমরা যাচ্ছ এ বার বলো তো?"

প্রশ্নটা শুনে ফুঁপিয়ে উঠল মুন। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছছে। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, "আর থাকার ইচ্ছে আমার নেই। আজ রাতেই যেতে পারতাম। কিন্তু ইন্দ্রটা নেই। কর্নফিল্ড রোডে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে গেছে। ও ফিরে এলেই আমরা কাল...চলে যাব।"

কাঁদতে কাঁদতে ও নিজের মনেই ফের বলতে লাগল, "খুব শিক্ষা হল এখানে এসে। আর না। আর আমি...তোমাকে ডিস্টার্ব করব না। কোনওদিন আর তোমার সামনে আসব না...

আরও কী বলে যাচ্ছে মুন। আমার কানে যাচ্ছে না। আমি ওর কোনও কথাই শুনতে চাই না। আর নাটক না। এবার ওকে আদর করব। ভালবাসায় অতিষ্ঠ করে তুলব। মুন নীচে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই আমি ওকে টেনে ধরলাম। চমকে উঠে ও আমার দিকে তাকাল। তখন বললাম, "এই যে মিস বহরমপুর, কাল যদি আপনাকে যেতে না দিই, তা হলে কি থাকবেন ?"

ডাক্তার ব্যানার্জি ওকে এ নামে ডাকতেন। শুনে মুন আরও একবার চমকাল। আমার দিকে তাকিয়ে ও কী বুঝল, কে জানে, এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বলল, "ছাড়ো আমাকে। আমি এখন নীচে যাব।"

—এখন না। এখন আমরা গল্প করব।

বলেই দু'হাতে ওকে টেনে আনলাম। ওর কোমরে আমার হাত। ছাড়িয়ে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। ফিসফিস করে বললাম, "আজ বিকেলে তুমি খুব কষ্ট পেয়েছ, তাই না ?"

—জানি না।

ফের ওর দু'চোখ দিয়ে নতুন করে বর্ষণ শুরু হল। মুন মুখ নিচু করে আছে। তবে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কোনও চেষ্টাই ও করল না। জোর করে ওর মুখটা তুলে ধরলাম। তারপর খুব নরম গলায় বললাম, "আমার দিকে একবার তাকাও মুন, প্লিজ।"

—না, তাকাব না। তুমি খুব বাজে লোক।

ওর সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হয়, ট্রেনে, সেদিনও মুন বলেছিল, তুমি খুব বাজে লোক। কথাটা মনে পড়তেই হেসে ফেললাম। ওর কপালে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে বললাম, "আমার ওপর খুব রাগ হচ্ছে, না ?"

মুন এ বার বলল, "তুমি তখন, কেন আমাকে চিনতে পারলে না ?"

—তুমিও তো একদিন আমায় চিনতে পারোনি মুন।

—তখন তো আমি অসুস্থ ছিলাম।

—আজ বিকেলে তো আমিও অসুস্থ ছিলাম।

—যাঃ, এত তাড়াতাড়ি কেউ ভাল হয় নাকি ?

—হয় মুন, হয়। এক বাজিগর আজ আমায় ভাল করে দিল।

—সে কে গো ?

—তাকে তুমি চেনো। নাম জানতে চেয়ো না। আগে বলো তো, আমায় তুমি এত কষ্ট দিলে কেন ?

—আমি আবার তোমায় কষ্ট দিলাম কখন ?

—দাওনি ? আমাকে না জানিয়ে তুমি উধাও হয়ে গেলে। তখন আমি কী অবস্থায় ছিলাম, তুমি জানো ?

—ইস্, আমার কী দোষ বলো।

কথাটা বলেই মুন আমার বুকে মাথা রেখে, আমাকে দু' হাতে আঁকড়ে ধরল। ছাদে

যে কেউ এখন উঠে আসতে পারে। আসুক, কাউকে আমি পরোয়া করি না। মুনের কপালে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে, আমি আকাশের দিকে তাকালাম। অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। এখন বোধহয় কৃষ্ণপক্ষ। মুনের শরীরের উত্তাপ নিতে নিতে, হঠাৎই মনে হল, ইচ্ছে করলে আমি এখন ওই তারাগুলো, একটা একটা করে তুলে আনতে পারি।